মনোরমা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রাবণ, ১৩৭০

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭ (দ্বিতল)

প্রাপ্তিস্থান ঃ
উজ্জ্বল বুক স্টোরস
৬/এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনিমাইচন্দ্র ঘোষ
দি রঘুনাথ প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ চিত্র ঃ
অজিত গুপ্ত

মানুষকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ অনন্য, প্রকৃতি-প্রেমিক হিসাবে তাঁর পরিচয় সর্বজনস্বীকৃত— এবং এই পরিচয়ের আড়ালেই চাপা পড়ে গিয়েছে তাঁর মানব প্রেমিক সত্তা। কয়েক বছর আগে সমস্ত বাংলা-দেশের জনচিত্তে দোলা দিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্যের চূড়ায় উঠেছিল বিভূতিভূষণের রচিত কাহিনী অবলম্বনে তৈরী একটি চলচ্চিত্র "নিশিপদ্ম"। এক বছরের মধ্যেই "অমর প্রেম" নামে তা হিন্দি ভাষাভাষী দর্শকদের মনও জয় করে। সাধারণের চোখে হেয় এক পতিতার মাতৃহৃদয়ের স্নেহধারা একটি বালকের প্রতি কেমন করে উৎসাহিত হয়েছিল, 'নিশিপদ্ম' তারই গল্প। এ যাবৎ এ কাহিনী কোথাও কোনো অম্‌নিবাসে সংকলিত হয়নি। বিভূতি সাহিত্যের আর একটি অনুদঘাটিত দিক উন্মোচিত করে কিরীটি কুমার পাল সবার ধন্যবাদার্হ হলেন। বিভূতিভূষণের ছোট গল্প সর্বজনপ্রিয়, কাজেই সে সম্বন্ধে আলোচনা করে ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি করলাম না।

নমস্কার

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আরণ্যক * এস. এন ব্যানার্জী রোড * ব্যারাকপুর * ২৪ পরগণা

সূচীপত্র

নিশিপদ্ম

স্বামী কর্তৃক বিতাড়িতা পুষ্প হেঁটে চলেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ক্রোশ থেকে ক্রোশান্তরে। মাথার উপরে তার প্রখর রৌদ্র, চিন্তাকীটগুলো কিলবিল করছে মাথার মধ্যে। পেটে ক্ষুধার জ্বালা, সারা দেহে-মনে অপমান আর লাঞ্ছনার জ্বালা, পায়ের তলায় রৌদ্রদগ্ধ উত্তপ্ত মেঠো পথ। তবুও কোনো দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই পুষ্প'র—শুধু বুকটা যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে চাইছে। তার স্বামী যে, কোনোদিন তাকে এইভাবে মারধোর করে বাড়ি থেকে দূর করে দিতে পারে—স্বপ্নেও ভাবে নি পুষ্প।

নিঃসন্তান হওয়া ছাড়া তার যে আর কোনো অপরাধ আছে বলেও মনে হয় না পুষ্পর, কিন্তু তাতে আর কি দোষ? ভগবান যাকে বন্ধ্যা করে—নারীজীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ অর্পণ করেছে তার উপরে, কিন্তু সে অভিশাপের দামও তো দিয়েছে পুষ্প—সীতারে বরণ করে। তবু কেন স্বামীর ঘরে তার ঠাঁই হলো? নাহলে কেন এইভাবে চরম লাঞ্ছনা

ভোগ করে তাকে আজ পথে এসে দাঁড়াতে হলো? এইসব নানান প্রশ্ন আজ জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে পুষ্পর বুকে। মনের জ্বালা, দেহের জ্বালা, রোদের জ্বালা পায়ের তলায় মাটির জ্বালা নিয়ে ছুটে চলেছে পুষ্প তার বাপের বাড়ি—কার্তিকপুরের দিকে।

কত পথ, কত গ্রাম পার হয়ে অবশেষে শান্ত মনে ক্লান্ত দেহে পুষ্প এসে পেঁছিল তার লক্ষ্যস্থলে, তা আবাল্যের স্মৃতিবিজড়িত কার্তিকপুরে।

রাস্তার ধারে হারাধন মুখুজ্যের বাড়ির বৈঠকখানার সামনের দাঁড়িয়ে নেপাল বাঁড়ুজের সঙ্গে কথা বলছিলেন হারাধন মুখুজ্যে।

নেপাল বাঁড়ুজ্যে হঠাৎ অদূরে পুষ্পকে পোঁটলা বগলে আসতে দেখে কথা থামিয়ে, চোখের গগল্‌স্‌টা খুলে ফেলে, ভাল করে একবার পুষ্পকে দেখে নিয়ে বিস্মিত হয়ে নিজের মনেই বলেন—'কে, পুষ্প না!'

হারাধন বলেন—'কে পুষ্প?'

ততক্ষণে পুষ্প প্রায় ওঁদের সামনে এসে গেছে। নেপাল বাঁড়ুজ্যে 'বলছি' বলে পুষ্পর দিকে দু'পা এগিয়ে দেঁতো হাসি হেসে গদগদ হয়ে বলেন—'কে রে—পুষ্প নাকি! শ্বশুর বাড়ি থেকে আসছিস্?'

'হ্যাঁ কাকা-বাবু'—বলে পুষ্প মাথা নামিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের সামনে চলে যায়।

নেপাল বাঁড়ুজ্যে আর কিছু বলতে গিয়ে সুযোগ না পেয়ে চুপ করে যান, তাকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন পুষ্পর গমন পথের দিকে। হারাধনের তার চমক ভাঙ্গে—'মেয়েটি কে নেপালদা?'

নেপাল একটু থতিয়ে, আমতা-আমতা করে বলেন—'ও—ও মানে, পুবপাড়ায় দোলগোবিন্দ বোষ্টম ছিল—তারই মেয়ে পুষ্প।'

'ঠিক চিনতে পারলাম না তো নেপাল দা?'

'কি করে চিনবে বল হারাধন। কলকাতায় পড়তে-পড়তেই তো তোমায় চাকরি নিতে হলো, তারপর থেকেই তো গ্রামছাড়া। নেহাৎ তোমার স্ত্রী—মানে ভুতুর-মা গত হলো, তাই ওই ছেলেটার জন্যে রোজ ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করছো। এর আগে এতদিন ধরে গ্রামের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিল কতটুকু যে, তুমি গ্রামের সবাইকে চিনবে?'

হারাধন তার মৃতা স্ত্রীর কথা ভাবতে-ভাবতেই একটু উদাসভাবেই

বলেন—'তা ঠিক ! ভুতুর মা না মারা গেলে গ্রামের সঙ্গে হয়তো এতটা জড়িয়ে পড়তে হতো না।'

নেপাল ও হারাধনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে থাকে, পুষ্প এদিকে বৈঁচি আর আঁশশেওড়ার জঙ্গলের পাশ দিয়ে, বোসেদের পুকুর পাড়ের বিরাট আমবাগানের মধ্যে দিয়ে, বাঁধানো ঘাটের পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে প্রায় গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে ডালপালার বেড়া দেওয়া জীর্ণ একটি খড়-মাটির কুঁড়ে ঘরের সামনে থমকে থামে। বেড়ার ভাঙ্গা আগল ঠেলে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। ঘরের দিকে মুখ করে ডাকে—'মা—ও মা, মা—'

ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পুষ্পর বুড়ী মা, তার সমস্ত চুল শনের মতন সাদা, দেহ কুঁজো হয়ে নুয়ে পড়েছে। লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে বুড়ী এগিয়ে এসে স্থির দৃষ্টে পুষ্পর মুখের দিকে চেয়ে, তাকে চিনে নিয়ে অবাক হয়ে বলে—'পুষ্প ! হঠাৎ এলি যে ?'

ভারি গলায় পুষ্প বলে—'আমিও কি জানতাম মা, আমাকে এমনি করে হঠাৎ চলে আসতে হবে ?'

বুড়ী বলে—'জামাইয়ের সঙ্গে আবার ঝগড়া করে এলি নাকি ?'

কম্পিত কণ্ঠে পুষ্প বলে—'না মা, আমাকে বাধ্য হয়েই আসতে হয়েছে।'

বুড়ী অনুযোগের সুরে বলে—'না-না বাছা, এ তো ভালো নয়। কথা নাই, বাত্তা নাই, সোয়ামীর ঘর থেকে শুধু-শুধু চলে আসা।

ছল-ছল চোখে পুষ্প বলে—'শুধু-শুধু আসি নি মা, তোমার জামাইয়ের মার খেয়ে-খেয়ে আমার সারা গা কালি হয়ে গেছে।'

বুড়ী বলে—'নিশ্চয় তুই কিছু করেছিলি, নইলে শুধু-শুধু মারবে কেন ?'

পুষ্প যেন আর জ্বালার উপর জ্বালা সহ্য করতে পারছে না, তাই একটু ঝঙ্কার দিয়েই বলে—'কেন, তুমি জানো না তোমার জামাইয়ের চরিত্তির ?'

বুড়ীর কণ্ঠস্বরও কেমন একটু শক্ত হয়ে ওঠে, বলে—'জানি, তবু তোকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে'—বলেই পুষ্পর করুণ মুখের দিকে চেয়ে বুড়ীর কণ্ঠস্বরটা যেন আবার নরম হয়ে আসে, পুষ্পর দিকে একটু এগিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—'সোয়ামীর ঘর ছাড়া মেয়ে মানুষের আর গতি কি মা ?' লাথি-ঝাঁটা খেয়েও সেইখানেই পড়ে থাকতে হবে।'

পুষ্পর দু'চোখে যেন অশ্রুর বান ডেকে আসে। কান্নায় ভেঙে পড়ে পুষ্প বলে—'তাইতো ছিলাম, শুধু লাথি ঝাঁটা কেন, মার খেয়ে-খেয়ে আমার পিঠটা—তুমি খুলে দেখো—অনেক দগদগে ঘা এখনো শুকায় নি। দেহের জ্বালা, মনের জ্বালা আমি অনেক সয়েছি'—

বুড়ী পুষ্প'র চোখ মুছিয়ে দিতে-দিতে বলে—'পুষ্প!'

পুষ্প থামে না, কাঁদতে-কাঁদতে বলে চলে—'আমার ছেলে হয়নি বলে তোমার জামাই আবার বিয়ে করে আমার সতীনকে ঘরে এনেছে। সে দুঃখ, সে জ্বালাও আমি সহ্য করেছি মা, তবুও—তবুও আমার ভাগ্যে—'

আর বলতে পারে না পুষ্প, কান্নায় তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে, মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

বুড়ী মা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—'চুপ কর্ মা—চুপ কর্, কাঁদিস্ নি, চুপ কর্।'

পুষ্প কাঁদতে-কাঁদতে বলে—'আমি অমনি আসি নি মা—আমায় লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে।' বুড়ী একটু থেমে চিন্তিত হয়ে বলে—'এখানে এলি তো মা—খাবি কি? আমি আর তেমন কাজ কর্ম্ম করতে পারি না, থরথর করে গা-হাত-পা কাঁপে। নিজের পেটের ভাতই জোটে না সবদিন, তোকে কি খাওয়াবো মা'?

পুষ্প বলে—'তুমি ভেবো না মা, আমরা বোষ্টম। বাবার কাছে তো একটু-আধটু গানও শিখেছি। গান গেয়ে দোরে-দোরে ভিক্ষে করবো, আমাদের মা-বেটির দু'টো পেট চলে যাবে। না হয় ঝিয়ের কাজ করবো মা, তবু তুমি আর ওখানে ফিরে যেতে বলো না।'

বুড়ী সস্নেহে পুষ্পকে ধরে বলে—'আয় মা আয়, ঘরে আয়,' বলে পুষ্পকে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে যায়।

পরদিন থেকে শুরু হলো অন্ন সংস্থানের চেষ্টা। একটা কাজের জন্যে গ্রামের লোকের দোরে-দোরে ঘুরতে লাগলো পুষ্প। দিনের পর দিন কতকগুলো বাড়ি হতাশ হয়ে ঘোরার পর একদিন এসে উপস্থিত

হলো হারাধন মুখুজ্যের বাড়। এসে দেখলো, বিরাট ফাঁকা বাড়ির দাওয়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে হারাধনের ছেলে—মাতৃহারা তিন-চার বছরের ভুতু তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদছে। পুষ্প তার কাছে যাবার আগেই হারাধন ঘর থেকে বেরিয়ে ভুতুকে কোলে নিয়ে ভোলাতে-ভোলাতে এদিকে-ওদিকে চেয়ে ডাকতে থাকেন—'গয়লা বৌ, মধু-মধু!'

ডাক শুনে ওদিক থেকে দাঁড়ায় বিধবা গয়লা বৌ।

তাকে দেখে হারাধন বিরক্তির স্বরে বলেন—'তোমার কি জন্যে আছো বলতে পারো? দু'জন লোক মিলে একটা ছেলের দেখাশোনা ঠিক মতন করতে পারো না।'

গয়লা বৌ ভুতুকে কোলে নিয়ে অপরাধীর মতন মাথা নামিয়ে থাকে।

হারাধন হঠাৎ পুষ্পের দিকে দৃষ্টি পড়তেই জিজ্ঞেস করেন—'তুমি কিছু বলবে?'

পুষ্প বলে—'হ্যাঁ দাদাবাবু, আমি আপনার কাছেই এসেছি—আপনি লোক রাখবেন?'

হারাধন বলেন—'লোক। না লোক তো রয়েছে। গয়লা বৌ রয়েছে, মধু রয়েছে, আর তো লোকের দরকার নেই। কেন—কে থাকবে?'

করুণ স্বরে পুষ্প বলে—'আমিই থাকতাম। আমায় মাইনে লাগবে না দাদাবাবু, শুধু দুটো খেতে দিবেন।'

হারাধন বলেন—'তোমার শ্বশুর বাড়িতে কি হলো?'

পুষ্প মুখ নামায়: গয়লা বৌ বলে—'ওর শ্বশুর বাড়ি এখন অসুর বাড়ি হয়ে গেছে।'

হারাধন বলেন—'মানে?'

গয়লা বৌ বলে—'ওর সোয়ামী আর একটা বিয়ে করে ওকে দূর করে দিয়েছে।'

হারাধন বলেন—'তাই না কি?'

এমন সময় হারাধনের বাড়ির চাকর মধু এসে হারাধনকে বলে—'বাবু নেপালবাবু আপনাকে ডাকছেন।'

—'তুই বল-আমি আসছি।' বলে হারাধন গয়লা বৌকে বলেন—'তুমি ওকে চারটি মুড়িটুরি কিছু দিয়ে দাও।' বলে হারাধন বাইরে যান।

পুষ্প গয়লা বৌয়ের কোলে ভুতুকে দেখিয়ে বলে—'এটি বুঝি দাদাবাবুর ছেলে' ?

গয়লা বৌ জবাব দেয়—'হ্যাঁ।'

পুষ্প ভুতুর চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে জিগ্যেস করে—'নাম কি খোকাবাবুর ?'

গয়লা বৌ বলে—'ভুতু'।

পুষ্প একটু হেসে বলে—'ওমা ! এমন সুন্দর সোনার পানা ছেলের নাম ভুতু। ছেলের মা কোথায় ?'

গয়লা বৌ জবাব দেয়—'ওর মা আজ দু'বছর হলো মারা গেছে।'

ভুতু এই সময় হঠাৎ কেঁদে ওঠে। গয়লা বৌ তাকে চুপ করানোর চেষ্টা করে। পুষ্প একটু চুপ করে থেকে সহানুভূতির সুরে বলে— 'আহা তোমরাই ওর দেখাশুনা কর বুঝি ?'

গয়লা বৌ বলে—'হ্যাঁ, যদ্দিন না ওর নতুন মা আসছে। তবে তার আর দেরী নাই, দাদাবাবুর এই মাসের বিয়ে।...তুই দাঁড়া পুষ্প, আমি তোকে মুড়ি এনে দিই।'

বলে গয়লা বৌ ভুতুকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে মুড়ি আনতে যায়।

পুষ্প ভুতুর কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহে দু'হাত বাড়িয়ে আদর করে। বলে—'খোকাবাবু, এসো কোলে নিই। তোমায় কত-কত ফুল দেবো, গাছ থেকে কুল পেড়ে এনে দেবো।'

ভুতু হাসিমুখে চায়। পুষ্প তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে। ভাবে ভগবান যদি তার কোলে এমন একটি ছেলে দিতেন, তা'হলে তার ভাগ্য আজ এমনি দুর্ভাগে পরিণত হতো না। স্বামীর ঘর ছাড়া হয়ে দু'মুঠো ভাতের জন্যে তাকে এমনি করে লোকের দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াতে হতো না। কতই না স্বপ্নের জাল বুনেছিল পুষ্প, স্বামী, সংসার, সন্তান, কিন্তু কিছুই সফল হলো না তার—স্বামী সুখ, তাও অদৃষ্টে সইলো না।

হঠাৎ গয়লাবৌ-এর কথায় চমক ভাঙে পুষ্পর।

'নে পুষ্প—আঁচল পাত্।'

পুষ্প দেখে, কাঁসার থালায় মুড়ি নিয়ে এসেছে গয়লা বৌ। পুষ্প

ধীরে-ধীরে ভুতুকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে আঁচলটা বিছিয়ে দেয় গয়লা-বৌ-এর সামনে। গয়লা বৌ তাতে ঢেলে দেয় থালার মুড়িগুলো। লজ্জায় মাথা নামিয়ে ধীরে-ধীরে মুড়ির আঁচলে গাঁট দিতে-দিতে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায় পুষ্প। হারাধনের বাইরের বৈঠকখানায় তখন অমল, হারাধন ও নেপাল বাড়ুজ্যের মধ্যে হারাধনের বিয়ের সম্বন্ধে কথাবার্তা চলছে।

নেপাল বাড়ুজ্যে দেঁতো হাসি হাসতে-হাসতে বলেন—'এবার তোমার বিয়েতে কিন্তু ফূর্তি করবো হারাধন।'

হারাধন বলেন—'আরে দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের আবার ফূর্তি। নেহাৎ ওই ভুতুটার জন্যেই বিয়ে করতে হচ্ছে, না হ'লে আর এই বয়েসে—'

তাঁর কথা শেষ করতে হচ্ছে, না দিয়ে নেপাল বাঁড়ুজ্যে বলেন—'আরে না-না, তোমার আর বয়স কোথায়, বলতে গেলে তোমার বয়সের কত লোকের এখনো—'বলেই হঠাৎ সদর দরজার দিকে তাকিয়ে পুষ্পকে বেরুতে দেখে নেপাল কথা থামিয়ে বলেন, 'পুষ্প না?'

পুষ্প বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে মাথা নামিয়ে তাড়াতাড়ি ওঁদের সামনে দিয়ে চলে যায়। নেপাল তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন। হারাধন বলেন—'মেয়েটা খুব বিপদে পড়েছে, আমার কাছে একটা কাজ চাইতে এসেছিল?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নেপাল বলেন—'আমার কাছেও গেছল দু'দিন—আমি দূর করে দিয়েছি।'

বলে গলার স্বর নামিয়ে হারাধনের দিকে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেন—'আসলে কি জানো মেয়েটার চরিত্তির খারাপ, বুঝলে না।'

একটু বিরক্তি বোধ করে হারাধন বলেন—'থাক ও সব কথা।'

নেপাল বলেন—'হ্যাঁ-হ্যাঁ, যত সব ছোট লোকের কাণ্ড, তা বিয়ের দিন কবে ঠিক করলে?'

হারাধন বলেন—'ছাব্বিশে।'

নেপাল উৎসাহিত হয়ে বলেন—'২৬শে। তাহ'লে তো এসেই গেল। ভালো, ভালো, শুভস্য শীঘ্রং।'

* * *

দুপুর বেলা। বোসেদের সেই পুকুরের বাঁধানো ঘাট স্নান করতে নেমেছে পুষ্প। ঘাটে কেউ নেই, নির্জন-শান্ত দুপুর। দূরে একটা উদাস করা ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে। পুষ্প গলা জলে দাঁড়িয়ে শুনছে ঘুঘুটা একটানা ডেকেই চলছে। পুষ্প স্নান শেষ করে, গামছাটা ভালো করে করে বুকে ঢেকে নিয়ে, মাটির কলসীতে জল ভরে, নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে ধীরে-ধীরে উঠে আসে জল থেকে। ঘাটের ধারে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন নেপাল বাঁড়ুজ্যে। আস্তে-আস্তে পুষ্পর কাছে এগিয়ে আসেন, অতি সন্তর্পণে দরদী গলায় ডাকেন 'পুষ্প!'

পুষ্প তাকে দেখে নি, হঠাৎ ডাক শুনে চমকে উঠে বলে—'কে?'

'আমি রে—আমি, তোর নেপাল কাকা।' বলে জেঁাকের মতন পুরু ঠোঁট দু'টো দিয়ে দু'বার চেটে নেন।

পুষ্প বিরক্তির স্বরে প্রশ্ন করে—'কি চান আপনি'?

আমতা-আমতা করে নেপাল বলেন—'না—চাই না কিছুই। তুই কাজ চেয়েছিলি না, আমি তোকে কাজ দেবো, তবে এখানে নয়।'

পুষ্প বলে 'কোথায়!'

'তুই তো জানিস্, ব্যবসার ব্যাপারে আমাকে প্রায়ই কলকাতায় থাকতে হয়। সেখানে একটা ঘরও ভাড়া করেছি। যখন যাই, নিজের হাতেই দু'টো ফুটিয়ে নিই। তাই বলছিলাম—তুই সেই বাসাতেই থাকবি।' বলে নেপাল আবার আগের মতন জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটাতে থাকেন।

চিন্তিত ভাবে পুষ্প বলে—'কিন্তু কাকাবাবু—'

তার কথা শেষ করতে না দিয়েই নেপাল বলেন—'কিন্তু কিরে, আমি তোর ভালোর জন্যেই বলছি। এখানে তোকে কেউ কাজ দেবে না।'

পুষ্প তেমনি চিন্তিত ভাবেই বলে—'দেখি চেষ্টা করে, বুড়ো মা রয়েছেন তো, ওকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না।'

নেপাল বলেন—'ছাখ, ইচ্ছা হলে আমাকে বলিস্!'

'আচ্ছা' বলে পুষ্প কলসী কাঁখে হন্‌হন্ ক'রে চলে যায়। নেপাল লোভাতুর দৃষ্টিতে তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

পুষ্প বাড়িতে এসে একটা শতছিন্ন ময়লা কাপড় পরে ভিজে কাপড়-

গামছাটা উঠোনের দড়িতে মেলে দিচ্ছিল, এমন সময় তার বুড়ী মা লাঠিতে ভর দিয়ে বাইরে থেকে এসে দাওয়ায় বসে হাঁপাতে থাকে। পুষ্প লক্ষ্য করে বলে 'কি হলো মা—ভর দুপুরে রোদ মাথায় করে কোথায় গেছলে?'

বুড়ী হাঁপাতে-হাঁপাতে বলেন—'মরতে গেছলাম, এমন গাঁয়ের মুখে আগুন, দু'টো পোড়া-মুড়িও কি কারো জোটে না গা?'

পুষ্প কাপড় মেলতে-মেলতেই বলে 'লোকের আর দোষ কি মা—রোজ-রোজ চাইতে গেলে, কে কদ্দিন দেবে।'

ঝঙ্কার দিয়ে বুড়ী বলে ওঠে—'না, তোর বাপের জমিদারী আছে, বসে-বসে খাবি।'

পুষ্প বলে—'তোমার দুঃখ-কষ্টের ভাত আমারও কি বসে-বসে খেতে ইচ্ছা করছে মা? দেখছ না, লোকের দোরে-দোরে দিনরাত মাথা কুটে মরছি। এ গাঁয়ে ঝি রাখবার মতন লোক কে আছে? যারা আছে, তারা কেউ বলে—সোয়ামীর চরিত্তির খারাপ—তোকে দেখলে বাপু ভয় হয়। কেউ বলে—সোমত্ত ছেলে ঘরে, তোমাকে বিশ্বেস হয় না। তা আমি কি করবো?'

বুড়ি বলে—'তবে না খেয়ে মর্, আমিই বা আর কি করবো?'

পুষ্প মুখটা করুণ হয়ে ওঠে। বলে—'আমিও কি করবো ভেবে পাচ্ছি না মা। কেউ কাজ দেয় না, ভিক্ষে চাইতে গেলে দূর্-দূর্ করে তাড়িয়ে দেয়, কি করবো আমায় বলতে পারো' ?

তিক্ত-বিরক্ত স্বরেই বুড়ী বলে—'কি আর করবি, আজ তো ঘরে কিছু নাই। বুড়ো মানুষ পেটের জ্বালায় গা-হাত-পা দুর্ দুর্ করছে। দোপরও গড়িয়ে গেল, তুইও পেটে কাপড় বেঁধে পড়ে থাক, আমিও থাকি।'

পুষ্পর চোখ দু'টো ছলছল্ করে ওঠে। কিছু না বলে হনহন্ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বুড়ী ডাকে, 'পুষ্প শোন্—শোন্ এই ভোর্ দুপুরে যাচ্ছিস্ কোথা, শোন্—'

শোনে না, চলে যায়। পুষ্প লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে থাকে দু'টি খাবারের আশায়। সে না হয় একবেলা না খেয়েও থাকতে পারে কিন্তু, তার বুড়ী মা'র যে ক্ষিদের জ্বালায় গা-হাত-পা থর্থর্ করে কাঁপছে। মান, অপমান, ভয়, লজ্জা সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে পুষ্প ছুটে যায় এক বাড়ি,

কিন্তু কোথাও কিছু পায় না। যদি কেউ সামনাসামনি অপমান করে, যদি কেউ সামনে সহানুভূতির সুরে কথা বলে আবার পিছনে মুখ ভেংচায়।

পুষ্প এইভাবে কয়েকটি বাড়ি ঘুরে গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় রায়গিন্নির কাছে এসে উপস্থিত হলো। রায়গিন্নী তখন দাওয়ায় বসে বড়ি দিচ্ছিলেন।

পুষ্প অনেক কাকুতি-মিনতি করে বলে, 'আমাকে আপনি ঝি রাখুন কাকীমা, নাহলে আমরা দুই মা-মেয়েতে না খেয়ে ম'রে যাবো।'

রায়গিন্নী তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন, 'তুই হাসালি পুষ্প—ঝি রাখবো আমরা?'

করুণ স্বরে বলে পুষ্প—'আমি বলছিলাম কাকীমা, আপনার এত বড় সংসার—পাঁচজনের পাতের কুড়িয়ে খেলেও আমাদের দিন চলে যাবে।'

রায়গিন্নী স্পষ্টই জবাব দেন—'না বাছা, এখানে আর কিছু হবে না।'

পুষ্প কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে বলে, 'দু'টি মুড়ি দেবেন কাকীমা?'

রায়গিন্নী বলেন, 'মুড়ি তো ভাজা হয় নি, ক'দিন জ্বরে গেল কিনা।'

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে পুষ্পর। কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে ধীরে-ধীরে উঠে যায় পুষ্প। রায় গিন্নী তার গমন পথের দিকে চেয়ে স্বগতোক্তিকরে বলে, 'উঃ—মরণ!'

আর একটি বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়ে পুষ্প। বেশ কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর দরজা খুলে মুখ বাড়ায় সেই বাড়ির বড়বৌ। পুষ্পকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার সমস্ত মুখে-চোখে ঘৃণা ফুটে ওঠে বলে, 'কি চাই?'

পুষ্প মিনতি করে বলে, 'আজ সকাল থেকে আমাদের মা-বেটির কিছু কিছু খাওয়া হয় নি, চারটি মুড়ি দেবেন বৌদি?'

ঝঙ্কার দিয়ে বড়বৌ বলে, 'সোয়ামীর ভাত ছেড়ে এখানে এসে ভিক্ষে করছিস? তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়।'—বলে পুষ্পর মুখের ওপর দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

হতভম্বের মতন একটুখানি দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে পথে এসে নামে। একটুখানি এগোতেই পেছনে কার ডাক শুনে পুষ্প হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।

ওই বাড়ির বড়বৌ-এর দেওর এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে বড়বৌ এবং পুষ্পর সব কথা শুনেছিল। পুষ্পর কাছে এগিয়ে এসে চুপিচুপি বলে, 'তুমি

আমাদের বাড়ি মুড়ি চাইতে এলে আর বৌদি যা তা অপমান করলো।'

পুষ্প বলে, 'ভিখারীর আবার মান কোথায় বাবু, যে অপমান হবে।'

বড়বৌ-এর ছোট দেওরের দরদ যেন উথ্‌লে ওঠে। সেইভাবে বলে, 'না-না, তোমার সকাল থেকে কিছু খাওনি, এই নাও, আমি তোমার ছু'টো টাকা দিচ্ছি, চাল-ডাল কিনে নিয়ে যাও।'

বলে পকেট থেকে ছু'টো টাকা বের করে পুষ্পর দিকে বাড়িয়ে দেয়। পুষ্প টাকা নিতে ইতস্ততঃ করছে দেখে বলে, 'কি হলো—নাও।'

পুষ্প তার হাত থেকে টাকা ছু'টি নিয়ে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে কৃতজ্ঞতাব সঙ্গে বলে, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

—বলে পুষ্প ছু'পা এগাতেই ছোকরাটি আবার তাকে ডাকে। পুষ্প থম্‌কে দাঁড়ায়। ছোকরাটি তার খুব কাছে এগিয়ে এসে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে চুপি-চুপি বলে, 'তোমার এই অসময়ে সাহায্য করলাম, কিন্তু'—

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে পুষ্প অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলে—'বলুন বাবু এর বদলে আমাকে কি করতে হবে?'

ছোকরা আরও নীচু গলায় আম্‌তা-আম্‌তা করে বলে, 'না—মানে বুঝতেই তো পারছ, মানে সন্ধ্যাবেলা একটু—'

ঘৃণায় পুষ্পর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, এবারও ছোকরার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে, 'বুঝেছি। আপনার বাবাকে আমি কাকাবাবু বলতাম, গ্রাম সম্পর্কে আপনি আমার দাদা। বোনকে নোংরা কথা বলতে আপনার লজ্জা করে না? এই নিন্‌ আপনার টাকা।'—বলে পুষ্প তার মুখের ওপর টাকা ছুটো ছুঁড়ে দিয়ে হনহন করে চলে যায় সেখান থেকে।

ছোকরা টাকা ছু'টি কুড়িয়ে নিয়ে পুষ্পর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রাগে গর্‌ গর্‌ করতে-করতে দাঁতে ঠোঁট চেপে বলে, 'আচ্ছা, আমাকে চটিয়ে তুই কেমন করে গাঁয়ে থাকিস্‌ দেখবো।'

ছোকরাটি লক্ষ্য করে নি, তার ছোট ভাইপো পুষ্পকে টাকা দেওয়া দেখে ছুটেছে বাড়ির দিকে। তাদের বাড়িতে তখন ছেলেটিব মা অর্থাৎ সেই মুখরা বড়বৌ, ছেলেটিকে বলছে—'তুই নিজের চোখে দেখেছিস?'

আধো-আধো স্বরে ছেলেটি বলে, 'হ্যাঁ, দেখলাম তো ছোটকাকা মেয়েটাকে টাকা দিলে।'

রাগে জ্বলে উঠে বৌটি বলল, 'চল্ তো দেখি'—বলে ছেলের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

পুষ্পদের বাড়িতে এসে পুষ্পর দেখা পায় না, সে তখনও বাড়ি ফেরে নি। পুষ্পর মাকে বৌটি যাচ্ছেতাই অপমান করে। বলে—'তিনকাল গিয়ে তোমার এককালে ঠেকেছে, শাসন করতে পার না মেয়েকে?'

বুড়ী তার কথায় কিছুই বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে বলে—'কেন কি করেছে পুষ্প?'

দাঁত চেপে বৌটি বলে—'টাকা-টাকা, আমার ছোট দেওরের কাছে টাকা এনেছে—এক্ষুণি ফেরত দিক্—নইলে আমি যাচ্ছেতাই করবো।'

বুড়ী বলে—'সে তো ফেরে নাই, আর আমি তো এ সবের কিছুই জানি না মা।'

বৌটি বলে—'তা জানবে কেন, নিজের পেট চলছে না—তাই মেয়েকে সোয়ামীর ভাত ছাড়িয়ে এনেছ? তাকে ভাঙিয়ে খাবে বলে, যতসব ছোটলোক।'

'চুপ বৌদি, ছোটলোক আমারা নই, ছোটলোক তোমার দেওর।

—বলতে-বলতে এক আঁচল কলমী শাক নিয়ে পুষ্প এগিয়ে আসে।

রাগে, দুঃখে, অপমানে পুষ্পর বুড়ী মা ঝাঁপিয়ে পড়ে পুষ্পর ওপর। লাঠি দিয়ে তাকে এলোপাথির মারতে-মারতে বলে—'ফেলে দে, ফেলে দে হতভাগী, কত টাকা নিয়ে এসেছিল ফেলে দে! তোর জন্যে বুড়ো বয়সে আমাকে এই সব কথা শুনতে হলো! মর্‌মর্, গলায় দড়ি জোটে না তোর? বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে, তোর ও কালামুখ আমি আর দেখতে চাই না! দূর হয়ে যা।'—বলতে-বলতে বুড়ী রাগে কাঁপতে-কাঁপতে ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

পুষ্প এতক্ষণ পাথরের মতন দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছিল। তার আঁচল থেকে শাকগুলো পায়ের তলায় পড়ে গেছে। পুষ্প ধীরে-ধীরে বৌটির দিকে মুখ তুলে বলে——'সাধ মিটেছে তো বৌদি, এবার বাড়ি যাও। তোমার দেওরকে জিজ্ঞেস করো, টাকা আমি নিই নি। তোমার দেওর আমার ভাইয়ের মতন!'

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে মুখরা বৌটি—'উঃ, সতী-সাবিত্রী, সোয়ামী কুলে

কালি দিয়ে এখানে এসেছে লোকের সর্বনাশ করতে'—

বলে ছেলেটিকে টেনে নিয়ে—'এই চল'—বলে হন্ হন্ করে চলে যায়।

পুষ্প ভাবে। ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে দরজা বন্ধ। পায়ের তলায় কলমীশাকগুলো পড়ে আছে। ওগুলোই ছিল আজকের ওদের মা ও মেয়ের একমাত্র খাবার।

পুষ্প চিন্তা করে। ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার কোনো পথই আজ তার সামনে খোলা নেই। এইভাবে গ্রামের লোকের ঘৃণা, আচ্ছিল্য, অপমান আর কু-লোকের কুদৃষ্টি থেকে কেমন করে বেঁচে থাকবে পুষ্প? আজ যদি তার রূপ-যৌবনটা বাদ না সাধতো তবুও একটা কথা ছিল। অনেক চিন্তা করে দেখলো পুষ্প মৃত্যু ছাড়া তার আর উপায় নেই। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে বাঁচা অনেক সুখের, অনেক শান্তির। অনেক চিন্তা করে পুষ্প আত্মহত্যা করবার জন্য এসে দাঁড়ালো বোসেদের সেই পুকুরটার বাঁধানো ঘাটে। হাতে তার একটা মাটির কলসী—আর একগাছা খড়ের তৈরী দড়ি।

কোথাও কোনো জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। পুষ্প ধীরে-ধীরে নেবে যায় সিঁড়ি বেয়ে। একটা দাঁড়কাক কা-কা করে একটানা ডেকে চলেছে তার মাথার উপরে। কাকটা উড়ছে, ঘুরছে, আর ডাকছে কা-ক-কা।

পুষ্পর মুখ চোখের ভাব কেমন যেন স্থির হয়ে আসে। ধীরে ধীরে কলসীটা কোলে নিয়ে গলার দড়ি বেঁধে উঠে দাঁড়ায় পুষ্প। জলে ঝাঁপ দিতে যাবে, এমন সময় কার ডাক শুনে ঘাটের ওপারের দিকে চমকে তাকায়। ছাখে, নেপাল বাঁড়ুজ্যে।

নেপাল তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে আসেন পুষ্পর কাছে। বলেন 'একি! গলায় কলসী বেঁধে মরতে এসেছিস! কেন—কেন, মরবি কেন? আমি তো তোকে বলছি, তুই আমার সঙ্গে চল্, ভাল থাকবি, সুখে থাকবি।'

পুষ্প কিছু বলে না, পাথরের মূর্তির মতন নেপালের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। নেপাল বলেন—'ভাগ্যিস্ আমি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, নইলে কি হতো বলো তো?'

বলতে-বলতে পুষ্পর গলার বাঁধনটা খুলতে-খুলতে বলেন—'খোল, সব

বাঁধন খুলে ফ্যাল'—বলে নিজের হাতে বাঁধন খুলে কলসীটা জলে ফেলে দিয়ে নেপাল বাঁড়ুজ্যে হাত ধরে ঘাট থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন পুষ্পকে। কাকটা তখনো ডাকছে,--কা—কা—কা।

* * *

এর পরে বেশ কয়েকটা বছর পার হয়ে গেছে। পুষ্পকে আর এ তল্লাটের লোক কেউ-কেউ বলে, সে নাকি কলকাতায় বারাঙ্গনার জীবন যাপন করছে।

ইতিমধ্যে মুখুজ্যে যথাদিনে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে কমলাকে ঘরে এনেছেন, হারাধনের আগের পক্ষের ছেলে ভুতু এখন দশ-বারো বছরের হয়েছে। মেয়েটি বড় তার নাম লক্ষ্মী, তার পরের ছেলেটির নাম পাটু, আর তার পরেরটি এখন কমলার কোলে—তার নাম গাবু।

কমলা এদের নিয়ে এখন সামলে উঠতে পারে না। হারাধন আগের মতই সাত সকালে চারটি ভাতে-ভাত মুখে গুঁজে কলকাতার ট্রেন ধরেন, ফিরে আসেন সেই রাত্রে।

নিজের কষ্ট তো আছেই তার উপর স্বামীর এই কষ্ট কমলার অসহ্য লাগে। তাই কলকাতায় বাসা করার জন্যে হারাধনকে দিনের পর দিন পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কমলার কথায় হারাধন কলকাতায় বাসার খোঁজ করতে শুরু করলেন, একটা বাসাও জুটে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই।

হু'মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে বাড়িওলা মদনবাবুর কাছ থেকে রসিদ লিখিয়ে নিয়ে সামনের রবিবার আসবার দিন ঠিক করে হারাধন বাবু সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেখে মদনবাবু বলেন —'আরে বৃষ্টি এসে গেল যে, একটু অপেক্ষা করে যান'।

হারাধন কিন্তু অপেক্ষা না করেই রাস্তার নামলেন। হু'পা যেতে না যেতেই খুব চেপে বৃষ্টি নামলো। হারাধন ছুটে গিয়ে একটি বাড়ির দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালেন। সেই বাড়ির জানলা দিয়ে হারাধনকে দেখে 'কে?' বলে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে আসে পুষ্প। তার পরনে এখন দামী শাড়ী, গা ভর্তি গয়না, সাজগোজের বাহারই আলাদা।

পুষ্প হারাধনের কাছে এসে বলে, 'আরে দাদাবাবু না।'

হারাধন চিনতে পারেন না, একটু হকচকিয়ে বলেন—'কে আপনি?'

পুষ্প বলে, 'বা-রে চিনতে পারছেন না, আমি পুষ্প।'

হারাধন বলেন, 'পুষ্প! কে পুষ্প?'

পুষ্প বলে, 'আমি আপনাদের গাঁয়ের মেয়ে, ভুলে গেলেন। আমার বাবার নাম দোলগোবিন্দ বোষ্টম, মনে পড়েছে?'

হারাধন বল্লেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা তুমি এখানে কি করছো?'

পুষ্প একটু ইতস্ততঃ করে বলে, 'আমি-আমি, আমি নটী হয়েছি।'

এমন সময় ফড়্ ফড়্ ফড়াৎ করে মেঘ গর্জন হয়, কোথায় যেন বাজ পড়ে। আবার বিদ্যুৎ চমকায়, হারাধন ভাল করে একবার পুষ্পকে ছাখেন, তারপর এদিক ওদিক তাকাতে-তাকাতে ছাখেন, এখানে-ওখানে অনেক বারাঙ্গনা দাঁড়িয়ে আছে। এই পরিবেশ অসহ্য লাগে হারাধনের।

পুষ্প বলে, 'আসুন দাদাবাবু, ভেতরে আসুন, বৃষ্টিতে যে ভিজে গেছেন।'

হারাধন দ্বিধা করেন, পুষ্প আবার বলে, 'আসুন দাদাবাবু, দয়া করে আসুন, ভিজবেন না, আসুন।'

হারাধন ইতস্ততঃ করে বলেন, 'না—না, মানে'—

পুষ্প হারাধনের ইতস্ততঃ করার কারণ বুঝতে পেরে বলে, 'কোনো ভয় নেই দাদাবাবু, আমি আপনার বোনের মতন, আপনাকে পায়ের ধুলো দিতেই হবে আমার ঘরে, আসুন দাদাবাবু'।

পুষ্পর এমন প্রাণখোলা অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারেন না, হারাধন, বাধ্য হয়েই পুষ্পর পিছু-পিছু ঘরের ভিতর আসেন।

সুন্দর সাজানো ঘর, চারদিকে ঝক্ঝক্-তক্তক্ করছে। সুন্দর খাটে, গদি আঁটা বিছানা, বড়-বড় তাকিয়া বালিশ, চেয়ার টেবিল, আলমারি। অর্ধনগ্ন নারীমূর্তির ষ্ট্যাচু, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদিও রয়েছে।

পুষ্প বলে, 'বাড়ির খবর সব ভালো তো দাদাবাবু?'

হারাধন বলেন, 'ভালো। তুমি কেমন আছো?'

পুষ্প বলে—'আমার আর থাকা দাদাবাবু। আমি এক ভেবে এখানে এসেছিলাম, হলো আর এক। জানেন দাদাবাবু, ওই নেপাল বাঁড়ুজ্যে আমার সর্বনাশ করেছে। এখানে এসে সাতদিন সাত রাত পেটে কাপড় বেঁধে না খেয়ে পড়ে থেকেছি। চোখের জলে বাণ ডেকেছে। এই নরকে না নামবার জন্যে প্রাণপাত চেষ্টা করছি, তবু জিততে পারলামনা দাদাবাবু,

শেষ পর্যন্ত হেরেই গেলাম।'—বলতে-বলতে দু'চোখ জলেভরে আসে পুষ্পর। কান্নায় গলাটা ভারি হয়ে উঠে।

হারাধন মাথা নামিয়ে চুপ করে থাকেন। পুষ্প আঁচলে চোখ মুছে, নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলে—'তবে এখন ভালই আছি দাদাবাবু। গাঁয়ের যারা চাকরি দেয় নি, ভিক্ষে দেয় নি তারাও এখন আমার এখানে এসে সেধে অনেক টাকা-পয়সা দিয়ে রাত কাটাতে চায়—'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল পুষ্প। হারাধন প্রসঙ্গ পালটে বলেন—'বাঃ, বেশ ঘরটি তো তোমার, কত ভাড়া দিতে হয়?'

পুষ্প বলে—'বেশী নয় দাদাবাবু, বহুদিন আছি তো—ষাট টাকা। আপনি বসুন দাদাবাবু, আপনার জন্যে একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করি।'

হারাধন বলেন—'না-না আমি এখন কিছু খাবো না।'

পুষ্প বলে—'তা হবে না দাদাবাবু, সে আমি শুনবো না, কিছুতেই শুনবো না, আপনি বসুন।'—বলে পুষ্প পাশের রান্নাঘরের ভেতর যায় হারাধনের জন্যে জলখাবার আনতে।

হারাধনের এখানে জল স্পর্শ করতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না। তবু পুষ্পের এই প্রাণখোলা আগ্রহকে আঘাত দিতেও কেমন যেন বাধে। তাই হারাধন আর কিছু না বলে চুপ করে বসে থাকেন। ঘরটার চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকেন। দেয়ালে অর্ধনগ্ন নারীর ছবি, বড় আয়না দেওয়া সুন্দর আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, একপাশে হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা, ঘুঙুর। জলচৌকিতে খানকতক পিতল কাঁসার বাসন ঝক্‌ঝক্ করছে। পাশের একটা ছোট আলমারিতে কাঁচের খুব সুন্দর ড্রিঙ্কিং সেট। ঘরের এক কোণে সুন্দর করে সাজানো একটি পুজোর জায়গা, সেখানে নানান্ দেব-দেবীর ছবি।

হারাধন হঠাৎ কয়েকটি নারী কণ্ঠের খিল খিল হাসিতে জানলা দিয়ে তাকান। ছাখেন কয়েকটি বারবণিতা তারই দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসছে। হারাধন অস্বস্তি বোধ করেন।

এমন সময় পুষ্প একটি সুন্দর কাঁসার ডিসে করে কয়েকটি মিষ্টি এনে হারাধনের সামনের টেবিলে রেখে বলে—'খান দাদাবাবু।'—

বলে পাশের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিতে-দিতে বলে—

'আপনি খান, আমি চায়ের জল চড়াই।'

হারাধনের রুচিতে বাধে। পুষ্পর দেওয়া মিষ্টি স্পর্শও করেন না, চায়ের কথা শুনে বাধা দিয়ে বলেন—'কেন ওসব হাঙ্গামা করছো পুষ্প, আমি এখন কিছুই খাব না, আর এখুনি আমায় চলে যেতে হবে।'

'কেমন করে যাবেন, বৃষ্টি যে এখন ধরে নি?' বলে পুষ্প জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হারাধনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হারাধন—'বৃষ্টি না ধরলেও আমায় তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এ ট্রেন মিস্ করলে আজকে আর বাড়ি ফিরতে পারবো না।'

'আপনি আজকেই গ্রামে যাবেন?'

'হ্যাঁ'—

'আমার একটা কাজ দয়া করে দেবেন দাদাবাবু?'

'বল'।

'মাকে কুড়িটা টাকা দেবো, আপনি নিয়ে যাবেন?'—বলতে-বলতে আলমারি খুলে দুটো দশ টাকার নোট নিয়ে এসে বলে—'আমি যখন যেমন পারি মা-কে পাঠাই, মা'র বড় কষ্ট।'

হারাধন বলেন,—'কার হাত দিয়ে পাঠাও?'

পুষ্প বলে—'গ্রামের লোক যাকে পাই—তার হাত দিয়েই পাঠাই, তবে নেপাল বাঁড়ুজ্যের হাতেই বেশী পাঠাই। এই তো গত মাসেও তার হাত দিয়ে পঁচিশটা টাকা আর একখানা কাপড় পাঠিয়েছ।'

হারাধন প্রশ্ন করেন—'এ পর্যন্ত কত টাকা তুমি পাঠিয়েছি?'

পুষ্প বলে— 'আর কি কোন হিসাব আছে দাদাবাবু, প্রতিমাসে ধরুন পঁচিশ, তিরিশ, চল্লিশ যা পারি পাঠাই। আপনি এই কুড়িটা টাকা আমার মাকে দেবেন।'—বলে নোট দু'টি খাবারের ডিসের পাশে রেখে বলে—'আমি চায়ের জলটা চড়িয়ে আসি'—বলে পুষ্প যেতে চায়, হারাধন ডাকেন—'পুষ্প শোনো—'

পুষ্প দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—'বলুন দাদবাবু?'

হারাধন দশ টাকার নোট দু'টি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নোট দু'টি পুষ্পর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন—'এ টাকাটা তুমি রেখে দাও।'

পুষ্প কিছু বলবার আগেই তার বাবু অনঙ্গ দত্ত এসে ঢোকেন। পুষ্প

এবং হারাধনকে এই অবস্থায় দেখে থমকে দাঁড়ান, বলেন—'হে-হে হে, বড় বেয়ারা টাইমে এসে পড়েছি।'

পুষ্প বলে—'আপনার কোনো ভয় নেই, উনি আমার গ্রাম সম্পর্কে দাদা।'

অনঙ্গ বলেন—'ও নমস্কার—'

হারাধনও প্রতি-নমস্কার করেন। অনঙ্গ বলেন—'তোমরা তাহলে কথাবার্তা বলো, আমি ততক্ষণে পাশের ঘরের ঝর্ণার নৃত্যতরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে আসি।'

হারাধন বাধা দিয়ে বলেন—'না, আপনাকে যেতে হবে না, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। পুষ্প, টাকাগুলো রাখো।'

অনঙ্গ দত্ত বলেন—'এক্সকিউজ-মি—আপনি তো মহাশয় মহাপুরুষ ব্যাক্তি, এতগুলো টাকা দিলেন অথচ পুষ্পকে স্পর্শ না করে, একেবারে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে বিদায় নিচ্ছেন?'

গম্ভীরভাবে বলেন হারাধন—'ও টাকাগুলো পুষ্পরই।'

পুষ্প বলে—'হ্যাঁ আমি দিয়েছি মাকে দেবার জন্যে।'

অনঙ্গ বলেন—'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি তোমার মাকে মাসে-মাসে হাত খরচটা পাঠাও বটে। কিন্তু আপনি টাকা ফেরত দিচ্ছেন কেন?'

হারাধন বলেন—'আর টাকা পাঠাবার দরকার হবে না।'

উৎসুক হয়ে পুষ্প প্রশ্ন করে—'কেন?'

হারাধন বলেন—'তোমার মা অনেকদিন হলো মারা গেছেন।'

চমকে উঠে পুষ্প বলে,—'সেকি! মারা গেছে?' কই, ওরা—তো কিছু বলে নি।'

হারাধন বলেন—'তোমাকে আর কি বল্‌বে, তুমি তো ওদের কাছে মরা। মরার কাছে মরার খবর দিয়ে লাভ কি?—চলি—'বলে জল খাবারের ডিস চাপা দিয়ে নোট দু'টি রেখে হারাধন চলে যান।

পুষ্প আলমারির একটা পাট ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে থাকে। অনঙ্গ অস্বিস্তি বোধ করেন, বাইরের ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি হচ্ছে। পাশের ঘরে ঝর্ণার নাচ খুব জমেছে।

অনঙ্গ দেখেন, ঝর্ণা খুব নেচে চলেছে, সারেঙ্গীওয়ালা ও তবলচি খুব

ঘাড় নেড়ে বাজাচ্ছে। ঝর্ণার ভক্তরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে। বাইরে তেমনি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। অনঙ্গ পুষ্পর দিকে ফিরে তাকান। পুষ্প কাঁদছে, ঝর্ণা তার ঘরে পুরোদমে নাচছে। আশপাশের অন্যান্য ঘরগুলো থেকেও নাচ-গান হৈ হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছে। অনঙ্গ দত্ত পুষ্পর জন্যে নিয়ে আসা খাবারের ঠোঙাটা একটা ছোট আলমারির মাথায় রেখে পকেট থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে টেবিলে রাখতে গিয়ে ছ্যাখেন, হারাধনের না খাওয়া মিষ্টির ডিস্ তার নীচে চাপা দেওয়া পুষ্পর মাকে পাঠানোর সেই দশ টাকার নোট ছ'টি। অনঙ্গ হুইস্কির বোতলটা তার পাশে নামিয়ে রেখে আবার একবার পুষ্প'র দিকে তাকিয়ে ছ্যাখেন। পুষ্প ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অনঙ্গ বিচলিত হন। আশেপাশের গান বাজনা হৈ-হুল্লোড় কান্নাকে ছাপিয়ে উঠেছে। অনঙ্গ ছ্যাখেন,—ঝর্ণার ঘরে নাচ আরও বেশী জমে উঠেছে। পুষ্প তেমনি কাঁদছে, ছুচোখের জল তার বাধা মানছে না, অনঙ্গ ধীরে-ধীরে তার কাছে এগিয়ে আসেন, সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'পুষ্প কেঁদো না। তুমি আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছো—সেখানে তোমার ওই বেদনাশ্রু স্যালাইন ওয়াটার, আই মিন, নোনতা জল ছাড়া আর কিছুই নয়, কেঁদো না।'

অনঙ্গর সান্ত্বনায় পুষ্প সংযত হয়, শান্ত হয়, অনঙ্গ পকেট থেকে রুমাল বের করে পুষ্পর চোখের জল মুছে দেন।

পুষ্প বলে,—'আপনার জন্যে খাবার নিয়ে আসি।' অনঙ্গ হারাধনের সেই মিষ্টির ডিসটা দেখিয়ে বলেন, 'খাবার তো রয়েছে, আমার জন্যে তোমায় আজ কিছুই করতে হবে না। আমিই সব ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। তুমি বোসো, তবে কেঁদো না, কান্না আমি পছন্দ করি না।' বলে অনঙ্গ নিজেই আলমারির ড্রিঙ্কিং সেট থেকে গেলাস আর সোডা নিয়ে গিয়ে বসেন টেবিলের সামনে। ড্রিঙ্ক করতে শুরু করেন। পুষ্প বিছানার এক পাশে এসে উদাসভাবে বসে-বসে মায়ের কথা ভাবতে থাকে।

অনঙ্গ সিগারেট ধরিয়ে আবার হুইস্কি ঢালেন। কি ভেবে মিষ্টির ডিসটা তোলেন, দশটাকার নোট ছ'টি ফ্যানের হাওয়ায় উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ে। অনঙ্গ ঢালা হুইস্কিটা গলায় ঢেলে দিয়ে আপন মনে আবৃত্তি করেন —'কারেন্সি নোট বুদবুদ সম হাওয়ায় মিলায়ে যায়।'

নোট দুটি মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বাইরে তেমনি ঝম্‌ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

* * *

বেশ কিছুদিন হলো হারাধন সপরিবারে তাঁর কলকাতার বাসায় এসেছেন। সবাই খুব খুশী। হারাধন বাজারে বেরুচ্ছেন থলি হাতে, পেছন থেকে ভুতু এসে বলে—'আমিও যাবো বাবা তোমার সঙ্গে।'

হারাধন বাধা দিয়ে বলেন—'তুই কোথায় যাবি? পড়তে বোস।'

কমলা বলে—'যাক্ না বাজারটা চিনে আসুক।' হারাধন আর দ্বিরুক্তি করতে পারেন না, ভুতুকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যান। ভুতু তার বাবার হাত থেকে থলি দু'টি নিয়ে চলতে থাকে হারাধনের পিছুপিছু।

পুষ্পর বাড়ির সামনে দিয়ে বাজার যাবার রাস্তা। এই রাস্তাটা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যান হারাধন। সব সময় তাঁর মনে ভয়—যদি পুষ্প তাঁর সঙ্গে কথা বলে, যদি এপাড়ার লোকে জানতে পারে পুষ্পর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে—হারাধন তাই প্রতিদিনই এই পথটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে যান, আজও তাই গেলেন। ভুতু প্রায় ছুটতে-ছুটতে চলেছে তার পিছু-পিছু।

পুষ্পর বাড়ির সামনের একটি বাড়ির দরজার পাশে লেখা—'গৃহস্থের বাড়ি'। এই বাড়িতে ভাড়া থাকেন এ পাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি খুব বড় ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার বিরিঞ্চিবাবু আর তাঁর আধুনিকা স্ত্রী মলি। তাঁদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছেন এক ভদ্রলোক। দরজা খুলে মুখ বাড়ায় বিরিঞ্চিবাবুর স্ত্রী মলি, বলে—'কাকে চাই?'

ভদ্রলোক বলেন,—'বিরিঞ্চিবাবু আছেন?'

'হ্যাঁ—আছেন, আপনি দাঁড়ান, আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি। বলে মলি ভেতরে যায়। একটু পরেই বিরিঞ্চিবাবু বেরিয়ে আসেন। সেই ভদ্রলোক এবং বিরিঞ্চিবাবুর মধ্যে চোরাকারবারের দর দাম নিয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। পুষ্প তখন তার ঘর পরিষ্কার করছে। বিছানায় বসে অন্য দুটি বনিতা। তাদের একজনের নাম ছন্দা, দু'জনেই বসে বসে চা খাচ্ছে।

ছন্দা চায়ে চুমুক দিয়ে বলে—'কিলো পুসী, কাল নাকি তোর বাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল?'

পুষ্প বলে—'আমাদের ঝগড়া আর ভাব। বেশী মাতলামী করছিল, তাই বিদেয় করে দিয়েছি।'

বুড়ী বাড়িউলী বলতে-বলতে এসে ঢোকে—'মাতলামী করবে না তো কি আরতি করবে?'

'তাও করে মাসী—তাও করে'—বলতে-বলতে পুষ্প তাকে রাখা সিগারেটের কৌটা থেকে পাঁচটা টাকা বের করে বাড়িউলীর হাতে দিয়ে বলে—'এই নাও তোমার কমিশনের টাকা।'

টাকাটা হাতে নিয়ে আধ ফোকলা মুখে জর্দাকালো ক'টি দাঁত বের এক মুখ হেসে বাড়িউলী বলে —'এমন বাবুকে চটাস্‌নি পুসী, বাবু তো নয়—লক্ষ্মী। কই লো বিনি, ছন্দি, তোদেরটা দে, কাল তো সারারাত খুব হুল্লোড় করেছিস।'

বীণা বলে—'দিচ্ছি, যাও।'

'হ্যাঁ, সকাল থেকে পরের ঘরে আড্ডা না দিয়ে নিজের ঘরে আয়—এসে আমার টাকাটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দে।'—বলতে-বলতে, হেলতে-দুলতে মুটকী বাড়িউলী বেরিয়ে যায়।

সেদিকে তাকিয়ে বীণা বলে—'কমিশনের টাকাটা মাসির রোজ ভোর বেলাতেই চাই।'

ছন্দা বলে—'না নিলে ওর চলবে কিসে? দিন মজুরের কাছ থেকে দিনের টাকা না নিলে ওর চলবে কেন?'

এমন সময় আবার বাড়িউলীর ডাক শোনা যায়—'ছন্দি, বিনি—'

বীণা আর ছন্দা বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়, পুষ্প ঘর পরিষ্কার করতে থাকে।

সেই গৃহস্থ বাড়ির সামনে তখনো বিরিঞ্চিবাবুর সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের দরদাম নিয়ে কথা কাটাকাটি চলছিল। হঠাৎ বিরিঞ্চিবাবুর স্ত্রী মলি এসে তাদের কথোপকথনে বাধা দিয়ে বলে, 'কিগো বাজারে যাবে না?'

বিরিঞ্চিবাবু আরো দু'একটা কথা বলে ভদ্রলোককে বিদেয় করে দিয়ে বাজারে যান।

পুষ্প তার ঘরের জঞ্জালগুলো নিয়ে এসে গৃহস্থবাড়ির পাশে রাখা ডাস্টবিনটায় ফেলতে থাকে। হঠাৎ হারাধনের কথায় ঘুরে তাকায়,

ছাখে—ভুতু বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে বাজারের থলি হাতে। পুষ্পর সামনে দিয়েই ছুটে চলে যায়।

'ওরে অতো জোরে ছুটিস নি, পড়ে যাবি'—বলতে-বলতে হারাধনও তাড়াতাড়ি ভুতুর সামনে দিয়ে চলে যেতে যান।

পুষ্প এক রকম তাঁর পথ আগলেই বলে—'দাদাবাবু।'

হারাধন এদিক ওদিক তাকিয়ে পুষ্পকে প্রায় না চেনার ভান করে বলেন—'আমাকে বলছো?'

পুষ্প বলে—'হ্যাঁ' আপনি বুঝি এ পাড়ায় বাসা নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ'—বলে হারাধন তাড়াতাড়ি চলে যেতে চান।

পুষ্প বলে—'ওটি বুঝি আপনার সেই আগের পক্ষের ছেলে ভুতু?'

হারাধন বিব্রত বোধ করে কোনো রকমে উত্তর দেন—'হ্যাঁ।'

পুষ্প বলে—'অনেক বড় হয়ে গেছে, ওকে আমি কতটুকু দেখেছি।'

হারাধন তার কথায় ভালো করে কর্ণপাত না করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছাখেন, তাদের কথা কেউ শুনছে কি না।

হ্যাঁ শুনছে। পাশের পানের দোকানে কিছু অসামাজিক লোক, কিছু বনিতা তাদেরই দিকে তাকিয়ে আছে, গৃহস্থবাড়ির বৌ মলিও রয়েছে জানালায় দাঁড়িয়ে। তার কানেও যাচ্ছে বোধহয় পুষ্প'র কথা।

হারাধন অস্বস্তি বোধ করেন। পুষ্পর প্রতি ঘৃণায়, রাগে তার গা রিঁ রি ওঠে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে আসেন পুষ্পর কাছে।'

পুষ্প কিছুই বুঝতে পারে না, হাসিমুখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় হারাধনের মুখের দিকে। কঠিন কণ্ঠে হারাধন বলেন,—'শোন, পুষ্প তুমি এভাবে আমার সঙ্গে আর কথা বোলো না।'

চমকে ওঠে পুষ্প। তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, অবাক হয়ে বলে—'কেন দাদাবাবু?'

বিরক্তির সঙ্গে বলেন হারাধন—'সে কথাও কি তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি সমাজে বাস করি, তুমি অসামাজিক। তোমার সঙ্গে কথা বললে অসম্মান হয়, পাপ হয়'।

পাথরের মূর্তির মতন নিশ্চল পুষ্প অস্ফুট উচ্চারণে বলে, 'দাদাবাবু, এ

আপনি কি বলছেন?'

হারাধন বলেন—'ঠিকই বলছি। আমি যে তোমার পরিচিত, এ পরিচয় দয়া করে কারু কাছে দিও না। দিলে আমার ক্ষতি হবে?'

সুতীক্ষ্ণ বাণের মতন কথাগুলো পুষ্পর বুকে ছুঁড়ে দিয়ে হারাধন হন্ হন্ করে চলে যান সেখান থেকে। বাণবিদ্ধা হরিণীর মতন সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে যায় পুষ্পর লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে বেশ কিছুক্ষণ তার মুখে কোনো কথা সরে না, পা চলে না, চোখে পলক পড়ে না। স্থির নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতন ডাস্টবিনটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে পুষ্প।

* * *

একদিন বিকালবেলা ভুতু তাদের বাড়ির সামনে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে বল খেলছে। ভুতু খেলছে গোলে। একটি বল ধরে হাইকিক করতেই বলটি গিয়ে পড়ে পুষ্পর বাড়ির গলির মধ্যে।

ছেলেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কেউই বলটা আনতে যায় না। ভুতু তাদের এই ভাবান্তরের কারণ কিছুই বুঝতে পারে না।

একটি ছেলে আর একটি ছেলেকে বলে, 'এই বলটা নিয়ে আয়।'

পিন্টু সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দেয়, 'আমি পারবো না।'

প্রথম ছেলেটি আর একটি ছেলেকে বলে, 'ভন্ তুই যা।'

ভন্ও জবাব দিয়ে বলে—'আমি তো ওখানে যাবোই না। ওকেই যেতে বল্'।

—বলে ভন্ ভুতুকে দেখায়।

প্রথম ছেলেটি ভুতুকে বলে—'এই ভুতু, তুই যা বলটা নিয়ে আয়।'

ভুতু ওদের বল আনতে না যাওয়ার কারণ কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু কেউ যেতে রাজী হচ্ছে না দেখে একটু ভয় পেয়েই বলে—'ওখানে কিছু আছে নাকি?'

পিন্টু বলে, 'কেন—ভয় করছে?'

ভুতু মনের ভয় গোপন করে বলে, 'না।'

পিন্টু বিদ্রূপের সুরে বলে, 'না-তো যাও, বলটা নিয়ে এসো।'

ভুতু যায় বল আনতে। পুষ্পর বাড়ির পাশের গলিতে বলটা খোঁজে। পেয়েও যায় তাড়াতাড়ি। বলটা নিয়ে ফিরে আসছিল ভুতু, হঠাৎ পুষ্পর

ঘর থেকে নাচের বোল, আর তব্‌লা ঘুঙুরের আওয়াজ শুনে থম্‌কে থামে। ধীরে-ধীরে গিয়ে পুষ্প'র ঘরের দাওয়ায় ওঠে। দরজার পর্দার নীচের ফাঁক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ছাখে, ভিতরে একটি সুন্দরী যুবতী নাচ প্র্যাকটিশ করছে। একজন তবলচি তবলা বাজাচ্ছে, আর নাচের মাষ্টার মুখে নাচের বোল্‌ বলে চলেছে

পুষ্প ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে আয়নায় চুল আঁচড়াচ্ছে।

বাড়িউলী এসে পুষ্পকে জিজ্ঞেস করে, 'পুসী, ঝর্ণা তোর ঘরে নাচ শিখচে কেন রে?'

পুষ্প বলে—'তুমি জানো না মাসী? ঝর্ণার সঙ্গে নমিতা বলে যে মেয়েটি থাকে, তার জ্বর হয়েছে।'

ঝর্ণা এদের কথাবার্তা শুনে নাচ বন্ধ করে। এমন সময় ছন্দা এসে ঢোকে। বাড়িউলীকে বলে—'মাসী, কাল্লু তোমায় ডাকছে।'

'চল্‌ দেখি'—ব'লে মাসী চলে যায় ছন্দার সঙ্গে। ঝর্ণা আবার নাচ শুরু করে। হঠাৎ ওরা দরজার পর্দার নীচে তাকিয়ে ছাখে ভুতু হামাগুড়ি দিয়ে নাচ দেখছে, আর নাচের তালে-তালে বল বাজাচ্ছে। ঝর্ণা দেখে নাচ বন্ধ করে। পুষ্প পর্দা ঠেলে বাইরে আসে। ভুতু হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পুষ্প তাকে ধরতে যায়, ভুতু ছুটে পালায়। পুষ্প তার যাওয়ার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে। ধীরে-ধীরে তার মুখে ভাবান্তর ফুটে ওঠে। মনে পড়ে তার গ্রামের কথা। ভুতু তখন কত ছোট, পুষ্প তাকে কোলে নিয়েছিল, আদর করেছিল, সেই ভুতু আজ-কত কি ভাবে পুষ্প, তার বুক থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে আসে।

বাড়ীউলীর কথায় তার সম্বিত ফিরে আসে।

'কিলো পুসী, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস? সন্ধ্যে হয়ে এলো, যা-যা সাজতে বোস।'—বলে বাড়িউলী পাশের দোকান থেকে জর্দা নেয়।

পুষ্প তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ভুতুর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে।

* * *

রাত্রিবেলা হারাধনের সঙ্গে খেতে বসেছে ভুতু। লক্ষ্মী, গাবু পাটু ঘুমচ্ছে। কমলা পরিবেশন করছে। ভুতু হঠাৎ মুখের ভাত ফেলে দিয়ে খক্‌ খক্‌ করে কাশতে থাকে। হারাধন বলেন—'কি হলো রে?'

'ভুতু বলে,—'গলায় কাঁটা আটকেছে।'

হারাধন বলেন,—'শুকনো ভাত খা।'

ভুতু একদলা শুকনো ভাত খায়।

হারাধন খাওয়া বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। বলেন 'গেল—গেল, গিলে খা, না-না, চিবুস না, গিলে ফেল'।

ভুতু ভাতের দলাটা গিলে খায়।

হারাধন প্রশ্ন করেন—'গেল?'

ভুতু দু'বার ঢোক গিলে বলে—'না।'

'কই দেখি'।—বলে হারাধন তার গলায় আঙ্গুল দিয়ে দেখতে থাকেন। ভুতু অক্-অক্ করে বমি করে ফেলে। কমলা তরকারি দিতে এসে দেখে নাক সিটকোয়। ভুতু খক্ খক্ করে কাশতে থাকে।

হারাধন কমলাকে বলেন—'ওকে কাঁটা ভর্তি গাদার মাছ দিলে কেন?'

মুখ ঝামটা দিয়ে কমলা বলে, 'অতো পেটিমাছ পাব কোথায়? আনো তো ভারি একপো মাছ।'

ভুতু গলায় আঙ্গুল দিয়ে কাশতে-কাশতে স্নানের ঘরে আসে।

কমলা বিকৃত মুখে, বিকৃত স্বরে ভুতুর খাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলে—'তোমার এই ছেলেটি হচ্ছে এক নম্বরের ল্যাবা।'

এমন সময় পুষ্পদের বাড়ির দিক থেকে হৈ-হৈ গোলমাল ভেসে আসে। হারাধন ও কমলা জানলা দিয়ে ছাখে, পুষ্পদের বাড়ীর সামনের গলিটা অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছু লোকজন ছোটাছুটি করছে।

কমলা নাক সিট্‌কে স্বামীকে বলে, 'এ বাড়িটা তুমি ছেড়ে দাও—পাড়াটা বিশ্রী।'

হারাধন কোন উত্তর না দিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকেন।

* * *

পুষ্পদের বাড়িতে গোলমাল হচ্ছে। কয়েকটি বারবনিতা হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ে। তাদের সবাই ভয়ে কাঁপছে। অনঙ্গ তখন গোলমালে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে হুইস্কির নেশায় প্রায় মশগুল হয়ে এসেছে। হঠাৎ এদের এইভাব আসতে দেখে বলেন—কি হলো বাবা?'

মেয়েদের মধ্যে নমিতা বলে—'দুর্গার ঘরে যে পাঞ্জাবীটা আসতো—

সে মাতাল হয়ে ছোরা ঘোরাচ্ছে।'

পুষ্প বলে, 'দুর্গা কোথায়!'

নমিতা বলে, 'দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

অনঙ্গ বাবু আর এক পেগ হুইস্কি গলায় ঢেলে বলেন, 'দুর্গার ঘরে পাঞ্জাবীর হানা—নো-নো, দেন হি মাষ্ট নট বি এ পাঞ্জাবী, হি মাষ্ট বি জটাধারী মহাদেব।'

এমন সময় বীণা ছুটতে-ছুটতে এসে বলে, সর্বনাশ হলো, পাঞ্জাবীটা দুর্গার দরজায় যে রকম লাথি মারছে—দুর্গার কি হবে পুষ্পদি।'

পুষ্প নিজের মনেই বলে—'সত্যিই তো, খুব ভয়ের কথা—কি হবে?'

অনঙ্গ বলেন,—'কোন ভয় নেই, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা—শিশিরে কি বা ভয়?'

বীণা বলে—'এ শিশির নয়—ফুটন্ত জল।'

'জল ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।'—বলে অনঙ্গ বিছানা ছেড়ে উঠতে চান!

পুষ্প ভয় পেয়ে বাধা দিয়ে বলে—'না-না, আপনি যাবেন না, ওর হাতে ছোরা আছে।'

'হ্যাঙ্গ ইওর ছোরা'—বলে অনঙ্গ বেরিয়ে যান, মেয়েরাও বেরিয়ে যায় তার পিছু-পিছু। পুষ্প যায় অনঙ্গ'র সঙ্গে। উঠোনে প্রচুর ভিড়। অনেকে ভিড় করে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে সবারই চোখে মুখে ভয়।

একটা পাঞ্জাবী একটি ঘরের দরজায় লাথি মারছে, তার হাতে একটা ছোরা। কেউ কাছে যেতে সাহস করছে না।

অনঙ্গ তখন পুষ্পর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, সবাই তাঁকে যেতে বারণ করে। অনঙ্গ কারো কথা শোনেন না, এগিয়ে যান পাঞ্জাবীর দিকে। পাঞ্জাবী তখনোও ছোরা ঘোরাচ্ছে আর দরজায় লাথি মারছে। অনঙ্গ তার পেছন দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে অতর্কিতে পাঞ্জাবীর ছোরাশুদ্ধ হাত দু'টো জড়িয়ে ধরেন। দু'জনে ধস্তাধস্তি শুরু হয়, পুষ্প একপাশে ভয়ে সিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনঙ্গকে চিনতে পেরে পাঞ্জাবীটা একটু শান্ত হয়ে বলে—'কোন্—বাবু!

অনঙ্গ বলেন, 'হ্যাঁ, দাও—ছোরাটা দাও—' বলে তার হাত থেকে

ছোরাটা নিয়ে বলেন, 'কি হয়েছে বলো তো?'

পাঞ্জাবী প্রচুর নেশা করছে। কোনো রকমে জড়িত স্বরে বলে—'দুর্গা কেন বাড়ি খুলছে না বাবু, ও তো হামার, ওকে আমি মাসোহারা দিই'।

অনঙ্গ বলে, 'সে তো আমরা জানি, কিন্তু হলো কি?'

পাঞ্জাবী বলে, 'ও হামার, তবে উস্‌কা ঘরমে দুস্‌রা আদমি কাহাকে থাকে গা।'

অনঙ্গ বলেন -'বুঝেছি, তুমি রক্ষিতাকে সাধ্বি স্ত্রী করতে চাও—মানে দেশী হুইস্কিকে মিছরির সরবৎ বানাতে চাও। অলরাইট—'বলে দুর্গার দরজায় টোকা দিয়ে ডাকেন, 'দুর্গা, এই, দরজাটা খোলরে— দুর্গা—'

ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। পুষ্প বলে—'এই দুর্গা, দরজাটা খোল, কোনো ভয় নেই তোর।'

ধীরে-ধীরে দরজাটা খুলে দাঁড়ায় দুর্গা।

অনঙ্গ তাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করেন, 'ঘরে কেউ আছে?'

দুর্গা বলে—'না, কেউ নেই।'

পুষ্প বলে—'তবে দরজা খুলছিলি না কেন?'

দুর্গা বলে—'আমার বাচ্চাটার কাল থেকে খুব জ্বর'—আমায় কিছুতেই ছাড়ছে না।'—বলে পাঞ্জাবীকে দেখিয়ে বলে, 'ওকে আজ যেতে বলুন।' —বলে দরজাটা আস্তে-আস্তে বন্ধ করে দেয়।

পাঞ্জাবী কিছুই বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করে—'কেয়া বোলা?'

পুষ্প বলে—'আপনি আজ যান'।

পাঞ্জাবী অনঙ্গকে জিজ্ঞেস করে—'উও কেয়া বোলা?'

অনঙ্গ বলেন—'ও যা বলছে—তাতে তো দেশী হুইস্কি মিছরির সরবৎ হয়ে বসে আছে বাবা অজিত সিং।'

পাঞ্জাবী অনঙ্গ'র কথার কোনো অর্থই খুঁজে পায় না। বলে—'উও কেয়া বোলা?'

অনঙ্গ বলেন—'মানে, দুর্গা যে বাচ্চাটির কথা বললো—ওটা কি তোমার?'

পাঞ্জাবী বলে—'নেহি—নেহি।'

অনঙ্গ বলেন—'তুমি এখুনি বলছিলে, দুর্গা তোমার। দুর্গা যদি

হয়, তা'হলে দুর্গার ছেলেটিও নিশ্চয়ই তোমার, অতএব হয় তুমি বাসুদেব কিম্বা নন্দ।'

পাঞ্জাবী প্রশ্ন করে—'নন্দ কেয়া ?'

অনঙ্গ বলেন—'আরে আমাদের ওই কৃষন্‌জী আছেন না—কৃষন্‌জী তার দুই বাপ। এক বাপ হলো বাসুদেব, সে হলো আসল বাপ. আর এক বাপ হলো—নন্দ, সে হলো পালক বাপ। তাই বলছি হয় তুমি নন্দ কিংবা বাসুদেব। এখন তোমরা ওই ছেলেটির জন্যে তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার-টাক্তার নিয়ে এসো।"

পাঞ্জাবী বলে—'নেহি. হাম নেহি জায়ে গা।'

অনঙ্গ তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেন, 'যাও-যাও, হাজার হোক্ একটা বাচ্চা। তার অসুখ—'না' বলতে নেই, যাও-যাও।'

অনঙ্গর কথায় শেস পর্যন্ত রাজি হয়ে ডাক্তার ডাকতে যায় অজিত সিং। অনঙ্গ তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে হাঁফ ছেড়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে থাকেন। বলেন—'ওঃ ঘাম ছুটিয়ে দিল।'

পুষ্প বলে—'ওঃ আমার যা ভয় হয়েছিল—চলুন।'

ওরা ফিরে আসে পুষ্প'র ঘরে। পুষ্প গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিতে-দিতে বলে—'এমন গোঁয়ারতুমি করতে আছে।'

অনঙ্গ গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলেন—'কেন, আমার তো বেশ ভালোই লাগলো—কেমন নায়ক বনে গেলাম, মানে হিরো।'

পুষ্পর ঘরের বাইরের দিকের দরজাটা যে খোলা ছিল এতক্ষণ, গণ্ডগোলের মধ্যে পুষ্প বা অনঙ্গ কারুরই খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ দরজা দিয়ে নেপাল বাঁড়ুজ্যে ঢুকে পড়ে থমকে দাঁড়িয়ে যান। বলেন,—'এহে-হে, একটু বে-টাইমে এসে বিরক্ত করলাম।'

মুচকি হেসে অনঙ্গ বলেন—'সেকি মশাই বিরক্ত করবার রাইট তো আপনারই আছে। কারা সতীলক্ষ্মী পুষ্পকে তো আপনিই এ পথে এসেছেন। পুষ্প আপনার সৃষ্টি—আপনি তার স্রষ্টা।'

বিদ্রূপাত্মক সুরে অনঙ্গর কথাগুলি শুনে নেপাল একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। দেঁতো হাসি হেসে বলেন—'হেঁ-হেঁ কি যে বলেন, আমি তো নিমিত্ত মাত্রং—ভব সব্যসাচী, তা আমি বেশীক্ষণ থাকবো না। শোন

পুষ্প কাল দেশে যাচ্ছি, তা তোর মা গোটা তিরিশেক টাকা চেয়েছিল—'

বিস্মিতভাবে পুষ্প বলে—'মা !'

দু'বার ঢেঁকি গিলে, জোঁকের মতন ঠোঁট দু'টো জিভ দিয়ে চেঠে নিয়ে নিয়ে নেপাল বলেন—'হ্যাঁ দিবি না কি ?'

পুষ্প অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে অনঙ্গ'র দিকে দৃষ্টি ফেরায়।

অনঙ্গ হুইস্কি শেষ করে গেলাসটা টেবিল নামিয়ে রেখে নেপালের কাছে এগিয়ে এসে বলেন, 'আচ্ছা নেপালবাবু, ঘাস খেতে-খেতে গরুগুলোও মাঝে-মাঝে ওপর দিকে তাকায়, আপনি বোধহয় ভুলেও কোনদিন ওপর দিকে তাকনি না।'

নেপাল তার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বলনে—'মানে ?'

'মানে'—বলে একটু থেমে অনঙ্গ হঠাৎ নেপালের হাত ধরে 'চলুন বুঝিয়ে দিচ্ছি'—বলে প্রায় এক রকম টলতে-টলতে নেপালকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসেন। নেপাল অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়।

অনঙ্গ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্-ফিস্ করে বলেন—'পুষ্প জানে—'

নেপাল উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করেন—'কি জানে ?'

'তার মা মারা গেছে।'

'য়্যাঁ ?'—বলে আঁতকে ওঠেন নেপাল বাঁড়ুজ্যে।

অনঙ্গ বলেন, 'হ্যাঁ, এ পাড়ায় সবাই জানে। অতএব যবনিকা পতন।'—বলে অনঙ্গ পকেট থেকে তিরিশটা টাকা বার করে নেপালের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন—'নিন্'।

'না-না—'

'আরে মশাই 'না—না' বলতে আছে, কষ্ট করে এলেন, নিন্।'—বলে টাকাগুলো নেপালের হাতে গুঁজে দিয়ে প্রায় গলাধাক্কা দিয়েই নেপালকে দূর করে দেন।

* * *

সকালবেলা, হারাধন মশারী খুলছেন। ভূতু ছাড়া সব ছেলেমেয়েরা তখনো ঘুমুচ্ছে। কমলা মেঝেয় বসে চায়ের জল চড়াচ্ছে। ভূতু বাইরে থেকে দুধ আর খবরের কাগজ নিয়ে আসে। কাগজটা হারাধনকে দিয়ে

কমলার কাছে দুধের প্যানটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে—'নতুন মা তাড়াতাড়ি খেতে দাও, ইস্কুলের সময় হয়েছে।'

সৎছেলের প্রতি স্বভাবজাত রুক্ষস্বরেই বলে কমলা—'রান্নাঘরের তাকে খাবার আছে, নিয়ে খেগে যা।'

ভুতু আর বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করে রান্নাঘরে যায়। ছাখে তাকের ওপর একটি থালায় ছোট একখানা পোড়া রুটি আর একটুখানি গুড়—দেখে ভুতুর মুখটা করুণ হয়ে ওঠে। থালাটি তুলে নিয়ে রুটি আর গুড়টুকু মুখে পুরে চিবুতে-চিবুতে এসে কমলাকে বলে—'আর রুটি আছে' ?

'না'—বলে কমলা আপন মনে চা ছাঁকতে থাকে।

হারাধন লক্ষ্য করেন, নিমেষের মধ্যে ভুতুর খাওয়া হয়ে গেলো। ভুতু করুণ মুখে থালাটা ধীরে-ধীরে কমলার পাশে নামিয়ে রেখে স্নানের ঘরে যায় মুখ ধুতে। কমলা হারাধনকে চা দেয়। ভুতু মুখ ধুয়ে এসে হারাধনকে বলে—'বাবা, আজ আমার বইগুলো নিশ্চয় এনো।'

হারাধন বলেন—'আচ্ছা।'

ভুতু চলে যায় পাশের ঘরে। সেখান থেকে বই নিয়ে স্কুলে যায়। হারাধন জানালা দিয়ে তার যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকেন। হারাধনের মনটা ভারি হয়ে আসে। তার কত আদরের ভুতু আজ সৎমার হাতে পড়ে কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করে। পেটে ক্ষিধে, অথচ সব সময় পেট ভরে খেতে পায় না। ময়লা কিটকিটে জামা পরে থাকে। মাথায় তেল নেই, চুলগুলো উস্কোখুস্কো হয়ে হাওয়ায় উড়ছে। ভুতুর কিন্তু তবুও কোনো নালিশ নেই। কখনো কিছু বলে না কাউকে। হারাধন সবই লক্ষ্য করেন কিন্তু কমলাকে কিছু বলবার সাহস নেই তাঁর। এক কথা বললে কমলা তাঁকে হাজার কথা শুনিয়ে দেবে।

আধপেটা খেয়ে, রুক্ষ চুলে, ছেঁড়া ময়লা জামাপ্যাণ্ট পরে ভুতু স্কুলে চলেছে, হারাধন জানালা দিয়ে তার যাওয়ার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। কমলার দিকে ফিরে যতটা সম্ভব কথার স্বরে কোমলতা মিশিয়ে বলেন—'ভুতুর জন্যে আরও কিছু খাবার রাখলেই পারতে'।

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে কমলা—'এত সকালে ইস্কুল, আবার কি দেবো ?'

হারাধন তবুও ধীর স্বরে বোঝাবার চেষ্টা করে বলেন—'আহা রাগ

করছো কেন? দেখলে তো—কাল রাত্রে গলায় কাঁটা আটকে বেচারার খাওয়াই হলো না।'

বিদ্রূপের স্বরে বলে কমলা—'কি করে জানবো তোমার ছেলের গলায় কাঁটা আটকাবে?'

'যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বাজার থেকে কি আনতে হবে বলো'—বলে হারাধন ঠক্ করে চায়ের কাপটা টেবিলে রাখেন।

কমলা বোঝে ভুতুর জন্যে তার মনে জ্বালা উঠে কমলা। বলে—'রোজ যা আনো—তাই আনবে'—বলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে হারাধনের সামনে দাঁড়িয়ে শ্লেষের স্বরে বলে—'হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার আদুরে ছেলের জন্যে ভাল দেখে পেটির মাছ এনো।'

হারাধন আর মনের জ্বালা গোপন করতে পারেন না, তড়াক করে উঠে বাজারের থলি নিতে নিতে রুক্ষস্বরেই বলেন—'আমি তো সকলের জন্যেই আনবো'—বলে হন্‌হন্‌ করে তিনি বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। কমলা কট্‌মট্ করে তাকিয়ে থাকে তার যাওয়ার দিকে।

পুষ্পদের বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে হারাধন বাজারে যান। সারা রাস্তা ভুতুর কথায় ভাবতে-ভাবতে চলেন।

পুষ্প তখন তার ঘরে সদ্য স্নান করে এসে, লালপাড় গরদের শাড়ী পরে, আয়নার সমনে দাঁড়িয়ে সিঁথিতে দগদগে করে সিঁদুর দেয়, কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরে। তারপর হাতে মুখে গঙ্গাজল ছিটিয়ে, একটি থালায় ফল মিষ্টি আর একটি সাজিতে ফুল বেলপাতা, ধূপকাঠি ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে ষষ্ঠীতলায় পুজো দিতে যায়।

পার্কের পাশ দিয়ে চলেছে পুষ্প। দেখে ভুতুদের স্কুলের ছুটি হয়েছে ভুতু কয়েকটি ছেলের সঙ্গে বাড়ি ফিরছে। কাছাকাছি আসতেই স্নেহসিক্ত স্বরে পুষ্প বলে ভুতুকে—'কি গো খোকাবাবু, ইস্কুল থেকে ফিরছো?'

ছোট একটি "হ্যাঁ" বলে ভুতু চলে যায়। পুষ্প পূজোর থালা-সাজি হাতে নিয়ে তাকিয়ে থাকে তার যাওয়ার দিকে। তার সামনের সেই 'গৃহস্থবাড়ির' বউ—মলি খুব সেজে-গুজে, মুখের লিপষ্টিকটা ঠিক করতে করতে পুষ্পর সামনে দিয়ে চলে যায় গট্‌গট্ করে।

পুষ্প জানে, বউটি কোথায় চলেছে। স্বামীর কাজে বেরুনোর পর—

বউটি বেরিয়েছেন তার উপপতির কাছে। পুষ্প ভাবে, তবু এরা গৃহস্থ-বাড়ির কুলবধূ—আর আমরা··? এইসব নানাকথা ভাবতে-ভাবতে পুষ্প পার্কের বাঁধানো ঘাটটার পাশ দিয়ে চলে যায় ষষ্ঠীতলায় পূজো দিতে।

* * *

ভুতু বাড়িতে ফিরে বইগুলো রেখে তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে গিয়ে বলে, 'নতুন মা' খেতে দাও—বড় ক্ষিদে পেয়েছে।'

কমলা বলে, 'দেরী হবে।'

লক্ষ্মী বসেছিল মায়ের কাছে। বলে—'দাদা চান করবে না?'

ভুতু বলে, 'করবো।'

কমলা বলে—'হ্যাঁ, আগে চান কর।'

ভুতু তাড়াতাড়ি জামাটা খুলে এক খাবলা তেল নিয়ে মাথায় ঘষতে ঘষতে বলে, 'নতুন মা, পার্কের পুকুরে চান করে আসবো?'

কমলা বলে, 'যেখানে তোমার খুশী।'

এই কথা শুনে ভুতু যায় ছুটে পার্কের পুকুরে স্নান করতে। লক্ষ্মী বলে, 'মা, আমাদের খেতে দাও।'

স্নেহে গদ্ গদ্ হয়ে কমলা বলে—'এই যে মা, লক্ষ্মীমা পাটুকে নিয়ে এসে বোস্।'

লক্ষ্মী পাটুকে নিয়ে এসে বসে।

কমলা তাদের খেতে দিয়ে, একটা বড় কড়াই উনুনে চড়িয়ে তাতে জল, সোডা সোবানের টুক্‌রো দিয়ে কাপড় সেদ্ধ করতে দেয়।

ভুতু খুব তাড়াতাড়ি স্নান করে ফিরে এসে বলে—'নতুন মা তাড়াতাড়ি খেতে দাও, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।'

কমলা তখন সেদ্ধ কাপড়গুলো একটা ঝুড়িতে তুলতে-তুলতে বলে—'দাঁড়া, এই কাপড়গুলো আগে কেচে নিই।'

ভুতুর কথাগুলো যেন কান্না হয়ে বেরিয়ে আসে—'খুব ক্ষিদে পেয়েছে নতুন মা।'

ঝাঁঝিয়ে ওঠে কমলা—'দাঁড়া, বাবু যেন একবারে ঘোড়ায় জীন দিয়ে এলেন। এই কাপড়গুলো সব কাচবো, তারপর খেতে দেবো'—বলে কমলা আরও কতকগুলো নোংরা জামা-কাপড় কড়ায় ফেলে ডোবাতে থাকে।

ক্ষিদের জ্বালায় ভুতুর প্রায় চোখ ছল-ছল করে আসে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। কেঁদে গড়াগড়ি গেলেও যে নতুন মা'র কথা নড়চড় হবে না, এ কথা ভুতু ভালো করেই জানে। তাই বাধ্য হয়ে এঘরে চলে আসে ধীরে-ধীরে। ক্ষিদেয় তার পেট জ্বলতে থাকে। হঠাৎ ভুতুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে তাকে রাখা আচারের বড়-বড় কাঁচের জারগুলোর দিকে। তার জিভে প্রায় জল গড়িয়ে আসে। তবু আস্তে-আস্তে চৌকিতে উঠে আচারের একটা বড় জার তাক থেকে নামায়, কিন্তু খুলতে গিয়ে এক মহা সর্বনাশ ঘটে যায়। জারটা মাটিতে পড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে যায়। শব্দ শুনে ছুটে আসে কমলা জারটার অবস্থা দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। এলোপাথাড়ি প্রহার করতে থাকে ভুতুকে। মারতে-মারতে বাড়ি থেকে থেকে দূর করে দেয়।

ভুতু কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পার্কের পুকুরের সেই বাঁধানো ঘাটের রোয়াকে বসে দু'হাঁটুতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে-ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে। একে ক্ষিদের জ্বালা, তার উপর এই অমানুষিক প্রহার ভুতুর অসহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কি করবে সে? শুধু কান্নাটা আরও বাড়ে।

পুষ্প ষষ্ঠীতলার পূজো দিয়ে ফিরছিল। ভুতুর কান্না ততক্ষণে থেমে গেছে। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে নির্জন পার্কে একা বসে আছে ভুতু। খালি গা একটা ছেঁড়া ময়লা হাফপ্যাণ্ট পরনে, চুলগুলো না আঁচড়ানোর জন্য খোঁচা-খোঁচা হয়ে আছে। দূরে একটা ঘুঘুপাখী একটানা ডেকে চলেছে।

পুষ্প ভুতুকে দেকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যায় তার কাছে। বলে—'একি খোকাবাবু! এখানে বসে, বাড়ি যাও নি?'

ভুতু চুপ করে থাকে। পুষ্প আবার বলে—'যাও, বেলা হয়ে গেছে।'

কান্নাভাঙ্গা গলায় ভুতু বলে—'এখন গেলে নতুন মা মারবে।'

'মারবে কেন?'

'আচারের জার ভেঙ্গে ফেলেছি।'

'ভাত খাও নি?'

খাওয়ার কথায় ভুতুর চোখদু'টো জলে ভরে আসে। বলে—'না।'

'আহা রে।'—বলে পুষ্প তার পাশে বসে পূজোর থালা থেকে ফল মিষ্টি তুলে ভুতুকে দেয়, পূজোর ফুল ছুঁইয়ে দেয় ভুতুর মাথায়।

ভুতু ফল মিষ্টি হাতে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পুষ্পর দিকে। পুষ্প তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহসিক্তস্বরে বলে, 'খাও বাবা, এগুলো। সব তুমি খাও।'

ভুতু খেতে-খেতে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফ্যালে।

'ও কি! কাঁদছ কেন? কেঁদো না। খাও—' বলে পুষ্প আঁচল দিয়ে ভুতুর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সস্নেহে ভুতুকে নিজের হাতে ফল মিষ্টি খাওয়াতে থাকে।

আবাল্য মাতৃস্নেহে বঞ্চিত ভুতু আজ এই নির্জন পার্কে পতিতা ভুতুর মাতৃস্নেহে ধন্য হয়ে যায়, পরম তৃপ্তিতে পুজোর প্রাসাদ খেতে থাকে।

সন্তান ক্ষুধাতুরা বন্ধ্যা পুষ্পও আজ ভুতুকে নিবিড় করে বুকে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে।

* * *

ভুতুদের সৎ-মার সংসার। দিনরাত খিটিমিটি লেগেই আছে। আজ সকালেও সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ঘটে গেল একটা কাণ্ড। সকালে হারাধান দাড়ি কামাচ্ছেন। মেঝেতে বসে কমলা কুটনো কুটছে। বাইরে থেকে ঝি নাকুর-মা এলো। তাকে দেখে কমলা বিরক্তির সঙ্গেই বলে— 'আজ এতো দেরী করে এলে কেন গো নাকুর-মা?'

নাকুর-মা উত্তর দেয়, 'পাঁচ বাড়ির কাজ সেরে আসতে হয় তো দিদি, পাঁচ বাড়ির পাঁচ রকমের কাজ।'—বলতে-বলতে নাকুর-মা, ঝাঁটা হাতে নিয়ে বাহিরের ঘরের দিকে যায়। এমন সময় গাবুর কান্না শোনা গেল। কমলা দরজার দিকে চায়। ভুতু গাবুকে কোলে নিয়ে এসে বলে, 'কিছুতেই থাকছে না নতুন মা।'

মুখ বেঁকিয়ে বিকৃত স্বরে কমলা বলে, 'নিশ্চয় কিছু করেছো।—এসো বাবা, মাণিক আমার শোনা আমার'—বলতে-বলতে কমলা তার কোলের ছেলে গাবুকে কোলে নিয়ে আদর করতে থাকে।

হারাধন দাড়ি কামাতে-কামাতে বলেন—'ওরে ভুতু, তোর বই এনেছি দেখে নে।'

ভুতু আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে ছুটে যায় হারাধনের কাছে। বলে 'কই বাবা?'

'বাইরের ঘরে টেবিলে আছে ছাখ।' বলে হারাধন দাড়ি কামাতে থাকেন। ভুতু ছুটে যায় পাশের ঘরে। বইয়ের প্যাকেট খোলে। তার চোখে মুখে আনন্দ ধরে না।

লক্ষ্মী হারাধনের কাছে এগিয়ে এসে বলে—'বাবা, আমার বই?'

'তোমায় তো অনেক বই কিনে দিয়েছি।'

'ওগুলো ছিঁড়ে গেছে।'

'সেদিন যে "হাসিখুশী" কিনে দিলাম?'

'সেটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ছাখ্ খুঁজে ছাখ্! না তো মাকে বল্ খুঁজে দেবে।—এঃ কেটে গেল।' বলে হারাধন ছাখেন, দাড়ি কামাতে-কামাতে তিনি কথা বলছিলেন, তাই তার অন্যমনস্কতার জন্যে গালের বেশ খানিকটা জায়গা কেটে গেছে। লক্ষ্মী সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না, বই না পাওয়ার জন্যে অভিমানে মুখ নামিয়ে মা'র কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কমলাও ভেতরে-ভেতরে গিস্‌গিস্ করতে থাকে। ওপরে কিছু বলে না, শুধু আনাজ কোটার হাত দুটো একটু দ্রুত তালে চলতে থাকে।

হারাধন বাইরের ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকেন—'ভুতু—'

ওঘর থেকে সাড়া দেয় ভুতু—'কি বাবা?'

'তাক থেকে ডেটলটা নিয়ে আয় তো গালটা একটু কেটে গেছে।'

ভুতু তাড়াতাড়ি ডেটল নিয়ে আসে। হারাধন ডেটল নিয়ে গালে লাগায়। ভুতু সমব্যাথীর মতন সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

ডেটল লাগিয়ে শিশিটা ভুতুর হাতে দিয়ে সস্নেহে হারাধন বলেন—'এই নে বাবা, রেখে দে লক্ষ্মী সোনা আমার।'

ভুতু ডেটলের শিশিটা নিয়ে ওঘরে চলে যায়। কমলা অকারণে লক্ষ্মীকে খুব মারতে থাকে আর বলে—'আর বইয়ের নাম করবি। বই চাই—বই চাই—আর বই নিবি?'

হারাধন বলেন—'আঃ—মারছো কেন ওকে?'

ঝাঁঝালো স্বরে কমলা বলে—'কেন মারছি তা তুমিও জানো, ন্যাকা সাজছো কেন?'

হারাধন সব বোঝেন, কিন্তু কোন কথা না বাড়িয়ে চুপ করে থাকেন। তার এই নীরবতা কমলার মনে আরও জ্বালা ধরিয়ে দেয়। লক্ষ্মীকে আবার মারে, পাটু পাশে বসেছিল, তাকেও মারে অকারণে, তারপর গাবুকে ধুম্ করে কোল থেকে মেঝেতে বসিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। লক্ষ্মী, পাটু ও গাবু তিনজনেই তারস্বরে চীৎকার করে কাঁদতে থাকে। এ পরিবেশ অসহ্য লাগে হারাধনের, কিন্তু উপায় নেই—এ ফলের গাছ তার নিজের হাতে লাগানো।

কমলার এই মারমূর্তি দেখে ভুতুর ভয় হয়। ভাবে, রোজকার মতন আজকেও সব জ্বালা এসে পড়বে তার ওপর! তাই ভুতু এক ফাঁকে গুটি পায়ে বেরিয়ে যায় বাড়ি থাকে। পুষ্পর স্নেহসিক্ত ব্যবহারের কথা মনে হয় ভুতুর, তাই ধীরে-ধীরে এসে উপস্থিত হয় পুষ্পর ঘরের দরজায়।

পুষ্প তখন গৃহকর্মে ব্যাস্ত ছিল। হঠাৎ দেখে—ভুতু তার দরজার পর্দাটা একটুখানি ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছে।

একমুখ হেসে পুষ্প তার কাছে এগিয়ে এসে বলে—'আরে, খোকাবাবু যে গো, এসো-এসো, কোনো ভয় নেই এসো—'বলে ভুতুর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এসে বসায়। বলে—'বোসো বাবা—বোসো।'

ভুতু তক্তাপোষের বিছানায় বসে অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ছাখে। পুষ্প বলে, 'তোমার নাম ভুতু তো?'

ভুত বলে—'ওটা ডাক নাম, ভালো নাম শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়। তুমি কি করে জানলে?'

'আমি তোমাকে ছোটবেলায়—'বলেই থেমে যায় পুষ্প।

ভুতু প্রশ্ন করে—'ছোটবেলায় কি?'

পুষ্প কথা ঘুরিয়ে বলে—'না, মানে, তুমি আমাদের পাড়ার ছেলে, নাম জানবো না। তোমার দেশ কোথায়?'

ভুতু বলে—'কার্তিকপুর।'

পুষ্প আদর করে ভুতুর গাল টিপে দিয়ে বলে—'আহা, কার্তিকপুরের আমার কার্তিকঠাকুর, দাঁড়াও—'বলে পুষ্প একটা কৌটা থেকে বিস্কুট এনে ভুতুর হাতে দিয়ে বলে—'খাও বাবা।'

ভুতু বিস্কুট খায়। পুষ্প তার পাশে বসে সস্নেহে গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে বলে, 'আচ্ছা ভুতু বাবু'—

'উঁ ?'

'তুমি যে আমাদের এখানে এসেছো, তোমার বাবা-মা বকবে না' ?

'কেন ?'

বলে ভুতু বিস্কুট খেতে-খেতে পুষ্পর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

পুষ্প কথা ঘুরিয়ে বলে, 'না, এমনি বলছিলাম। আজ ইস্কুল নেই ?'

সন্তানহীনা পুষ্প তৃষিত চোখে ভুতুর মুখের দিকে চেয়ে করুণ স্বরে বলে—'কি করে জানবো বাবা, আমার তো আর 'তুমি' নেই। রোজ একবার করে আসবে তো ?'

'আসবো এখন চলি—'

'এক্ষুণি চলে যাবে ?'

'হ্যাঁ, বাবা নতুন বই এনেছে—পড়তে হবে না—

বলে হাসিমুখে পুষ্পর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

পুষ্প বলে—'ও বাবা, নতুন বই না হলে বুঝি পড়তে মন বসে না ?'

ভুতু বলে—'যাঃ—তা কেন ? নতুন বইয়ের নতুন পড়া মুখস্থ করতে হবে না ?'

'আচ্ছা বাবা এসো। আর তোমায় এখন ধরে রাখবো না, রোজ একবার করে এসো কিন্তু।'

ভুতু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যায়। পুষ্পও তার পিছু-পিছু বাইরে এসে দাঁড়ায়। ভুতু তাদের বাড়ির দিকে যেতে-যেতে বার-বার পেছন ফিরে পুষ্পকে দ্যাখে, পুষ্পও হাসি মুখে তার দিকে চেয়ে থাকে ভুতু তাদের বাড়িতে ঢুকে গেলে তবে পুষ্প ঘরে ফিরে যায়।

ভুতুর আসায় আজকে সকালটা সবদিনের চেয়ে বেশী সুন্দর বলে মনে হয় পুষ্পর, সুন্দর একটা কোমল আবেশে তার মনটা ভরে যায়। গুন্‌গুন্ করে আপন মনে গান গাইতে-গাইতে বাড়ির কাজ সারতে থাকে পুষ্প।

দুপুরবেলা। ভুতু তাদের বাইরের ঘরে নতুন বই নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়তে বসেছে। পাশের ঘরে কমলা পাটু ও গাবুকে নিয়ে ঘুমুচ্ছে, লক্ষ্মী জেগে আছে। সবাই ঘুমিয়েছে দেখে লক্ষ্মী ধীরে-ধীরে পা টিপে-টিপে

উঠে গিয়ে ভুতুর পাশে দাঁড়ায়। ভুতু তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনেই পড়ে চলেছে, মাঝে-মাঝে নতুন বইগুলোর নতুন-নতুন ছবি দেখছে। লক্ষ্মীও দেখছিল, হঠাৎ ছোঁ মেরে ভুতুর সামনে থেকে একটা ভালো ছবির মলাট দেওয়া বই নিয়ে দৌড়ে ওঘরে পালায়। ভুতুও ছুটে যায় তার পিছু-পিছু। বইটা লক্ষ্মীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য।

আগে লক্ষ্মী সুন্দর মলাটটা ছিঁড়ে ফেলে বইটা মেঝেতে ছুঁড়ে দেয়। ভুতু দেখে আঁতকে ওঠে। খপ্ করে লক্ষ্মীব চুলের মুঠি ধরে মারতে থাকে। মারের চেয়েও অনেক বেশী জোরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে লক্ষ্মী, কমলার ঘুম ফেঙ্গে যায়। তিক্ত বিরক্ত হবে বলে, 'আঃ, কি হচ্ছে কি?'

ভুতু ছেঁড়া বইটা তুলে নিয়ে কমলাকে দেখিয়ে বলে—'আমার নতুন বইটা লক্ষ্মী ছিঁড়ে দিয়েছে ছাখো—'

ঝঙ্কার দিয়ে কমলা বলে—'ভালো করে রাখলেই পারতে। এই লক্ষ্মী, এখানে শো, ওঘরে গেলে মেরে ফেলবে। ভুতু যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে।' বলে ভুতুকে বকে ঘর থেকে বার করে পাশ ফিরে শোয় কমলা। লক্ষ্মী তার পাশে এসে শুয়ে দুষ্টুমির দৃষ্টিতে ভুল্‌ভুল্ করে তাকিয়ে থাকে।

ভুতু ধীরে-ধীরে এ ঘরে আসে। বইটার অবস্থা দেখে তার কান্না পায়। তাক থেকে আঠার শিশিটা এনে ছেঁড়া মলাটটা জোড়া দিতে থাকে।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পুষ্প তার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করছে। এমন সময় ভুতু এসে দাঁড়ালো পাশে।

পুষ্প তখন সাজগোজ করতে খুব ব্যস্ত। শুধু হাসিমুখে একবার ভুতুর দিকে চেয়ে বলল—'এসো ভুতুবাবু!'

বলে পাউডাব মুখে, কপালে কালো একটা টিপ পরল।

ভুতু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছাখে। এর আগে পুষ্পকে এমন সাজ-গোজ করতে দেখে নি ভুতু—তাই তার অবাক লাগে। ঘরটাও এখন খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ভুতু চারিদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল, হঠাৎ কিসের ওপর তার দৃষ্টিটা থেমে যায়। ছাখে একটি বড়

প্লেটে অনেকগুলো বড়-বড় সিঙ্গাড়া রয়েছে। ভুতু সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলে—'ওগুলো কি?'

পুষ্প বলে—'ওগুলো ফুলকপির সিঙ্গাড়া।' বলে পুষ্প দেখে ভুতু সেগুলোর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তাড়াতাড়ি পুষ্প বলে—'ওগুলো বাসী, খেতে নেই, আমি তোমাকে কাল খুব ভাল সিঙ্গাড়া আনিয়ে দেবো, আজকে দুটো সন্দেশ খাও।' বলে পুষ্প ভুতুকে সন্দেশ এনে দেয়। ভুতু সঙ্গে-সঙ্গে খেতে আরম্ভ করে। পুষ্পর ঘরে কিছুদিন ধরে যাওয়া আসার জন্য ভুতুর এখন লজ্জা, সংকোচ, ভয় প্রায় কেটে এসেছে।

পুষ্প কিন্তু একটু বিব্রত বোধ করে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, অনঙ্গবাবু হয়তো এখুনি এসে পড়বেন। আশপাশের গলিতে, বাড়িতে লোকজন ঢুকতে আরম্ভ করেছে। কোনো-কোনো ঘর থেকে হারমোনিয়াম, তবলার আওয়াজও ভেসে আসছে।

পুষ্প একটু চঞ্চল হয়ে পড়ে। কিন্তু যতটা সম্ভব চঞ্চলতা গোপন করার চেষ্টা করে বলে—'ভুতুবাবু, তুমি এবার বাড়ি যাও।'

ভুতু যেন আকাশ থেকে পড়ে—'কেন?'

পুষ্প আম্‌তা-আম্‌তা করে বলে—'না রাত হয়ে এলো—পড়বে না?'

ভুতু পুষ্পর মনের কথা বুঝতে পারে না, তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলে—'সে পড়বো এখন।'

পুষ্প গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভুতুকে বোঝানোর চেষ্টা করে। বলে—'না বাবা, তুমি এখন যাও, অন্য লোকজন আসবে এখানে, তাদের সামনে তোমাকে থাকতে নেই!'

ভুতুর যেন এখানে যেমন খুশী আসার, যখন খুশী থাকার একটা অধিকার আছে। সেই ভাবে সে বলে—'আমি থাকবো, কি করবে তারা?'

পুষ্প ভুতুর এই জেদে আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন কাকুতি-মিনতি করতে থাকে ভুতুর কাছে, বলে—'কিছুই করবে না বাবা, তোমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না, তুমি যাও, এমন করে না লক্ষ্মীটি, যাও বাবা।'

ভুতুর আশ্চর্য লাগে, সে এখান থেকে চলে যেতে চাইলে পুষ্প তাকে যেতে দেয় না, যতক্ষণ পারে আটকে রাখার চেষ্টা করে, সেই সেই পুষ্প এখন তাকে তাড়ানোর জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন? কে এমন লোক

আসবে তার বাড়িতে, যার জন্যে ভুতুকে এখুনি চলে যেতে হবে? এই সব নানা কথা ভেবে বলে—'লোকেরা তোমার কে হয় ভাই?'

'না—না, সে তুমি বুঝবে না বাবা, লক্ষ্মী সোনা আমার, এখন যাও, আমি কাল তোমার জন্যে ভালো-ভালো ফুলকপির সিঙ্গাড়া, সন্দেশ, গজা আনিয়ে রাখবো, এখন যাও বাবা!'—বলে পুষ্প এক রকম জোর করেই ভুতুকে ঘর থেকে বার করে দেয়। ভুতু আর কিছু না বলে ধীরে-ধীরে চলে যায়। পুষ্প তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মাতৃ হৃদয় কেমন যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুচড়ে ওঠে, কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি তার? ভুতু যদি তার এই জঘন্য জীবন-যাত্রার কথা জানতে পারে, ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে নেবে। দুনিয়ার সকলের ঘৃণা সহ্য করতে পারবে পুষ্প, কিন্তু ভুতু যদি তাকে ঘৃণা করে, তা'হলে সেই লজ্জিত মুখ লুকোবার জায়গা ইহজগতে খুঁজে পাবে না পুষ্প। অবশ্য অন্যান্য বারবণিতাদের চেয়ে তার জীবন যাত্রার অনেক তফাৎ—একমাত্রই অনঙ্গবাবুই তার এই পথের সাথী, অন্য কেউ তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে সাহস করে না।

পুষ্পর জীবন নেহাৎ বারবণিতার জীবন নয়। নেপাল বাঁড়ুজ্যে তাকে আরও—আরও অনেক নীচে নামাতে চেয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে পুষ্পকে বাঁচিয়েছিলেন এই অনঙ্গ দত্ত, তাই অনঙ্গ দত্ত'র কাছে পুষ্প কৃতজ্ঞ।

অনঙ্গ দত্ত'র সঙ্গে সম্পর্ক খাদ্য-খাদকের মতন নয়। দিনের পর দিন পরস্পরের সাহচর্যে একটা মধুর ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে, কিন্তু এসব কথা আজ আর কেউ বিশ্বাস করবে না। পতিতা পতিতাই, তার আর অন্য কোন জাত নেই।

জানলার গরাদ ধরে পুষ্প চুপ করে দাঁড়িয়ে। অনঙ্গবাবু এখনো আসেন নি। অন্যান্য ঘরগুলি থেকে নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় ভেসে আসছে। পুষ্প উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভুতুদের বাড়ির দিকে।

* * *

অনঙ্গ দত্ত'র আজ তার বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল—প্রায় সাড়ে সাতটার সময় বাড়িতে ফিরলেন। সঙ্গে দু'জন সহকর্মী বন্ধু—সুধাংশু আর বিনয়। বালিগঞ্জের একটি সুন্দর পরিবেশে অনঙ্গ দত্ত'র বাড়ি। ওরা এসে বাইরের ঘরে ঢুকলেন। এটা অনঙ্গ'র

ড্রইংরুম। রুমটি আভিজাত্যের চিহ্নে ভরা। ক্লান্ত দেহে ঘরে ঢুকতেই অনঙ্গ বলেন, 'ওঃ ড্যাম্ টায়ার্ড—আজ কি ভোগান্তিটাই না হলো।'

বিনয় হাই তুলে বলে—'যা বলেছ। অনঙ্গ কাল তুমি যেন ওখানে ফোনটা করতে ভুলো না।'

অনঙ্গ বলেন—'না-না। বোসো।'

বিনয় বলে—'না ভাই, আমি চলি।'

অনঙ্গ বলেন—'সে কি হে! এতদিন পর আমার বাড়িতে এলে, এসেই চলে যাবে?'

বিনয় বলে—'হ্যাঁ ভাই, আমার একটু তাড়া আছে।'

সুধাংশু প্রশ্ন করে—'কিসের তাড়া?'

বিনয় বলল, 'আমার জন্য একজন ওয়েট্ করে থাকবে।'

সুধাশু বলে, 'সে কি হে, তোমার তো বউ নেই যে, ওয়েট্ করে থাকবে। থাকো তো মেসে।'

বিনয় বলে—'না ভাই, আমার একটা শাঁসালো পার্টি আসবে। আমি চলি, গুড্ নাইট—' বলে বিনয় তাড়াতাড়ি চলে যায়।

অনঙ্গ সুধাংশুকে বলেন—'বোস সুধাংশু। সুধাংশু সোফায় গা এলিয়ে দিতে-দিতে বলে—'জেঠ্মল আজকে হোল্-ডে-টা নষ্ট করলে।'

অনঙ্গ বলেন—'তিন ঘণ্টা বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে।'

সুধাংশু বলল—'অথচ দ্যাখো কোন কাজ হলো না।'

'কাজ হলো বৈ কি?'

'কি কাজ?'

'ও ব্যাটা যে কতখানি ত্যাঁদোড়—সেটা বোঝা গেল, এই অভিজ্ঞতাটাই কাজ।'

অনঙ্গ'র এই কথা শুনে সুধাংশু হো-হো করে হেসে ওঠে, তারপর হাসতেই হাসতেই বলে—'তোমার মিসেস্‌কে চা খাওয়াতে বল।'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়, নিভা—নিভা—' বলে অনঙ্গ তার মিসেস্‌কে ডকেতে থাকেন। কিন্তু কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। অনঙ্গ আবার ডাকেন—'নিভা—নিভা—'

ডাক শুনে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে একটি চাকর। থতমত খেয়ে

বলে, 'আজ্ঞে সাহেব, মেমসাহেব তো নেই।'

অনঙ্গর হাসিমুখ গম্ভীর হোয়ে যায়। বলেন—'ও, তা তুমি আমাদের জন্য চট করে দু'কাপ চা করে দাও।'

'আচ্ছা'—বলে চাকরটি আবার খুব ব্যস্তভাবেই ভেতরে চলে যায়।

অনঙ্গ বলেত—'সুধাংশু'! তুমি একটু বোসো ভাই'—বলে নিজের সার্ট-টাই দেখিয়ে বলেন—'আমি আমার মলাটটা বদলে আসি।'

সুধাংশু হেসে বলে—'এসো।' বলে নিজের সিগারেটের প্যাকেট খুলে ছাখে খালি।

অনঙ্গ চলে যাচ্ছিলেন, সুধাংশু বলে—'তুমি প্লিজ একটা সিগারেট দিয়ে যাও ভাই। মাই প্যাকেট ইজ্ এম্প্‌টি।'

অনঙ্গ তার সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই দিয়ে ভেতরে যান।

* * *

অনঙ্গ'র শোবার ঘরটা দামী-দামী আসবাবে সাজানো, কিন্তু বড্ড বেশী অগোছালো। আলনায় স্তূপীকৃত জামা-কাপড়, মশারীটা ভালোভাবে তোলা হয় নি, ব্যাটনে একটা সায়া-ব্লাউজ ঝুলছে। বিছানায় দামী বেডকভারটায় দামী সিল্কের শাড়ী খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গড্‌রেজের আলমারিতে চাবিটা লাগানোই রয়েছে। টেবিলে স্তূপীকৃত সিনেমা ও আমেরিকান ম্যাগাজিন, তার ওপর দু'টো চায়ের কাপ পড়ে রয়েছে, দু'টো ডিসে আধ খাওয়া প্যাটিস—কারা যেন একটু আগেই চা খেয়ে গেছে। অনঙ্গ এইসব দেখতে-দেখতে তাঁর মনে হয় এটা যেন জঞ্জালের আস্তাকুঁড়। নিজের মনেই ধিক্কার দেন তাঁর স্ত্রী নিভাকে আর নিজের মনেই স্বগতোক্তি করেন—'এই নতুন চাকর ব্যাটাও কিছু দেখে না,'—বলে টেবিলে মানিব্যাগটা রেখে কোটটা খুলে চারিদিকে তাকিয়ে হ্যাঙ্গার খুঁজে পান না। আলনায় তো তিলার্ধ স্থান নেই, তা ছাড়া পায়জামা কই? ধুতিও তো নজরে পড়ছে না। অনঙ্গ ডাকেন—'বলরাম—বলরাম।'

কারো কোনা সাড়া নেই, অনঙ্গ বিরক্তি বোধ করেন, আবার ডাকেন—'বলরাম, ওহে বলরাম—'

'সাহেব আমাকে ডাকছেন?'—বলে চাকরটি এসে দাঁড়ায়।

অনঙ্গ বলেন—'ডাকলে সাড়া দাও না কেন হে বলরাম?'

চাকরটি বলে, 'আজ্ঞে আমার নাম বলরাম নয়—বলহরি। আমায় হরি বলেই ডাকবেন।'

অনঙ্গ বহেন—'সরি, আমি ভুল করে তোমার দাদাটিকে ডেকে ফেলেছি। তবে কি জানো হরি—তোমার দাদাটি কিন্তু লোক খারাপ ছিল না, চাষ আবাদ করতো। আর আমার মতন অমৃত-টমৃত পান করতো, বেশ মেজাজি মানুষ ছিল—কি বল বলরা—সরি—'

'হ্যাঁ বলহরি, তা ছ্যাখো বলহরি, আমি এখন ট্রাউজারটা খুলবো, আমার পায়জামা-টায়জামা দাও। আর কোট্টা—'

বলহরি অনঙ্গ'র হাত থেকে কোটটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায় পায়জামা আনতে। অনঙ্গ'র রিষ্টওয়াচটা খুলে রেখে টাইটা খুলতে থাকেন। এমন সময় বলহরি এসে বলে—'সাহেব, পায়জামাটা শুকোয় নি, ভিজে রয়েছে।'

অনঙ্গ বলেন—'ও, তাহ'লে একটা ধুতিই দাও।'

'ধুতি? আচ্ছা।'—বলে বলহরি আবার চলে যায়।

অনঙ্গ জুতো মোজা খুলে চটিটা খুঁজে নিয়ে পায়ে দেন।

বলহরি আবার খালি হাতে এসে বলে, সাহেব ধুতিও পাচ্ছি না। চানের ঘরে একটা আকাচা পড়ে রয়েছে, ঝি কেচে যায় নি।' বলে হরি আলনায় আগোছালো জামা-কাপড়গুলো আরো আগোছালো করে খুঁজতে-খুঁজতে বলে—'এখানেও তো কোনো ধুতি পাচ্ছি না।'

বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে অনঙ্গ বলেন, 'সেকি হে শ্রীহরি, তুমিই না একদিন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় আন্‌লিমিটেড্‌ নাম্বার অফ্‌ শাড়ী সাপ্লাই করেছিলে, আমার জন্যে একটা ধুতিও জোটাতে পারছো না? আরে ছ্যা-ছ্যা—'

অপরাধীর মত বলহরি বলে, 'বোধহয় লণ্ড্রী থেকে আনা হয় নি।'

'বেশ, আমাদের দু'জনকে দু'কাপ চা দিয়ে তুমি তাহ'লে লণ্ড্রীটা একবার ঘুরে এসো।' বলে বাইরের ঘরে চলে যান অনঙ্গ।

তার-সার্ট-টাই দেখে সুধাংশু প্রশ্ন করে, 'একি মলাট বদলালে না?'

অনঙ্গ ধীরে-ধীরে সোফায় বসতে-বসতে ম্লান হেসে বলেন—'মলাট কখন বদলায় জানো সুধাংশু, বইয়ের যখন নতুন-নতুন এডিশন হয়। যে

বইয়ের যত কাটতি, সেই বইয়ের তত এডিশনে তত রকম মলাট। আমার বাড়িতে 'আমি' নামক পুস্তকটির একেবারে কাটতি নেই, কাজেই এডিশনও হয় না, তাই-ই মলাটও বদলায় না।'

কথাগুলো যেন অনঙ্গ'র বুক ভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতন বেরিয়ে আসে। মুখে তাঁর ম্লান হাসি। সুধাংশু বুঝতে পারে না তার দুঃখ, কথাগুলো নেহাৎই অনঙ্গ'র হিউমার বলে হাসতে থাকে। এমন সময় বলহরি এসে বলে—'সাহেব, চা খাওয়ার একটু মুস্কিল আছে।'

অনঙ্গ প্রশ্ন করেন—কেন?'

হরি বলে—'দুধটা ছিঁড়ে গেছে।'

অন্যমনস্ক অনঙ্গ বলেন—'ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করে নে।'

'আজ্ঞে—দুধ কি করে সেলাই করবো? পচে গেছে যে।'

সুধাংশু এদের কথা শুনে হো-হো করে হেসে ওঠে। অনঙ্গ তাঁর অন্যমনস্কতার ভুল বুঝতে পারে। একটুখানি চুপ করে হরির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করেন—'তোর মেম সাহেব কোথায় গেছেন?'

বলহরি জবাব দেয়—'সেলুনে চুল বাঁধতে।'

বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে সুধাংশু বলে—'সেলুনে চুল বাঁধতে!'

অনঙ্গ বলেন—'ইয়েস্। আজকালকার মেয়েরা তো বাড়িতে খোঁপা বাঁধে না, সব ওই সেলুনে গিয়ে হেয়ারে-ডু—। তা হরি, তুমি না হয় আমাদের জন্যে সামনের রেষ্টুরেন্ট্ থেকেই দু'কাপ চা নিয়ে এসো'।

সুধাংশু বাধা দিয়ে বলে—'থাক—থাক হরি, তুমি যাও। আমি বাড়িতে গিয়েই চা খাবো।'

অনঙ্গ বলেন—'তা খাবে জানি, কিন্তু আমরাও এখন এক কাপ চায়ের একান্ত প্রয়োজন।'

সুধাংশু বলে—'তুমিও চল না আমার বাড়িতে, এই তো কাছেই। আমার স্ত্রী বাড়িতেই খোঁপা বাঁধে। এখন গেলেই—যত্ন করে লুচি-আলু-চচ্চড়ি খাওয়াবে—চল না।'

অনঙ্গ কিছু না বলে শুধু একটু ম্লান হাসি হাসেন। তারপর একটু-খানি চুপ থেকে বলেন—'সত্যি সুধাংশু ইউ আর লাকি। তোমার স্ত্রী বাড়িতে খোঁপা বাঁধে। তোমার অপেক্ষায় আসা-পথ চেয়ে বসে থাকে।

তুমি ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরলে, তোমায় যত্ন করে লুচি-আলুচচ্চড়ি খাওয়াবে কিন্তু আমার ছাখো—নো হোম। আমার জন্যে, আমার বাসায় কেউ কখনো অপেক্ষা করে থাকে না।'—বলে অনঙ্গ তাঁর বুক থেকে ঠেলে আসা দীর্ঘশ্বাসটাকে কোনো রকমে চেপে রেখে আবার ম্লান হাসি হাসেন।

সুধাংশু বলে,—'ছাখ ভাই অনঙ্গ, আমি বলবো—এর জন্য তুমিই দায়ী। তুমি রাত কাটাবে অন্য জায়গায়, তোমার সতীসাধ্বী স্ত্রী সহ্য করবে কেন?'

অনঙ্গ বলেন—'সুধাংশু, মেয়েদের সতীসাধ্বী হওয়াটা কোয়ালিফিকেশন। স্ত্রৈণ পুরুষকে মেয়েরা পছন্দ করে না। আমি স্ত্রৈণ নই বলে স্ত্রীকে অবহেলা করি না, কিন্তু তার এই অতি আধুনিকতা আমি স্ট্যাণ্ড্ করতে পারি না।'

এমন সময় টেলিফোনটা বেজে ওঠে। হরি এসে রিসিভার তুলে বলে—'হ্যালো—আমি হরি। ও—মেমসাহেব—হ্যাঁ···হ্যাঁ, এসেছেন—ডেকে দেবো?'

অনঙ্গ ও সুধাংশু উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে হরির দিকে। হরি 'আচ্ছা—আচ্ছা' বলে ফোনটা কেটে দিয়ে এগিয়ে এসে বলে—'সাহেব, মেমসাহেব ফোন করছিলেন, বললেন—'উনি ওখান থেকেই পার্টিতে চলে যাবেন—ফিরতে রাত হবে।'

বলে হরি ভিতরে চলে যায়। অনঙ্গ চুপ করে বসে থাকেন।

সুধাংশু বলে—'আমি তাহলে চলি ভাই।'

অনঙ্গ উদাস ভাবেই বলেন—'যাবে? আচ্ছা এসো'—

সুধাংশু আবার অনুরোধ করে বলে—'তুমিও চল না আমার সঙ্গে।'

অনঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বলেন—'না ভাই, ধন্যবাদ।'

সুধাংশু চলে যায়। অনঙ্গ বসে-বসে তাঁর সংসারের কথা, অতি আধুনিক স্ত্রীর কথা চিন্তা করতে থাকেন।

একটু পরে হরি এসে বলে—'দোকান থেকে চা এনে দেবো?'

অনঙ্গ বলেন—'না থাক, তুই বরং লণ্ডী থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়ে আয়।'

হরি যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলে—'টাকা না দিলে আনবো কি করে?'

অনঙ্গ বলেন—'ঐ ঘরের টেবিলে মানিব্যাগে টাকা আছে, নিয়ে যা।'

হরি এ ঘরে এসে ব্যাগ থেকে কয়েকটি টাকা চুরি করে পকেটে পুরে একটি টাকা লণ্ড্রীর রসিদ নিয়ে ধুতি পাঞ্জাবি আনতে চলে যায়। বিরাট বাড়িতে একা চুপ করে বসে থাকেন অনঙ্গ দত্ত। সব কিছু শূন্য মনে হয়। অসহ্য লাগে তাঁর এই জীবনযন্ত্রণা, উঠে পায়চারী করেন। স্ত্রী নিভার আচার ব্যবহার, ত্যাচ্ছিল্য, জ্বালা ধরিয়ে দেয় অনঙ্গ'র মনে।

ধীরে-ধীরে আবার এসে সোফায় বসেন। অস্বস্তি বোধ করেন, আবার উঠে গিয়ে ফ্যানের স্পিড্টা বাড়িয়ে দেন। ফিরে এসে আবার সোফায় বসেন, টেবিলে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নেন্—সেটা ধরবার আগেই টেলিফোনের রিং হয়। অনঙ্গ উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে বলেন, 'হ্যালো,—না—নিভাদেবী নেই। হ্যাঁ,···না, পার্টিতে গেছেন। আমি? আমি তার স্বামী।···আজ্ঞে? না, কিসের পার্টি··তা তো বলতে পারবো না। হ্যাঁ···না, নমস্কার' বলে অনঙ্গ রিসিভারটা রেখে দিয়ে অত্যন্ত অন্যমনস্কতায় না ধরাণো সিগারেটে দু'টি টান দিয়ে ছাখেন, সেটা ধরানো হয় নি। ধীরে-ধীরে আবার এসে সোফায় বসেন। টেবিল থেকে দেশলাইটা নিয়ে সিগারেটটা খুলে লাগিয়ে ধরাতে গিয়ে ছাখেন, দেশলাইয়ে একটিও কাঠি নেই। খালি দেশলাইয়ের বাক্সটা দু'বার কপালে ঠুকে শূন্য হাসি হেসে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। অধরা সিগারেটটা মুখে চেপে মাথার উপরে ফ্যানটার দিকে তাকান। ফ্যানটা তাঁকে বিট্রে করে নি—যথাসাধ্য বন্বন্ করে ঘুরে চলেছে।

* * *

পুষ্প অনঙ্গ'র যাত্রাপথ চেয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে আজ তার আসতে এতো দেরী হচ্ছে কেন? হঠাৎ ছাখে গলির ও'পাশের বড় রাস্তাটার অনঙ্গ'র রিক্সা এসে থামলো। পুষ্প তাড়াতাড়ি জানালা থেকে সরে গিয়ে আলনার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনটা আর একবার ঠিক মতন সাজানো-গোছানো ঠিক আছে কিনা দেখতে থাকে।

অনঙ্গ তখন পানের দোকান থেকে সিগারেট নিচ্ছেন কিন্তু কান দুটো তার সজাগ হয়ে আছে গৃহস্থবাড়ির দরজায়।

গৃহস্থবাড়ির বউ—মলি তখন বয়ফ্রেণ্ড রমেনের সঙ্গে কথা বলছে। রমেন বলছে, 'আমার এভাবে তোমার এখানে ভয় করে।'

মলি প্রশ্ন করে, 'কেন ?'

রমেন বলে, 'তোমার কর্তার কাছে যদি কোনদিন ধরা পড়ে যাই ?'

'যাঃ এসো, ভেতরে এসো।' বলে বউটি দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে দাঁড়ায়।

রমেন বলে, 'উনি কোথায় ?'

'সিনেমায়। এসো—' বলে রমেনের একটা হাত ধরে টেনে আরো ভেতরে নিয়ে যায়।

অনঙ্গ তাদের সব কথা শোনেন। শুধু আজই নয়, আরো শুনেছেন, ওদের ছ'জনের কথা অনেকেই জানে—শুধু ওর ব্লাক মার্কেটিয়ার, গৃহস্থ স্বামী ছাড়া। অনঙ্গ পুষ্প'র ঘরের দিকে যেতে-যেতে আর একবার ওর বাড়ির দরজার পাশে লেখা 'গৃহস্থবাড়ি'র ছোট বোর্ডটা ভালো করে দেখে এগিয়ে গিয়ে পুষ্পর দরজার পর্দা ঠেলে—'পুষ্প' বলে ডেকে ভেতরে ঢোকেন।

পুষ্প একমুখ হেসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলে—'এ্যাতো দেরী যে ? আমি সেই সন্ধ্যা থেকে ঘরবার করছি।'

'আমার অপেক্ষায় থাকতে ভাল লাগে না তোমার ?'

'জানি-না।'

'জানো তো, বিরহ যত বেশী ভোগ করবে—মিলন তত মধুর হবে।' —বলে পুষ্পর সামনে খাবারের ঠোঙাটা তুলে ধরে বলেন,—'যাক, মোর অমিয়ার লাগি অমৃতি এনেছি—ধর সখি ধর—ধর।'

পুষ্প খাবারের ঠোঙাটা হাতে নিয়ে বলে—'বাঃ বেশ গরম, আপনি খাবেন তো ?'

অনঙ্গ বলেন—'মিষ্টি, ফিষ্টি আমার ভালো লাগে না।'—বলে পুষ্পকে একটু কাছে টেনে তার চিবুক ধরে বলেন—'তোমার এই মিষ্টি মুখটি দেখলেই, প্রাণটি একেবারে ঠাণ্ডা।'

পুষ্প ভুতুর কথা ভেবে বলে—'কালকে বেশ ভাল দেখে ফুলকপির সিঙাড়া-সন্দেশ, নিয়ে আসবেন তো।'

'নিশ্চয় আনবো, তুমি যা হুকুম করবে তাই আনবো।'—বলতে-বলতে অনঙ্গ বিছানায় গিয়ে আধশোয়া হয়ে গা এলিয়ে দেন।

পুষ্প খাবারের ঠোঙাটা রেখে আলমারি খুলে হুইস্কি, সোডা, গেলাস

ইত্যাদি অনঙ্গ'র সামনে টেবিলটায় রাখতে-রাখতে বলে—'আপনার জন্যে গরম-গরম কাট্‌লেট আনাই ?'

'না'।

'না—মানে' ?

'মানে অম্বল হবে।'

'সে যাই-ই হোক, খালি পেটে আমি আপনাকে ও সব গিলতে দেবো না। কাট্‌লেট না খান—কি খাবেন বলুন ?'

অনঙ্গ একটু চুপ করে থামেন। তাঁর মনে পড়ে আজকেরই সন্ধ্যের সুধাংশুর কথাগুলো, অফিস থেকে ফেরার আগে সুধাংশুর স্ত্রী সুধাংশুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। বাড়ি ফিরলে যত্নআত্তি করে তাকে লুচি আর আলু চচ্চড়ি করে খাওয়ার। কত সুখী সুধাংশু। কত সুখের সংসার তার। আর অনঙ্গ'র অদৃষ্টে ঠিক তার উল্টো। সুখ-শান্তির জায়গায় অশান্তিতে ভরে উঠেছে তার মন। অতি আধুনিকা স্ত্রীর সংসার তার, হাঁপিয়ে উঠেছে অনঙ্গ'র জীবন। তাইতো তিনি ছুটে আসেন এইখানে, যে সুখ-শান্তি থেকে তিনি বঞ্চিত, সেই সুখ-শান্তি তিনি যেন খুঁজে পান পুষ্প'র কাছে। পুষ্পও জীবনে কারও কাজ থেকেই ভালবাসা পায় নি। অনঙ্গবাবুর ভালবাসা যেন তাকে ধন্য করেছে। তাই অনঙ্গ'র সেবায় পুষ্প বিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে।

অনঙ্গ সুধাংশুর কথা ভেবে বলেন—'একটা জিনিস খাওয়াতে পারো' ?

পুষ্প সাগ্রহে প্রশ্ন করে—'কি ?'

'বেশ গরম লুচি আর আলু চচ্চড়ি।'

পুষ্প অবাক হয়, যে লোক অম্বল হবার ভয়ে কাট্‌লেট খেতে চাইছেন না, সেই লোক লুচি আলু চচ্চড়ি খেতে চাইছেন। তার উপর আজ পর্যন্ত তো কোনদিন অনঙ্গবাবু খাওয়ার ব্যাপারে কোনো ফরমায়েস করেন নি ! এইসব ভেবে অধিকতর বিস্মিত হয়ে এবং খুশী হয়ে বলে, 'সেকি ! আপনি খাবেন লুচি আলু চচ্চড়ি ! আমি এখুনিই করে দিচ্ছি।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুষ্প সযত্নে লুচি-আলুচচ্চড়ি তৈরী করে খাওয়ালো অনঙ্গকে। অনঙ্গবাবুও খুব তৃপ্তি করে খেলেন। বললেন, জানো পুষ্প, অনেক ভালো-ভালো, দামী-দামী জিনিস খেয়েছি-খাই, কিন্তু

আজকের তোমার হাতের এই লুচি আলু চচ্চড়ির স্বাদ যতদিন বেঁচে থাকবো—মুখে লেগে থাকবে।'

পুষ্প বলে, 'অতো বাড়িয়ে বলবেন না, আমার অহঙ্কার বেড়ে যাবে সামান্য পাড়াগাঁয়ের মেয়ে আমি, তার উপর চিরটাকাল আমার কেটেছে গরীবের ঘর-সংসারে। ভালো খাবার করতে আর শিখলাম কোথায়?'

অনঙ্গ বলেন, 'যাক্, আজ তাহলে উঠি?'

'আসুন'—বলে পুষ্প অনঙ্গবাবুর সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে ভুতু বাসি সিঙাড়াগুলো খেতে গেছল। তাকে পুষ্প কথা দিয়েছে, কাল তার জন্য ভালো সিঙাড়া আনিয়ে রাখবে। তাই অনঙ্গকে বলে—'কাল একটু সকাল-সকাল আসবেন আর খুব ভালো দেখে ফুলকপির সিঙাড়া আনিবেন।'

অনঙ্গ খুব খুশী হয়ে বলেন—'ঠিক আছে। খুব ভালো সিঙাড়া আনবে। আর সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে আসবো।' বলে অনঙ্গ গিয়ে রিকসাতে ওঠেন। পুষ্প তার যাওয়ার দিকে চেয়ে কপাটের পাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরদিন বিকেল থেকেই পুষ্প চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভুতু তো এখানো এলো না। পুষ্প বার-বার ভুতুদের বাড়ির দিকে তাকায়, কিন্তু ভুতুকে দেখতে পায় না। ভুতুর সৎভাই-বোনেরা তো খেলছে কিন্তু ভুতু? এদিকে অনঙ্গবাবুও তো আসার সময় প্রায় হয়ে এলো, ওমা, একি! ঘড়িতে তো ছ'টাই বাজে। অনঙ্গবাবু এখুনি এসে পড়বেন, অথচ সাজ-গোজ তো দূরের কথা, মাথার চুলটা পর্যন্তও তো ভালো আঁচড়াতে থাকে।

ওদিকে অনঙ্গবাবু তখন গলির মুখটায় রিক্সা থেকে নামছেন। আজ যেন একটু বেশী সেজেছেন অনঙ্গ দত্ত।

রিক্সা থেকে নেমে পানের দোকানের দিকে এগোতেই আর দু'জনের খুব সাজগোজ নজরে পড়লো অনঙ্গ'র। তার দু'জন হলো, গৃহস্থবাড়ির বউ আর তার বয়ফ্রেণ্ড। দু'জনে সেজেগুজে বেরিয়েছে, অনঙ্গবাবু তাদের কথার দিকে একটু উৎকর্ণ হতেই কয়েকটি কথা তার কানে ভেসে এলো। বউটি বলছে—'তাড়াতাড়ি চল, ও এখুনি এসে পড়বে'।

ছোকরাটির কথা শুনে আজ তাকে একটু বেপরোয়াই মনে হলো। সে বললো—'আসুক না, তোমার কর্তাকে আমি ভয় করি না। আমি যদি তার

কাছে ধরা পড়ে যাই, আমিও তাকে পুলিশের কাছে ব্ল্যাকমার্কেটিং-এর জন্য ধরিয়ে দেবো।'

বউটি যেন তার কথায় খুশীই হলো। মুখে কিছু বললো না বটে, কিন্তু মনে-মনে যেন বললো, 'তোমার এই সাহস দেখে খুশী হলাম। পুরুষ মানুষের সাহস না থাকলে তাকে 'কাপুরুষ' বলে।'

ওরা দু'জনে হাসতে-হাসতে হেলতে-দুলতে চলে গেল অনঙ্গ'র সামনে দিয়ে। অনঙ্গ একবার পেছন ফিরে তাদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসলেন। হাসতে-হাসতে অন্যদিনের মত আজও একবার সেই বাড়ির দরজায় লেখা 'গৃহস্থবাড়ি'-র বউটির দিকে তাকালেন। আব একবার হাসলেন, তারপর এগিয়ে গেলেন পানের দোকানে।

সিগারেট নিতে-নিতে কাদের কথায় পেছন ফিরে দেখলেন—গৃহস্থবাড়ির কর্তা এবং তার একটি সঙ্গী কথা বলতে বলতে যাচ্ছে।

সঙ্গীটি বলছে—'কতোয় বেচলেন?'

গৃহস্থবাড়ির কর্তা তর্থাৎ বিরিঞ্চিবাবু বলল—'দু'শো।'

সঙ্গীটি পুনরায় প্রশ্ন করে—'কত ব্ল্যাক, কত হোয়াইট?'

বিরিঞ্চিবাবু বলল—'ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি।'

সঙ্গী বলে—'গুড।'

'জানবে।'—ব'লে বিরিঞ্চিবাবু এগিয়ে গিয়ে তার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খুলে দিল একটি বাচ্ছা চাকর। অনঙ্গ ওদের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকাতে-তাকাতে পুষ্পর ঘরের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়েন।

ব্যস্তভাবে দরজা খুলে দিল পুষ্প। অনঙ্গ একমুখ হেসে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু পুষ্প যেন গম্ভীর! কেমন যেন একটু চঞ্চল। অনঙ্গ লক্ষ্য করে বলেন—'বুঝেছি, আমার আসতে দেরী হয়েছে বলে অভিমান হয়েছে বুঝি? বেশী তো দেরী হয় নি, মাত্র পাঁচ মিনিট, অবশ্য প্রেমিক-প্রেমিকার অপেক্ষামান সময়, পাঁচমিনিট মানে-পাঁচ ঘণ্টাও মনে হতে পারে। যাই হোক —বেটার লেট দ্যান নেভার। এই নাও, খুব ভালো সিঙাড়া নিয়ে এসেছি।'

পুষ্প কিছু না বলে অনঙ্গ'র হাত থেকে সিঙাড়ার ঠোঙাটা নিয়ে একবার দরজার পর্দা তুলে ভুতুদের বাড়ির দিকে তাকায়। অনঙ্গ বসে-বসে তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন না। পুষ্প তখন

সিঙাড়াটা রেখে জানলা দিয়ে অধীর আগ্রহে ভুতুদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে।

অনঙ্গ ততক্ষণে বসেছেন। মুখ না ফিরিয়েই কথাক'টি বলে পুষ্প তেমনি জানলা দিয়ে তাকিয়েই থাকে। কিন্তু যার জন্যে তার এই চঞ্চলতা তাকে দেখতে পায় না পুষ্প।

অনঙ্গ বলেদ—'কি হ'লো? সিঙাড়া খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

পুষ্প অনমস্কভাবে সেইখানে থেকেই বলে—'হোক্।'

অনঙ্গ বলেন—'কি ব্যাপার বলো তো, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার কথামত গরম-গরম ফুলকপির সিঙাড়া ভাজিয়ে আনলাম, আর তুমি মুখ গোম্ড়া করে রয়েছ।' বলতে-বলতে পুষ্পের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন—'বলি একটু হাসো, একবার হাসিমুখে চাও, ওই হাসিটুকুর জন্যেই তো আসি।'

পুষ্প তেমনি পথের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ তার মুখ হাসিখুশীতে ভরে ওঠে। অনঙ্গ তার এই হাসির কারণ বুঝতে না পেয়েই বলেন—'বাঃ—বাঃ এইতো হেসেছো, কি সুন্দর দেখাচ্ছে বলত' ?

পুষ্প কিন্তু তার কথা ভ্রূক্ষেপ না করে হাসিমুখে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। ওদিক থেকে ঝড়ের মতন ছুটে এসে ঘরে ঢোকে ভুতু। পুষ্প তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বলে—'তোর এত দেরী হলো যে?'

ভুতু বলে—'নতুন-মা আমাকে ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে ছিল।'

ভুতু অনঙ্গবাবুকে লক্ষ্য করে নি, কিন্তু তাকে দেখে অনঙ্গবাবু বুঝলেন বুঝলেন পুষ্পর এতক্ষণকার ভাবান্তরের কারণ এই ছেলেটি।

অনঙ্গবাবু ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে ভুতুর মাথায় সস্নেহে হাত রেখে পুষ্পকে প্রশ্ন করেন—'কে এই ছেলেটি?'

পুষ্প বলে—'ওই সামনের বাড়ির ভাড়াটে—মুখার্জীবাবুর ছেলে।'

'বামুন।' বলে অনঙ্গবাবু ভুতুর চিবুক ধরে তার মুখটা তুলে ধরে বলে—'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্য কুলজাত।' ভুতু এসব কথার কিছুই অর্থ বুঝতে পারে না। শুধু অনঙ্গবাবুর মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। পুষ্প তাকে সিঙাড়া এনে দেয়।

অনঙ্গ বলেন—'তুমি এবার বাড়ি যাও খোকা।' ভুতু অনঙ্গকে কিছু

না বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুষ্প'র দিকে চায়।

পুষ্প বলে—"হ্যাঁ বাবা আজ যাও, আবার কাল এসো।'

ভুতু সিঙাড়া খেতে খেতে বলে—'কাল আবার এমনি সিঙাড়া দেবে?'

'হ্যাঁ, দেবো। দাঁড়াও, আরও কয়েকটা দিচ্ছি—খেতে খেতে যাও।'

বলে আরও কয়েকটা সিঙাড়া এনে ভুতুর হাতে দেয়। ভুতু সিঙাড়া খেতে-খেতে চলে যায়। পাশের ঘরগুলো থেকে নাচ-গান, হৈ-হল্লোড় ভেসে আসছে। পুষ্প তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজে মন দেয়। অনঙ্গ হুইস্কির বোতল খোলার আগেই পুষ্প তাড়াতাড়ি তাঁর সামনের টেবিলে খাবারের প্লেট, সোড়া ইত্যাদি সাজিয়ে দেয়।

অনঙ্গ হুইস্কিতে সোড়া মিশিয়ে খেতে শুরু করেন। পুষ্প তার পাশে বসে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসে—'আচ্ছা অনঙ্গবাবু, আপনার ছেলে-পুলে নেই?'

'না।'

'স্ত্রী?'

'হ্যাঁ, সতী-সাধ্বী-লক্ষ্মী আছে।'

'তাহ'লে আপনি সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে ফেলে এখানে আসেন কেন অনঙ্গ-বাবু? আপনি তো ভদ্রলোক।'

'ফর্সা জামা-কাপড় পরলেই যদি ভদ্রলোক হওয়া যায়—তাহলে নিশ্চয়ই আমি ভদ্রলোক।'

'না মানে—আপনি তো শিক্ষিত।'

'পুষ্প, কয়েকটা বই পড়ে, কয়েকটা পাশ করলে যদি তাকে শিক্ষিত বলা যায়—তাহ'লে আমি শিক্ষিত, কারণ, আমি এম, এ, পাশ করেছি।'

'এত লেখা-পড়া শিখে কেন যে আপনি—'

পুষ্প'র কথা শেষ করতে না দিয়েই অনঙ্গবাবু পুষ্পর দিকে মুখ তুলে বলেন—'কি জানো পুষ্প—মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে অ-মানুষ হতে, তাই আমি তোমার কাছে, অমানুষ হতে, অভদ্র হতে, অসভ্য হতে আসি। এক বোতল সোডা—'

পুষ্প আর কিছু না বলে আর এক বোতল সোডা এনে দেয়।

* * *

ভুতু তখন তাদের বাড়িতে সৎ ভাই-বোনদের সিঙাড়ার ভাগ দিয়ে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাচ্ছিল। কমলা লক্ষ্মীকে সিঙাড়া খেতে দেখে জিজ্ঞেস করে—'সিঙাড়া কোথায় পেলি?'

লক্ষ্মী সিঙাড়া খেতে-খেতে বলে—'দাদা দিয়েছে।'

বিস্মিত হয়ে কমলা বলে—'দাদা দিয়েছে?' বলে এ-ঘরে এসে ভাখে ভুতু ও পাটু সিঙাড়া খাচ্ছে। কমলা ওদের কাছে এগিয়ে এসে ভুতুকে জিজ্ঞেস করে—'সিঙাড়া কে দিল? কোথায় পেলি?'

ভুতু সিঙাড়া খেতে খতে নির্বিকারে জবাব দেয়—'পু'ষ্পর ঘরে।'

কমলা প্রশ্ন করে—'পুষ্প—কে পুষ্প'?

ভুতু জানলা দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে পুষ্পর ঘরের দিকে দেখিয়ে বলে—'ওই যে ওই বাড়িতে থাকে।'

কমলা যেন আঁৎকে ওঠে। বলে—'পাজি ছেলে, তুমি ওখানে গেছলে, খাবার আর জায়গা পেলে না? ছি-ছি-ছি-ছি।'

ভুতু কিছু না বুঝে বোকার মত প্রশ্ন করে—'কেন, ওখানে কি?'

কমলা ওদের হাত থেকে সিঙাড়াগুলো কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে বলে—'সে তোমার জানবার দরকার নেই, তুমি আর কোনোদিন ওদিকে মাড়াবে না, গেলে আর রক্ষে রাখবো না। লক্ষ্মী, তুই ভুতুর সঙ্গে থাকবি, দেখবি কখনো যেন ওদিকে না যায়'।

লক্ষ্মী ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। ভুতু এই নিষেধের কারণ কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

পরদিন বিকেল হতেই পুষ্প'র কাছে যাবার জন্যে ভুতুর মনটা ছট্‌ফট্‌ করছে, কিন্তু উপায় নেই, লক্ষ্মী তাকে সব সময়ে আগ্‌লে-আগ্‌লে রেখেছে। এই সময়টায় আজ কারুরই সান্নিধ্য ভালো লাগছে না ভুতুর। খেলতেও মন বসছে না। তাই বাইরের ঘরে বই নিয়ে পড়তে বসলো ভুতু। লক্ষ্মী এখন পাটুকে নিয়ে সদর দরজার পাশের রোয়াকে বসে খেলছে। তাদের দৃষ্টিতে ফাঁকি দিয়ে পুষ্পর বাড়ি যাওয়া ভুতুর পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা বইয়েই মন দিতে চেষ্টা করলো ভুতু। হঠাৎ কাদের কথাবার্তা শুনে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে পুষ্প'র পাশের ঘরে যে মেয়ে ছটি থাকে, বীণা, মীনা আর নমিতা খুব সেজেগুজে নটবরবাবুর সঙ্গে হাসতে-

হাসতে ওদের বস্তীর দিকে চলেছে।

নটবর হলো বীণার বাবু, বহুকাল ধরেই এ পাড়াতে তার যাতায়াত। আজ ওরা তিনজনে গেছল ম্যাটনি শো'য়ে সিনেমা দেখতে।

বীণা যেতে-যেতে হঠাৎ নটবরকে প্রশ্ন করে—'আচ্ছা নটবরবাবু, সিনেমা হলে যদি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো, তা'হলে কি হ'তো?

নটবর বলে—'কিছুই হতো না।'

মীনা বলে—'মানে?'

নটবর বলে—'মানে দেখাই হতো না।'

নমিতা বলে—'কেন?'

নটবর বলে—'আমরা স্ত্রীদের মুভ্‌মেণ্ট সব সময় লক্ষ্য রাখি।'

বীণা বলে—'তাই নাকি।'

নটবর বলে—'হ্যাঁ, স্ত্রী অনেকটা চশমার মতন, সব সময় চোখে-চোখে রাখতে হয়।'

বীণা আর নমিতা প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করে—'আর আমরা?'

নটবর বলে—'গগল্‌সের মতন।'

নমিতা শুনে হেসে ফেলে, বীণা বলে 'আহা'। ওর কথা বলতে-বলতে আর একটু এগোতেই একজন কাবুলিওয়ালা নটবরকে দেখে প্রায় দৌড়ে ওদের সামনে এসে নটবরকে বলে—'এই বাবু হামারা রূপেয়াকা সুদ?'

নটবর ভূত দেখার মতন প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়ে পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলে—'দেগা—দেগা।'

কাবুলিওয়ালা বলে—'আরে কেয়া দেগা-দেগা, সুদ নিকালো—সুদ।'

নটবর বলে—'দেগা, এসো তোমার সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে দিই। এই সব মেয়েছেলেরা হ্যায় নমিতা, বীণা—এ হচ্ছে আগা সাহেব। বহুৎ আচ্ছা আদমি।'

কাবুলিওয়ালা বলে—'আরে উসব বাৎ ছোড়ো, তুম কাঁহা রহতেঁ হেঁ,, পাত্তা নেহি।'

নটবর বলে—'আরে পাত্তা নেই, কে বললে—এইতো আমি তোমার সামনে সশরীরে হাজির হয়েছি। আমি বলছি কি আগাদা, তুমি কিছু দিনের জন্যে রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা হয়ে যাও না। আমাকে তোমার

সেই কাবুলে ফেলে আসা ছেলে মনে করো না।'

কাবুলিওয়ালা বলে—'কেয়া আলটু-ফালটু বোলতে হেঁ?'

নটবর বলে—'আরে আলটু-ফালটু একটু পরে বলবো, এখনো তো পেটে কিছু পড়ে নি।'

কাবুলিওয়ালা বলে—'হাম কাল সবেরমে তুমহারা ঘরমে যায়েগা'।

নটবর বলে—'জরুর যেও, না গেলে আমি খুব রাগ করবো।'

বলে বীণা ও নমিতার সঙ্গে এগিয়ে যায় নটবর।

বীণা বলে—'নটবরবাবু, আপনি কাবুলের কাছে টাকা ধার করেন?'

নটবর বলে—'তোমাদের কাছে আসতে হলেই কাব্‌লেদের দ্বারস্থ হতে হবে।'

নমিতা বলে—'তার মানে?'

নটবর বলে—'মানে তোমাদের কাছে যারা যায়—তারা উজবুক, তাই তোমাদের আস্তানার নাম উজবেকিস্তান।'

অবাক হয়ে বীণা বলে—'উজবেকিস্তান!'

নটবর বলে—'হ্যাঁ। আর ওই উজবেকিস্তানে যেতে হলে, যেতে হয় ভায়া কাবুল। বিশ্বাস না হয় ম্যাপ খুলে ছাখো।'

নমিতা বলে—'বীণাদি!'

বীণা বলে—'কি?'

নমিতা বলে—'ফুচ্‌কা খাবে?'

বীণা বলে—'কোথায় ফুচ্‌কাওয়ালা?'

নমিতা আঙ্গুল বাড়িয়ে বলে—'ওই যে।'

বীণা অদূরে এক ফুচ্‌কাওয়ালাকে দেখে নটবরকে বলে—'নটবরবাবু।'

নটবর বলে—'বুঝেছি। কিন্তু আমার পেটে যে এখনো মা-কালী পড়েনি, মেজাজটা নেতিয়ে রয়েছে।'

'হবে—হবে। এই ফুচ্‌কাওয়ালা—'বলে বীণা এগিয়ে যায় ফুচ্‌কা-ওয়ালার কাছে। নমিতাও যায়। অগত্যা নটবরকেও যেতে হয়।

নটবর এসে ফুচ্‌কাওয়ালাকে হুকুম করে—'এই লাগাও ফুচ্‌কা।'

ওরা সকলে ফুচ্‌কা খেতে থাকে। বীণা ও নমিতা খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছে। ফুচ্‌কাওয়ালা নটবরের জন্যে ফুচ্‌কা ভেঙে সেটা তেঁতুল জলে

ডোবাতে যায়, বাধা দিয়ে বলে—'উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ, তেঁতুল জলে দিও না।'

বলে ভাঙা ফুচ্‌কাটা হাতে নিয়ে পকেট থেকে দেশী মদের বোতল বার করে ফুচ্‌কায় মদ ঢেলে খেতে থাকে। তিনজনে ফুচ্‌কা খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। নটবর বোতলেরসঙ্গে ফুচ্‌কাও শেষ হয়ে গেল।

নটবর বলে 'আউর দো।'

ফুচ্‌কাওয়ালা বলে—'আউর নেহি হ্যায়'।

নটবর বলে—'নেহি হ্যায়, ও কেতনা হুয়া?'

ফুচ্‌কাওয়ালা বলে—'পাঁচ রুপেয়া।'

নটবর পকেট থেকে টাকা দিতে গিয়ে ছাখে, পকেট কাটা গেছে। অসহায়ভাবে বলে—'বীণা!'

বীণা বলে—'সর্বনাশ! পকেট কাটা গেছে? কি হবে?'

ফুচ্‌কাওয়ালা বলে—'হামার টাকা কে দিবে?'

'হামি দিবে'—বলে নটবর পকেট থেকে একটা বিলিতি মদের পাঁইট বার করে ফুচ্‌কাওয়ালাকে দিয়ে বলে—'এটা বাঁধা রাখো।'

'নেই, হাম্ নেই রাখেগা, রূপিয়া দো।'

নটবর একটু বিব্রত বোধ করে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাবুলিওয়ালাকে ডেকে তার কাছ থেকে আবার টাকা ধার নিয়ে ফুচ্‌কাওয়ালার কাছে মান বাঁচিয়ে, কাবুলিওয়ালার কাছে আরও মান খুইয়ে চলে যায়।

পুষ্পর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে যেতে ছাখে, পুষ্প তার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কার জন্যে অপেক্ষা করছে।

পুষ্প সত্যিই অপেক্ষা করছে। একবার ডানদিক গলির দিকে তাকিয়ে ছাখে, অনঙ্গবাবু ভুতুর জন্য সিঙাড়া নিয়ে আসছে কিনা, আর একবার বাঁ দিকে ভুতুদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছাখে, ভুতু আসছে কিনা। কিন্তু কাউকেই দেখতে না পেয়ে পুষ্প আবার ঘরে চলে যায়।

একটু পরেই বড় একটা খাবারের ঠোঙা হাতে অনঙ্গবাবু বলতে-বলতে আসেন—'পুষ্প আজ সিঙাড়ার সঙ্গে গজাও এনেছি—ধর, তোমার ছেলে কোথায়?'

পুষ্প ঠোঙাটা অনঙ্গ'র হাত থেকে নিয়ে বলে—'ঠাট্টা করছেন?'

অনঙ্গ বলেন—'ঠাট্টা আমি করছি না বাবা, তুমি নিজেই নিজের সঙ্গে

ঠাট্টা করছ।'

পুষ্প আর কিছু না বলে খাবারের ঠোঙাটা জলচৌকির ওপর রাখে তারপর একটা ডিস্ ভালো করে ধুয়ে এনে তাতে কয়েকটা সিঙাড়া ও গজা আলাদা করে রাখতে-রাখতে অনঙ্গকে জিজ্ঞেস করে—'আপনি এখন কিছু খাবেন?'

অনঙ্গ বলে—'না-না, আগে যার জন্য এসেছি—তাকে খাওয়াও। আমি তো এখন চিনির বলদ।'

'ওকথা কেন বলছেন? তার জন্যে তো রাখছি।'—বলে পুষ্প ভুতুর জন্যে রাখা সিঙাড়া-গজার ডিসটা হাতে নিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভুতুর এখন পাত্তা নেই। ওই তো রোয়াকে বসে ওর সৎ ভাই-বোন খেলছে। রাস্তায় অনেক লোকজন যাওয়া-আসা করছে, পাশের পার্ক'টায় ছেলেরা খেলছে, ওদের মধ্যেও তো ভুতু নেই। পুষ্পর দৃষ্টি শুধু ভুতুকে খুঁজছে। অনঙ্গ লক্ষ্য করে বলেন—'কি হলো—ছেলে আসে নি বুঝি?'

পুষ্প কিছু না বলে তেমনি খাবারের ডিসটা হাতে নিয়ে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনঙ্গ কিছুক্ষণ পরে একটু বিরক্ত হয়েই বলেন—'না, একটা ক্ষুদে ছেলে দেখছি আমাদের লাইফ্‌টা মিজারেবল্ করে দিলে।'

পুষ্প যেমন ভুতুর অপেক্ষায় পথ চেয়ে রয়েছে, ওদিকে ভুতুও তার কাছে আসার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সৎ মায়ের দৃষ্টিকে এড়িয়ে লক্ষ্মী ও পাটুর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পুষ্পর বাড়িতে যাওয়ার জন্যে ভুতু ধীরে-ধীরে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখলো, পুষ্প জানলার গরাদ ধরে এদিকেই তাকিয়ে আছে। ভুতু পা টিপে-টিপে এগিয়ে যাচ্ছে। পুষ্প'র মুখ খুশীতে ভরে ওঠে, ভুতু আসছে। লক্ষ্মী ও পাটু অন্যদিকে তাকিয়ে আপন মনে খেলছে। ভুতু তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে-ধীরে পুষ্প'র বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। আর একটু যেতে পারলেই ভুতু একদৌড়ে পুষ্প'র কাছে পৌঁছে যাবে, এমন সময় লক্ষ্মী তাকে দেখে ফেলে বলে— 'দাদা আবার তুমি ওখানে যাচ্ছো? মাকে বলে দোব—মা—'

লক্ষ্মীর ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে কমলা জানালায় মুখ বাড়িয়ে ধমকে বলে—'এই, কোথায় যাচ্ছিস্?'

ভুতু লক্ষ্মীর কথা অগ্রাহ্য করে ছুটে যেতে যাচ্ছিল, কমলার চিৎকার শুনে থমকে থামে। কমলার রক্তচক্ষু করে আরও চিৎকার করে বলে —'এদিকে আয়, এদিকে আয়, হতভাগা ওখানে গেলে—ওই নরকের দিকে আর এক পা বাড়ালে তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেবো।'

ভুতুর আর এক পা এগিয়ে যাওয়ার সাহস নেই। করুণ চোখে পুষ্পর দিকে তাকিয়ে ছাখে—পুষ্প ম্লান মুখে তার দিকে চেয়ে আছে। ভুতুর মনটা ছুটে যেতে চায়, তার কাছে কিন্তু উপায় নেই। কমলা আর একবার ধম্‌কে চিৎকার করে উঠতেই ভুতু ধীরে-ধীরে ফিরে এলো ঘরে।

পুষ্পর চোখ তু'টো জলে ভরে আসে। কমলার কথাগুলোও তার কানে এসেছে। লজ্জায়, অপমানে, তুঃখে পুষ্প'র অন্তরাত্মা ডুক্‌রে কেঁদে উঠতে চায়। কোনো রকমে সেটাকে চেপে রেখে, ভুতুর জন্য রাখা সিঙাড়া-গজার ডিস্‌টা একটা টেবিলের ওপর রেখে অাঁচল দিয়ে চোখ মুছতে থাকে।

অনঙ্গ এতক্ষণ সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন, পুষ্পর কাছে এসে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—'পুষ্প, কেঁদো না। আই হেট্‌ টিয়ারস। একটা সত্যি কথা বলবো? তুমি মিথ্যে মরীচিকার পেছনে ছুটছো পুষ্প—তুমি মরবে।'

পুষ্প কান্না ভাঙা গলায় বলে, 'মরতে কি কিছু বাকি আছে অনঙ্গবাবু?'

'তা আছে বৈকি—তা না হলে অনঙ্গ দত্ত তোমাকে মাসোহারা দিয়ে রাখবে কেন?' বলে অনঙ্গবাবু আর একটু কাছে এসে দাঁড়াল পুষ্প'র।

পুষ্প সজল চোখে বলে—'আপনি বিশ্বাস করুন অনঙ্গবাবু, এভাবে মরতে আমি চাই নি, আমি চেয়েছিলাম, স্বামীপুত্র নিয়ে সংসার করতে, কিন্তু আমার পোড়া অদৃষ্টে কিছুই হলো না।' বলতে-বলতে ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলে পুষ্প। এমন সময় বাইরে থেকে কাদের কথা শুনে অনঙ্গ ও পুষ্প জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছাখে, সেই 'গৃহস্থবাড়ি'র সামনে বিরিঞ্চিবাবু আর একজন ভদ্রলোক অফিস থেকে ফিরলেন।

ভদ্রলোক পুষ্পদের বাড়ির দিকে দেখিয়ে বিরিঞ্চিবাবুকে বলেছেন— 'তোমার এই পাড়ায় থাকতে ঘেন্না করে না?'

বিরিঞ্চিবাবু বললেন, 'করে খুব করে, বাড়ি আমার তৈরী হচ্ছে—

যতদিন শেষ না হয় এই নরকে থাকতেই হবে।'

'নরক সত্যিই নরক, এখানে কোন ভদ্রলোক বাস করতে পারে? বলে ভদ্রলোক পুষ্প'র দিকে প্রায় তাকিয়েই কথাগুলো বলতে-বলতে চলে যান। বিরিঞ্চিবাবুও বাড়িতে ঢুকে যায়।

পুষ্প অনঙ্গকে বলে—'এর নাম আমাদের বেঁচে থাকা অনঙ্গবাবু? পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ঘৃণার পসরা মাথায় নিয়ে, অপমান সহ্য করে, সারা সমাজের লোকের ফুৎকার গায়ে মেখে এইভাবে বেঁচে থাকার নাম বেঁচে থাকা? এর চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।'

অনঙ্গ বলেন—'অতো উতলা হয়ো না পুষ্প। সমাজের তুমি কতটুকু খবর রাখো। পৃথিবীসুদ্ধ লোকের চরিত্রের তুমি কতটুকু জানো! দিনরাত তো ওই গৃহস্থ বাড়ির বউ-এর ব্যাপার দেখছো, ওরকম শুধু একটি বাড়িতেই হচ্ছে না, অসংখ্য বাড়িতে ভদ্রতার সাইনবোর্ড ওপরে রেখে ভেতরে চলছে জঘন্যতম নোংরামি। তোমরা তাদের চেয়ে অনেক শুদ্ধ, অনেক পবিত্র। যে ভদ্রলোক আমাদের দেখে নরক-নরক বলে চলে গেলেন, তাঁকে আমি চিনি, কতদিন সোনাগাছি আর রামবাগানের ড্রেনে পড়ে থাকতে দেখেছি। তোমাদের মতন কত মেয়ের লাথি-ঝাঁটা পর্যন্ত খেতে দেখেছি। তবুও এদের ভদ্রতার খোলস খসে পড়ে নি। এরা নাকি খুব বড় সমাজি, সমাজের আরও অনেক বড় লোককে আমি দেখেছি, আমাদের চেয়েও অনেক কু-কাজ করতে। দুঃখ কি জানো, তবুও তারা তেমনিই সমাজের মাথা হয়েই রয়ে গেল। আর আমরা তাদের চেয়ে অনেক ভালো করেও তাদের জাতে উঠতে পারলাম না। তুমি দুঃখ করো না ওদের কথায়। ওরা দিনের-বেলায় তোমাদের দেখে ঘৃণা ছেটায়, আবার আমাদের মতন প্রকাশ্যে তোমাদের কাছে না এসে ব্যাক্‌ডোর দিয়ে এসে রাত্রিবেলা নিশিপদ্মের মধু খেয়ে বেড়ায়। ওদের দিনেরবেলার সঙ্গে রাত্রিবেলার কোন মিল নেই। সুতরাং ওদের কথায়, ওদের ঘৃণায় আমাদের কিছুই আসে যায় না। চলো সোডা দাও।' বলে অনঙ্গ এসে টেবিলের সামনে বসে হুইস্কির বোতল খোলেন। পুষ্প তাড়াতাড়ি সোডা, খাবার ইত্যাদি এনে টেবিলে রাখে। অন্য কিছুর জন্য কিছু না হলেও ভুতুর জন্য পুষ্প'র মনটা ভারি হয়ে থাকে।

অনঙ্গ অনেক চেষ্টা করেও আগের মতন সেই প্রাণখোলা হাসি আজ ফোটাতে পারেন না পুষ্পর মুখে।

*　　*　　*

অনঙ্গবাবু ঠিকই বলেছেন, সকাল হতেই পুষ্প গোলমাল শুনে গিয়ে হাজির হলো ঝর্ণার ঘরে। গিয়ে দেখে একজন ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত বলে তার গর্বও আছে। সমাজের লোক তার পায়ের ধূলো চেটে খায়। সেই ভট্টাচার্য মশায় মদের খালি বোতলটা বগলে নিয়ে ঝর্ণার ঘরের মেঝেতে ধূলোয় লুটোচ্ছে। ঝর্ণা, বীণা, নমিতা সবাই বিব্রত, কেউ তাকে বাইরে পাঠাতে পারছে না। অবশেষে ডাক পড়লো বাড়িউলী মাসীর।

মাসী এসে অনেক অনুনয় বিনয় করে বলল—'বাবা তুমি এবার যাও, সকাল হয়েছে, অনেক বেলা হয়ে গেছে। যাও বাবা।'

ভট্টাচার্য মশায় অনেক কথার পর টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালো, নামাবলীটা কাঁধে ফেলে, প্রায় উঠে যাওয়া কপালের তিলকটার ওপরে ঘাম মোছার মতন হাত বুলিয়ে বলল—'কে যাবে? কোথায় যাবে?'

মাসী কথার সুরে আরও একটু মধু মিশিয়ে বলল—'তুমি বাড়ি যাবে, সকাল হয়েছে, তোমার মতন লোকের আর এখানে থাকতে নেই। যাও?'

ভট্টাচার্য বলে—'কোথায় যাবো?'

মাসী বলে—'কেন—তোমার বাড়ি।'

ভট্টাচার্য বলে—'আর বাড়ি যাবে না, এখানেই থাকবো।'

মাসী বলে—'ওমা, সে কি করে হয়? এখন যাও বাবা—আবার রাত্রি-বেলায় এসো।'

'রাত্রিতেও থাকবো।' বলে ভট্টাচার্য টলতে-টলতে গিয়ে বিছানায় বসে পড়ে। সবাই বিব্রত বোধ করে।

মাসী এবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বলে,—'যাও বলছি, না গেলে কালু আর রাম সিংকে ডেকে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবো।'

ভট্টাচার্য বলে—'দিনের বেলায় কি করে যাব? আমি একজন পণ্ডিত না? আমি এখন হুতোমপেঁচা হয়ে গেছি' বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝর্ণাকে দেখতে পেয়ে বলে, 'ওই আমার লক্ষ্মী, আমি ওই লক্ষ্মীর পায়ের

তলায় হুতোমপেঁচা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকবো।'

বলে ভট্টাচার্য সত্যি-সত্যিই ঝর্ণার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

পুষ্প মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে-হাসতে নিজের ঘরে ফিরে আসে। এমন সময় তার ঘরে কড়া নাড়ার আওয়াজ হয়। পুষ্প দরজা খুলে ছাখে একটি যুবক দাঁড়িয়ে। যুবকটি পুষ্পকে প্রশ্ন করে—'আচ্ছা এখানে পুষ্প দেবী বলে কেউ আছেন?'

'আমিই পুষ্প, কি বলবেন বলুন?'

'আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।'

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

যুবকটি ভিতরে এসে বলে—'আচ্ছা, অনঙ্গ দত্ত এখানে আসেন?'

পুষ্প অনঙ্গবাবুর নাম শুনে একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—'আপনি কে?'

যুবকটি বলে—'আগে আমার কথার উত্তর দিন, অনঙ্গ দত্ত এখানে আসেন?'

'হ্যাঁ, আসেন। কিন্তু আপনি কে?'

'আমি তার শালা, অনঙ্গ দত্ত আমার ভগ্নীপতি। আমার দিদির ইচ্ছে নয়—জামাইবাবু এখানে আসেন।'

'আপনার দিদি অনঙ্গবাবুকে আসতে দেন কেন?'

'উনি জোর করে আসেন।'

'জোর করেই যদি আসেন, তা হলে আমি কি করতে পারি বলুন?'

'আপনি তাকে আসতে দেবেন না।'

'আমি তাঁকে আসতে না দিলেই কি আপনারা তাঁকে ধরে রাখতে পারবেন? কলকাতা শহরে তো আমি একা নই।'

'আমরা খুব ভাল করে জানি, আপনি ছাড়া উনি আর কারও কাছে যাবেন না, তাই আপনাকে বলছি, আপনি ওকে আসতে দেবেন না।'

'আমি তাঁকে বারণ করতে পারব না।'

'তা পারবেন কেন? আপনাদের তো ভাই নেই, ছেলেও নেই, আপনি আমাদের দুঃখ বুঝবেন না। আপনাদের কাছে টাকাটাই সব'।

এমন সময় বাড়িউলী মাসী বলতে-বলতে এসে ঘরে ঢোকে। বলে—

'কে হে তুমি, তত্ত্ব কথা শোনাতে এসেছ ?'

যুবক বলে—'আমি অনঙ্গবাবুর সম্বন্ধী।'

বাড়িউলী বলে—'সম্বন্ধী! তা এখানে কি কুটুম্বিতা করতে এসেছ ?'

যুবকটি বাড়িউলীর শ্লেষপূর্ণ কথা শুনে রেগে যায়। বলে—'মুখ সামলে কথা বলবেন।'

বাড়িউলীও রেগে গিয়ে বলে—'বা-রে, আস্পর্ধা তো কম নয়। আমার বাড়িতে এসে আমাকেই চোখ রাঙাচ্ছে! বেরোও—আমার বাড়ি থেকে।'

পুষ্প বিব্রত হয়ে বলে—'মাসী-মাসী চুপ কর—'বলে যুবকটির দিকে ফিরে বলে—'আপনি যান, আমি কথা দিচ্ছি, অনঙ্গবাবু আর কখনো এখানে আসবেন না।'

'হ্যাঁ, দয়া করে তাই করবেন।' বলে যুবকটি গট্‌গট্‌ করে চলে যায়।

বাড়িউলী অবাক হয়ে বলে—'একি করলি পুসি। ওই এক ফোঁটা ছোঁড়ার ভয়ে অনঙ্গবাবুকে তাড়িয়ে দিবি ?'

পুষ্প এতক্ষণ গতকালের ভুতুর জন্য রাখা সিঙাড়া, গজার ডিসটার দিকে তাকিয়ে ছিল, মাসীর কথা শুনে তার দিকে ফিরে বলে—'ভয়ে নয় মাসী। যেদিন থেকে এখানে এসেছি—সেদিন থেকে লজ্জা-ভয় সব ঘুচে গেছে।'

মাসী বলে—'তবে অনঙ্গবাবুকে তাড়াবি কেন ?'

পুষ্প আবার ভুতুর জন্য রাখা খাবারের ডিসটার দিকে তাকায়। ভুতুর না আসার কথা ভেবে তার বুকটা ভারি হয়ে ওঠে। অনঙ্গবাবুর অকৃত্রিম ভালবাসাকে অবহেলা করে তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া পুষ্প'র কাছে কঠিন সমস্যা, তবুও ভুতুর অবহেলাও তো সইতে পারবে না পুষ্প।

মাতৃহৃদয় তার এতদিন ছিল অন্ধকারময়, পুত্রস্নেহ বুভুক্ষিত অন্ধকার অন্তরে ভুতুকে পেয়ে জ্বলেছিল ক্ষীণ আশার আলো, কোন কারণেই সেই আলো আর নিভিয়ে দিতে পারবে না পুষ্প। অনঙ্গবাবুকে ছেড়ে থাকতে তার কষ্ট হবে, তবুও ভুতুকে বুকে পেয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়াও আজ পুষ্প'র পক্ষে অসম্ভব। আজকের ওই অনঙ্গবাবুর সম্বন্ধীর আসাটা হয়তো ভগবানেরই অভিপ্রেত। অনঙ্গবাবুকে ছাড়তে না পারলেও তো ভুতুকে নিবিড় করে বুকে তুলে নিতে পারবে না। একসঙ্গে গণিকা আর জননী —না-না, এ বরং ভালোই হলো, অনঙ্গবাবু আর কখনো আসবেন না তার

কাছে, পুষ্পও আবার ফিরে যাবে সমাজে, তখন আর তার কাছে আসতে ভুতুরও কোন বাধা থাকবে না, এসব নানা কথা ভেবে খাবারের ডিস থেকে মুখ ফিরিয়ে বাড়িউলীর কথার জবাবে পুষ্প বলে—'অনঙ্গবাবুকে কেন তাড়াচ্ছি—সে তুমি বুঝবে না মাসী, সে তুমি বুঝবে না।'—বলে ঠেলে আসা কান্নাটাকে গোপন করবার জন্য ছুটে যায় পূজোর জায়গায়, ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ে। তার এই না-চাওরা কদর্য জীবনের জন্য ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে পুষ্প। কতক্ষণ ধরে যে কেঁদেছে তার খেয়াল নেই। খেয়াল হলো তখন,—যখন ভুতু এসে তার চিবুকটা, তুলে ধরে করুণ মুখে প্রশ্ন করলো—'তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে? তুমি এমন করে কাঁদছ কেন?'

পুষ্প তার মুখের দিকে চেয়ে কান্না ভাঙা গলায় বলে—'তোমার জন্য কাঁদছি। কাল আসিস নি যে?'

ভুতু বলে—'বাবা, নতুন মা, সবাই বারণ করে। তোমার ঘরে সব আজে-বাজে লোক আসে।' পুষ্প ভুতুকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আর কেউ আসবে না বাবা, তুই ছাড়া—আমার ঘরে আর কেউ আসবে না।' বলে ভুতুকে বুকে নিয়ে তার মাথায় মুখ রগড়ে পুষ্প নীরবে কাঁদতে থাকে। চোখের জলে ভুতুর চুলগুলো প্রায় ভিজে আসে।

অনঙ্গবাবু এসব ব্যাপারের কিছুই জানেন না। তিনি যথারীতি খাবারের ঠোঙা হাতে সন্ধ্যেয় পুষ্পর বাড়িতে এসে হাজির হলেন। দরজায় টোকা দিয়ে ডাকেন—'পুষ্প—পুষ্প।' ওদিক থেকে কোন সাড়া নেই। অনঙ্গ আবার টোকা দিতে-দিতে বলেন—'খোলো-খোলো দ্বার, রাখিও না আর, বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।'

এবারেও কোনো সাড়া নেই। অনঙ্গবাবু আবার বলেন—'ও পুষ্প, খোলো—'

পুষ্প তখন ঘরের ভেতর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অনঙ্গবাবুর প্রতিটি ডাক কাঁটার মত বিঁধছে তার বুকে, অনঙ্গবাবুকে যে কোনদিন এভাবে ফিরিয়ে দিতে

হবে আগে কখনো ভাবে নি পুষ্প, অনঙ্গবাবুকে সে সত্যিই ভালবেসেছে। অনঙ্গবাবুও তাকে ভালবাসতে কার্পণ্য করেন নি। সেই অনঙ্গবাবুর ডাকে আজ সাড়া দিতে পারছে না পুষ্প, এ যে কি দুঃসহ জ্বালা। তবুও উপায় নেই, পুষ্পকে ধৈর্য ধরতেই হবে। অনঙ্গবাবুর শালাকে কথা দিয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, সে ভুতুকে কথা দিয়েছে, আবার অনঙ্গ বাবুর কথা ভেসে আসে—, 'আরে কি হলো কি? ও পুষ্প—খোলো।'

পুষ্প দাঁতে-দাঁত চেপে অতি কষ্টে বলে—'না'।

'না মানে কি? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'—বলতে-বলতে জানলার কাছে এসে দাঁড়ান।

পুষ্প আঁচলে চোখ মুছে একটু সংযত হবার চেষ্টা করে জানলায় এসে বলে,—'আপনার জন্য এ দরজা আর কোনদিন খোলা হবে না।'

অনঙ্গ এর কারণ কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে বলেন—'তার মানে?'

পুষ্প বলে—'আপনার স্ত্রীর কাছে আপনি ফিরে যান।'

অনঙ্গ বলেন—'কিন্তু কেন? ফিরে যাব বলে তো আসি নি।'

পুষ্প ভাবলো, এভাবে অনঙ্গবাবুর সামনে বেশীক্ষণ থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো ধৈর্য রাখতে পারবে না, হয়তো কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তার সব প্রতিজ্ঞাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই ভেতরের কান্না ভেতরেই চেপে রেখে রুক্ষস্বরেই বলে—'তাহলে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন।'—বলে অনঙ্গর মুখের সামনে দড়াম্ করে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে নীরব কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সেইখানেই বসে পড়ে।

ওপাশে অনঙ্গ খাবারের ঠোঙা হাতে আধো অন্ধকারে হতভম্বের মতন চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর আবার পুষ্পকে ডাকেন। কত কাকুতি-মিনতি করেন। কিন্তু পুষ্প'র দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে অগত্যা দাওয়া থেকে রাস্তায় এসে নামেন। খাবারের ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দেন রাস্তার ধুলোয়। কয়েকটা কুকুর ছুটে এসে কাড়াকাড়ি করে সিঙাড়া-গজা খেতে থাকে।

অনঙ্গবাবুকে ফিরে যেতে দেখে পানের দোকান থেকে টলতে-টলতে এগিয়ে আসে নটবর। বলে—'কিঁ ভিড় দেখে চলে যাচ্ছেন? আজ সব

ঘরেই ভিড়। ঝর্ণার ঘরের সামনে তো কিউ লেগে গেছে।'

অনঙ্গ বলেন—'কিউ দেখে আপনিও—কি কিউ, ই, ডি, করে এখানকার প্রব্‌লেম শেষ করে চলে যাচ্ছেন?

নটবর পানের পিক্ ফেলে ঢুলু-ঢুলু চোখে, জড়িত স্বরে বলে 'না, আমি বীণাকে নিয়ে যাত্রাগান শুনতে যাচ্ছি।'

অনঙ্গ বলেন—'যাত্রা?'

নটবর বলে—হ্যাঁ, চলুন না, ভেতরে গিয়ে বসবেন ততক্ষণ।'

অনঙ্গ পুষ্পর ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেন—'দরজা বন্ধ।'

নটবর বলে—'অন্য অনেক দরজা খোলা আছে। আসুন, ভাল মালও আছে।'

'মাল!'

'হ্যাঁ, নেপাল স্কচ, হুইস্কি, রাম, ও টি, জিন, ই-টি-সি-ই-টি-সি! আসুন—আসুন—' বলে অনঙ্গকে প্রায় ধরেই নিয়ে যায় নটবর।

বীণা তখন যাত্রা শুনতে যাবার জন্য সাজগোজ করছিল। এমন সময় অনঙ্গকে ধরে নিয়ে নটবর এসে ঢুকলো, বললো—'বীণা, ছাখো কাকে ধরে এনেছি।'

বীণা মুখ ফিরিয়ে অনঙ্গকে দেখে বিস্মিত হয়। উনি তো পুষ্প ছাড়া অন্য কারো ঘরে যান না। বহু ভাগ্যফলে পুষ্প অমন বাবু পেয়েছে। সেই অনঙ্গবাবু আজ আমার ঘরে? বীণা একমুখ হেসে অনঙ্গবাবুর কাছে এগিয়ে এসে উৎফুল্ল হয়ে বলে—'ওমা, দত্ত মশাই যে, আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম?'

নটবর তাড়াতাড়ি জবাব দেয়—'আমার মুখ দেখে।'

'যাঃ', বলে বীণা অনঙ্গকে অভ্যর্থনা করতে থাকে। অনঙ্গবাবুর মতন অতিথিকে যত রকম ভাবে পরিচর্যা করা দরকার, বীণা তার কিছু মাত্র ত্রুটি করলো না, কিন্তু অনঙ্গ'র আজ যেন কিছুই ভালো লাগছে না, বীণার আতিথেয়তা, নটবরের রসালাপ বিরস লাগছে। দামী-দামী মদ, খাবার সব আজ কেমন বিস্বাদ লাগছে। তাঁকে খুশী করতে পারছে না ভেবে বীণা ও নটবর আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠে তার সেবার জন্য; কিন্তু সবই নিস্ফল, অনঙ্গর মনে শুধু একটি প্রশ্ন, পুষ্প আজ হঠাৎ তার সঙ্গে এমন

ব্যবহার কেন করলো। কেন?—কেন? এ 'কেন'-র কোনো উত্তরই খুঁজে পান না অনঙ্গ। বীণার ঘরে যত রকমের হুইস্কি ছিল সব একসঙ্গে পাঞ্চ করে খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকতে চাইলেন। অনঙ্গ কিন্তু তাতেও শান্তি পেলেন না, বারবার তার মনে ওই প্রশ্নই ঘুরে ফিরে দেখা দিতে থাকলো—কেন পুষ্প এমন করলো? তাদের দু'জনের এতদিনের অকৃত্রিম ভালোবাসায় কেন এই ছেদ পড়লো! কার জন্য? কিসের জন্যে। অনঙ্গ যেমন পুষ্পর জন্য চিন্তায় বিহ্বল, ব্যাকুল—পুষ্পও তেমনি তার ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে-ফুলে কাঁদছে অনঙ্গের জন্য। কিন্তু উপায় নেই। সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ প্রতিজ্ঞা তাকে পালন করতেই হবে। তাতে যত দুঃখই আসুক।

পরদিন সকাল হতেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল, পুষ্প তার বাবুকে চিরদিনের জন্য তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেউই এই অঘটনের কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। দাওয়ায় বসে এই নিয়ে জটলা করছিল ছন্দা, ঝর্ণা, বীণা এবং আরো অনেক। বাড়িউলী এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলল—'দত্তমশায়ের মতন মানুষকে তাড়িয়ে দিয়ে পুসী কি ভাল করলো?'

ছন্দা বলে—'ভালো মন্দের যিনি বিচার করেন—তিনিই জানেন মাসী। অমন বাবু পাওয়া ভাগ্যের কথা, সেই বাবুকে পুসী বিনা কারণে ছেড়ে ছিল?'

ঝর্ণা বলে, তুমি একটু চেষ্টা করে ছ্যাখো না ছন্দাদি। দত্তমশাই এখানকার সবচেয়ে বড় মাছ, যদি গেঁথে তুলতে পারো।'

ছন্দা বলে 'তোরা ওনাকে চিনিস না ঝর্ণা, দত্তমশাই সে মানুষই নন। পুষ্প ছাড়া উনি আর জীবনে কারো কাছে যাবেন না বলেই আমার মনে হয়। পুষ্পকে উনি সত্যিকারের ভালোবেসে ছিলেন।'

বীণা বলে—'তাই তো বেশী আশ্চর্য হচ্ছি, পুসীদি ওঁকে তাড়ালো কি বলে? কারণটা কি?'

বাড়িউলী বলে—'শোন, অবশ্য আমি একটু আন্দাজ করেছি।'

সবাই প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করে ওঠে, 'কি মাসী—কি?'

'ওই যে মুখুজ্যেবাড়ির একটা ছেলে, কি যেন নাম—ভুতু না ঘুতু, ওই ছোঁড়াটাকে ভালোবাসে। পুসী এখন মা হতে চাইছে।'—বলে বাড়ীউলী

গালের পানটা একবার এদিক-ওদিক করে নিয়ে আবার বলে—'মরণ আর কি, এক গাছের ডাল আর এক গাছে জোড়া লাগবে ভেবেছে। এমন দুর্মতিও কি মানুষের হয় না, তোরাই বল?'

এমন সময় ভুতু এসে পুষ্পর ঘরে ঢোকে, তাকে দেখে মাসী আবার বলে—'ওই যে আমাদের দৈত্যকুলের পেল্লাদ এসে গেছে।'

ভুতু পুষ্পর ঘরে পুষ্পকে দেখতে না পেয়ে বেরিয়ে আসে। পাশাপাশি ঘরগুলোর দরজায় দরজায় উঁকি মেরে পুষ্পকে খোঁজে।

মাসী বিরক্তির স্বরে বলে—'এই ছোঁড়া এঘর ওঘর কি দেখছিস রে?'

'কিছু না'—বলে ভুতু দৌড়ে দোতালার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়। ঝর্ণা ইতিমধ্যে দোতালার ঘরে এসে প্রসাধন করতে শুরু করেছে, ভুতু তার ঘরে এসে ঢোকে, বলে—'কি মাখছো?'

ঝর্ণা ভুতুর দিকে ফিরে বলে—'এসো ছোট নাগর এসো, কাজল পরছি, পাউডার মাখছি, তুমি মাখবে?'

ভুতু বলে—'না বকবে।'

ঝর্ণা প্রশ্ন করে—কে?'

ভুতু পুষ্পর ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে—'ওই যে—ও।'

ঝর্ণা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে—'পুসিদি হুঃ এসো, আমি তোমায় কার্তিক সাজিয়ে দিই।'—বলে ভুতুকে পাউডার মাখিয়ে চুল আঁচড়ে নিয়ে, আইব্রো পেন্‌সিল দিয়ে গোঁফ এঁকে দেয়। তারপর আয়নার সামনের দাঁড় করিয়ে বলে—'ভ্যাখো, কেমন হয়েছে।'

ভুতু বেশ করে মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে বলে—'এই দিকটা ছোট করে দিলে কেন?'

ঝর্ণা বলে—'কই দেখি'।

ভুতু ঝর্ণার দিকে মুখ তুলে বাঁদিকের গোঁফটা দেখায়। ঝর্ণা আবার গোঁফ ঠিক করতে থাকে।

এমন সময় পুষ্পর সাড়া পেয়ে ভুতু ভয় পায়।

'ঝর্ণা তোর ঘরে ভুতু আছে?' বলতে-বলতে পুষ্প আসে। ভুতু দৌড়ে গিয়ে ঘরের এক কোণে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

পুষ্প ঘর ঢুকে এদিক-ওদিক খোঁজে, তারপর ভুতুকে ওইভাবে লুকিয়ে থাকতে দেখে হাসে। 'ও কি! লুকোনো হলো বুঝি?' বলতে-বলতে এগিয়ে যায় ভুতুর কাছে।

ভুতু তেমনি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে। পুষ্প তার কাছে গিয়ে জোর করে তার মুখটা ফেরায়। ভুতু দু'হাত দিয়ে গোঁফ মুছতে গিয়ে তার মুখময় কালিতে ভরে যায়, পুষ্প দেখে গম্ভীর হয়ে যায়, শাসনের সুরে বলে —'এসব কি বাঁদরামী হয়েছে—এ্যাঁ? আয় তোমাকে বলি ঝর্ণা, ভদ্র-লোকের ছেলেটাকে তুই এমনি করে অসভ্য করে তুলতে চাস! ছি,ছি,ছি—'

ঝর্ণা বলে—'থাক-থাক, পরের ছেলের উপর উপর অতো দরদ দেখিও না পুসিদি।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠে পুষ্প—'পরের কি নিজের সে তোকে দেখতে হবে না'—বলে ভুতুকে প্রায় গলাধাক্কা দিতে-দিতেই বলে পুষ্প—'চল, চল এখান থেকে, তোকে বলেছি না, এসব ঘরে কখনো আসবি না, 'চল', বলে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

পুষ্পর কথায় ঝর্ণা অপমানিত বোধ করে। ইচ্ছে হয় দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেয় পুষ্পকে, কিন্তু ততক্ষণে ওরা তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেছে। ঝর্ণা তাদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে বলে— 'আ-মরণ সোহাগ কত! তবু যদি নিজের পেটের ছেলে হতো।'

পুষ্প ভুতুকে টানতে-টানতে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। সাবান জলে গামছা ভিজিয়ে ভুতুর কালিমাখা মুখটা পরিষ্কার করতে থাকে।

ভুতু এ পর্যন্ত একটিও কথা বলে নি, পুষ্পকে যতটা ভয় পেয়েছে তার চেয়ে তার বেশী ভয় নতুন মা'কে। তাই ভয়ে-ভয়ে পুষ্পকে বলে—'নতুন মাকে বলে দিও না যেন—শুনলে মারবে।'

পুষ্প বলে—'মার খাওয়াই ভালো—দিন-দিন অসভ্য হয়ে উঠছো।'

ভুতু বলে—'বেশ, উঠেছি তো উঠছি।'

পুষ্প এইভাবে তার কথার উপরে কথা বলায় খুব গম্ভীর হয়ে যায়। কিছু বলে না। শুধু মুখ মোছাতে থাকে।

ভুতু পুষ্পর এই ভাবান্তরের- কারণ কিছুটা বুঝতে পেরে নিজেকে অপরাধী মনে করে। কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে। তার

পরেও পুষ্পকে কিছু বলতে না দেখে, হাসতে না দেখে খোসামোদের সুরে বলে—'সন্দেশ-সিঙাড়া দেবে তো ?'

পুষ্প ভুতুর এই খোসামোদ বুঝতে পেরে না হেসে আর থাকতে পারে না। ভুতুকে বুকে টেনে নিয়ে হাসতে-হাসতে স্নেহসিক্ত স্বরে বলে—'হ্যাঁ-হ্যাঁ দেবো, কোন দিন দিই না ?'

ভুতু খুশী হয়। তারপর একটু চিন্তা করে বলে—'আচ্ছা, নাগর কি ?'

পুষ্প প্রায় চম্‌কে ভুতুর দিকে চায়, বলে—'কিছু না, কে বলেছে একথা ?'

ভুতু ঝর্ণার ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে—'ওই যে ও বলেছে।'

পুষ্প ঝঙ্কার দিয়ে বলে—'বলুক। আর কক্ষনো কারো ঘরে যাবে না বলে দিচ্ছি—কক্ষনো যাবে না।'

ভুতু কিছু না বলে বোকার মত ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে পুষ্প'র বকুনি খায়। কিন্তু পুষ্প'র এই বকুনিতে তার রাগ হয় না, কোন জ্বালা অনুভব করে না। নতুন মা'র বকুনির সঙ্গে এ বকুনির যেন অনেক-অনেক তফাৎ। পুষ্পর এই বকুনিটাও যেন বড় মধুর লাগে ভুতুর। ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে বড় বড় দুটি চোখ মেলে পুষ্পর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ভুতু। নতুন মা রাক্ষুসী আর পুষ্প দেবী। পুজোর আর বেশী দেরী নেই। ভুতুদের বাড়ির পাশের পার্কে ত্রিপল খাটিয়ে প্রতিমার কাঠামোটি বাঁধা হয়ে গেছে।

লখাই কারিগর তবু একবার ভালো করে কাঠামোটি দেখে নিচ্ছে, তার সহকারী মাটি মাখাচ্ছে। ভুতু এবং আরও কয়েকটি ছেলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে। লখাইয়ের সহকারী বলে—'লখাই দা, পুণ্যিমাটি এনেছো ?'

লখাই বলে—'না রে ভাই—আনা হয় নি তো ?'

সহকারী বলে—'এতো কাছে থাকতেও এখন আনো নি। পুণ্যিমাটি না হলে মাটি চড়াতে পারবো না।'

লখাই বলে—'ওই ইষ্টিশানের কাছের লোকেই বেশী ট্রেন ফেল করে জানিস। দাঁড়া নিয়ে আসছি।'

ভুতু প্রশ্ন করে—'ঠাকুরের রং কবে হবে ?'

লখাই বলে—'হবে-হবে, আগে মাটি পড়বে—তারপর দু'মাটি হবে, তারপর তো রং হবে। তোমার হাতে ওটা কিসের চারা ?'

ভুতু হাতের চারাটা দেখিয়ে বলে—'শিউলির চারা।'

লখাই বলে—'শিউলির চারা—কোথায় পেলে?'

ভুতু বলে—'ওই পার্কের ওই কোণায়।'

'বাঃ, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দাও, অনেক ফুল ফুটবে।'—বলে লখাই চলে যায় পুষ্পদের বাড়ির দিকে। ভুতুও যায় তার পিছু-পিছু।

পুষ্পদের বাড়ির দরজায় ঢুকতেই লখাই বলে—'কই গো, দিদিমণিরা সব, কে কোথায়?'

লখায়ের সাড়া পেয়ে পুষ্প, ঝর্ণা, ছন্দা আরও ক'জন বারবণিতা এগিয়ে আসে। ছন্দা বেশ বিরক্তির স্বরেই লখাইকে প্রশ্ন করে—'কি ব্যাপার?'

লখাই দু'বার হাত কচ্‌লে বলে—'জানোই তো, বছরে এই একটিবার মাত্র তোমাদের এখানে আসি। একটু পুণ্যিমাটি নেবো।'

পুষ্প ছাড়া প্রায় সকলেই একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—'না, দেবো না, গত বছর আমাদের প্রতিমার কাছে ঘেঁষতেই দেয় নি।'

লখাই বলে—'সেটা কি আমার দোষ?'

ছন্দা বলে—'তা জানি না। আমাদের এখান থেকে মাটি দেবো না।'

লখাই অনুনয়-বিনয় করে বলে—'দাও-দাও, তোমরা না দিলে, আমরা কোথায় যাই বলো তো?'

ঝর্ণা বলে—'জাহান্নামে যাও, মাটি এবার আমরা কিছুতেই দেবো না।'

লখাই অনুনয় বিনয় করে, মেয়েরা তবুও তাকে মাটি নিতে দিতে রাজী হয় না, শেষে পুষ্প বলে—'আঃ কি করছিস্ তোরা। একটু মাটি নেবে তাতে কি হয়েছে। নিয়ে নাও ভাই, তুমি আমার দোর থেকে নিয়ে যাও।'

লখাই বলে—'জয় হোক্ তোমার জয় হোক্।'

বলে লখাই মাটি নেয়। ভুতু সেই শিউলির চারাটা হাতে লখাইয়ের পিছু-পিছু এসে দাঁড়িয়ে ছিল। বলে—'মাটিতে কি হবে?'

লখাই বলে—'এ মাটি না হলে যে মা দুর্গার প্রতিমা গড়া হবে না।'

ভুতু প্রশ্ন করে—'এ মাটি বুঝি খুব ভাল?'

লখাই উত্তর দেয়—'হ্যাঁ, এ মাটির নাম পুণ্যিমাটি। চলি গো দিদিরা, তোমাদের জয় জয়কার হোক্।'—বলে লখাই মাটি নিয়ে চলে যায়।

ভুতু দরজার পাশে শিউলির চারাটা যত্ন করে বসাতে থাকে। পুষ্প তার কাছে এসে বলে—'কি করছিস্ রে?'

ভুতু বলে—'শিউলির চারা পুঁতছি।'

পুষ্প বলে—'শিউলির চারা! কি হবে?'

ভুতু বলে—'খুব বড় হবে—গাছ ভর্তি ফুল হবে।'

পুষ্প বলে—'সে ফুল দিয়ে কি হবে?'

ভুতু বলে—'তোমার পূজোয় লাগবে, আর আমি একটা ঘুঘুপাখীর বাসা এনে বেঁধে দোব।'

—'ঘুঘু পাখীর বাসা?'

—'হ্যাঁ, কোজাগরী পূর্ণিমের শেষ রাত্রে ঘুঘুপাখী ডিম পেড়ে যাবে।'

—'বাবা,—কোজাগরী পূর্ণিমের শেষ রাত্রে ঘুঘুপাখী ডিম পাড়ে—তোমায় এটা কে বললে?'

ভুতু বলে—'নন্দ বলেছে।'

পুষ্প প্রশ্ন করে—'নন্দ কে?'

ভুতু বলে—'আমাদের কার্ত্তিকপুরের নন্দকে জানো না। আমার বন্ধু—'

কার্ত্তিক পুরের নাম শুনেই পুষ্পর মুখটা কেমন উদাস হয়ে যায়। ভুতু সে দিকে না তাকিয়ে আপন মনে চারা পুঁততে-পুঁততে বলে—'জানো আমাদের কার্ত্তিক পুরের বোসেদের সেই শান বাঁধানো পুকুর ঘাটের পাশে, একটা আম গাছের ডালে, আমি আর নন্দ, একটা পাখীর বাসা বেঁধেছিলাম। নন্দ আমায় বলেছিল, ঘুঘুপাখী-ডিম পাড়লে সে আমায় জানাবে।'

পুষ্প কেমন অন্যমনস্ক, ভুতুর কথাগুলো যেন তার কানে যাচ্ছে না। সে ভাবছে, কার্তিকপুরের বোসেদের এই শান বাঁধানো পুকুর ঘাটেই সে আত্ম-হত্যা করতে গিয়েছিল, নেপাল বাঁচিয়েছিল তাকে, কিন্তু মৃত্যু তার হয়েছে তার পূর্ব জীবন যাত্রার। কলকাতায় এসে এই জঘন্য জীবন শুরু হয়েছে, তার বুকে কত জ্বালা, কত দুঃখ, কত নৈরাশ্যের অন্ধকার শুরু হয়েছে সেদিন সেই বোসেদের শান বাঁধানো পুকুর ঘাটে। নিশ্চল, নিথর হয়ে এই সব কথাই ভাবছিল পুষ্প। ভুতুও তাদের গ্রামের কথাই বলে চলেছিল আপন মনে, হঠাৎ পুষ্পর দিকে তাকিয়েই ভুতু থেমে যায়। ওঠে দাঁড়িয়ে, ধীরে-ধীরে পুষ্পর কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—'কি ভাবছো?'

ভুতুর কথায় পুষ্প চমকে ওঠে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে

'কিছু না বাবা, তুমি এখন বাড়ি যাও, বেশী রোদে-রোদে ঘুরো না। ও বেলায় রোদ পড়লে এসো, তোমার জন্যে সন্দেশ-সিঙাড়া আনিয়ে রাখবো।'

ভুতু বলে—'আচ্ছা'—বলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলে—'আমার শিউলির চারাটায় জল দিও কিন্তু'।

পুষ্প বলে—'দোবো।'

ভুতু ছুটতে-ছুটতে চলে যায়, পুষ্প উদাসভাবে তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভুতু তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে পুষ্প শিউলির চারাটার দিকে তাকায়। চারাটা কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে। পুষ্প এক ঘটি জল এনে চারাটায় ঢালে।

* * *

পরদিন বিকেলে অনঙ্গ দত্ত অফিস ফেরৎ পুষ্প'র দরজায় টোকা দেন। পুষ্প দরজা খুলে অনঙ্গকে দেখে চমকে ওঠে, বলে—'এ কি! আপনি?'

অনঙ্গ বলেন—'হ্যাঁ, আমি জীবিত আমি। অবশ্য তোমার কাছে আমি মরে ভূত হয়ে গেছি।'

পুষ্প বলে—'আপনি আবার এখানে কেন এলেন?'

অনঙ্গ বলেন—'কেন এখানে আসবো না—সেই কথাটা জানতে এলাম।'

পুষ্প বলে—'আপনার স্ত্রী চান না যে, আপনি এখানে আসেন।'

অনঙ্গ বলেন—'পৃথিবীর কোনো স্ত্রীই চাইবে না—তাদের স্বামীরা এখানে আসে।'

পুষ্প বলে—'স্ত্রীকে অসন্তুষ্ট করে আপনার কি এখানে আসা উচিত?'

অনঙ্গ বলেন—'তাতে কি আমি তুষ্ট হবো পুষ্প? 'সি ইজ দি মোষ্ট ন্যাগিং এণ্ড আনরিজিনিবল উওম্যান'—একজন সবচেয়ে বিরক্তিকর মহিলা—'

পুষ্প তার কথা শেষ হতে না দিয়েই বলে, 'তবু তো আপনার স্ত্রী।'

অনঙ্গ বলেন—'হ্যাঁ, ওইটেই তার একমাত্র ট্রাম্পকার্ড। কিন্তু পুষ্প, ঘরটাই যখন তাসের ঘর হয়ে দাঁড়ায়, তখন—'

পুষ্প এবারও তার কথা শেষ হতে না দিয়ে বলে—'না-না, আপনার ঘর-সংসার—'

পুষ্পর কথা শেষ হবার আগেই অনঙ্গ বলেন—'আচ্ছা পুষ্প, তুমি চাও

না আমি সুখী হই ?'

পুষ্প বলে—'কেন চাইবো না—নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু আমাদের মতন মেয়েরা তো আপনাকে সুখী করতে পারত না।'

অনঙ্গ বলেন—'এতদিন পরে আজ একথা কেন বলছ পুষ্প ?'

পুষ্প বলে—'এতদিন বুঝি নি কিন্তু আজ বুঝছি, আপনার স্ত্রীর মনে দুঃখ দিয়ে আমিও সুখী হবো না, আপনিও হবেন না।'

অনঙ্গ বলেন—'ছাখো পুষ্প, এসব কথা দিয়ে আমাকে তুমি ভোলাতে পারবে না। আমাকে এখানে আসতে বারণ করার আরও কোনো একটা গুরুতর কারণ আছে, সেই কারণটা আমি তোমার কাছে জানতে এসেছি। বল পুষ্প, কি সে কারণ ?'

পুষ্প বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বাইরে থেকে ভুতু বলতে-বলতে আসে—'আমার শিউলির চারায় জল দিয়েছো ?'

পুষ্প বলে—'হ্যাঁ বাবা, জল দিয়েছি।'

অনঙ্গ বলেন—'কিসের চারা' ?

পুষ্প বলে—'ভুতু কোথা থেকে একটা শিউলির চারা এনে সদর দরজার পাশে লাগিয়েছে।'

অনঙ্গ বলেন—'গুড্। ভুতুই আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছে।'

পুষ্প বলে—'মানে ?

অনঙ্গ বলেন—'মানে, ভুতুবাবু এই মাটিতে ফোটাবে ফুল—শিউলিফুল আর আমি—'

পুষ্প তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে—'না-না, সেজন্যে নয়। আপনি দয়া করে এখানে আসবেন না।' বলতে-বলতে ভুতুকে কোলের কাছে টেনে নেয়।

অনঙ্গ মৃদু ম্লান হেসে ভুতুর মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলেন, 'বুঝতে পেরেছি আমি এলে হয়তো, এই শিউলির চারাটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

পুষ্প বলে—'না-না, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। আর ভালবাসি বলেই আমি চাই না এখানে আসেন।'

ভুতু অনঙ্গকে প্রশ্ন করে—'আজ সিঙাড়া আনেন নি ?'

অনঙ্গ বলেন—'এ-হে-হে ভুতুবাবু, সিঙাড়া তো আনা হয় নি দাঁড়াও—'

বলে অনঙ্গ হঠাৎ বেরিয়ে যান।

ভুতু অবাক হয়ে পুষ্পকে বলে—'কোথায় গেলেন?'

পুষ্প বলে—'তোমার জন্যে সিঙ্গাড়া আনতে গেলেন বোধহয়।'

ভুতু একটু চুপ করে আবার জিজ্ঞেস করে—'আচ্ছা, উনি কে?'

পুষ্প বলে—'তুমি তো জানো, অনঙ্গবাবু।'

ভুতু বলে—'তোমার কে হয়?'

পুষ্প এ কথার উত্তর খুঁজে পায় না ইতস্তত: করে বলে—'কেউ না।'

ভুতু অবাক হয়। বলে—'কেউ না?'

পুষ্প নির্বিকারভাবে বলবার চেষ্টা করে—'না, উনি আমার কেউ হন না।' কথাটা বলতে পুষ্প'র কষ্ট হয়। ভুতু সেটা বুঝতে পারে না। একটু পরেই অনঙ্গবাবু ফিরে আসেন। তার হাতে একটা ট্রফির বাক্স; বিরাট একটা শালপাতার ঠোঙায় ফুলকপির সিঙাড়া আর গজা, আর একটা সন্দেশের বাক্স। ওগুলো ভুতুর হাতে দিয়ে অনঙ্গবাবু বলেন—'এই নাও ভুতুবাবু? আর কখনো তোমার জন্যে এসব আনতে পারবো কি না জানি না, নাও। চলি পুষ্প, আর আসবো না, তবে যদি কোনোদিন দরকার মনে কর, খবর দিও—আসবো।' বলে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে কি মনে করে আবার ফিরে এসে ভুতুকে আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—'আমি যাচ্ছি ভুতুবাবু, যাবার আগে তোমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, তোমার ওই শিউলিগাছে একদিন অনেক ফুল ফুটবে—'

ভুতু বলে—'অনেক ফুল ফুটবে?'

'হ্যাঁ, অনেক ফুল ফুটবে। সন্ধ্যাবেলা শিউলি ফুলের গন্ধে এ পাড়াটা মাত হয়ে থাকবে। চলি—' বলে অনঙ্গ একবার পুষ্প আর একবার ভুতুকে ভালো করে দেখে নিয়ে ধীরে-ধীরে চলে যান।

পুষ্প পাথরের মূর্তির মতন অনড়ভাবে, অপলক দৃষ্টিতে তাঁর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। ভুতু লক্ষ্য করে না, সে তখন তার ট্রফির বাক্স, সিঙাড়া, গজা নিয়ে ব্যস্ত।

* * *

ভুতুর বাবা হারাধন মুখুজ্যে আজ একটু রাত করেই অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন। ভুতু রোজ এই সময়টা পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। হারাধন বাইরের ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে আজ ভুতুর পড়ার সাড়া পেলেন না।

ঘরটাও অন্ধকার। লাইট জ্বেলে দেখলেন, ভুতু একা অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে অস্ফুট স্বরে 'উঃ' 'আঃ', করছে। হারাধন তার কাছে গিয়ে বলেন, 'কি হয়েছে রে—শুয়ে আছিস ?'

ভুতু বলে—'বড্ড মাথা-ব্যথা করছে বাবা।'

'দেখি'—বলে হারাধন ভুতুর কপালে হাত দিয়ে দেখে বলেন—'এ কি! তোর তো জ্বর হয়েছে।'

ভেতরের ঘর থেকে কমলার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'রাতদিন টোঁ-টোঁ করে ঘুরলে, জ্বর হবে না তো কি হবে শুনি। এখন ভোগো।'

হারাধন কিছু বলে না। ভুতুও চুপ করে শুয়ে থাকে।

পরদিনও ভুতুর জ্বর ছাড়ে না, তার পরদিনও না। হারাধন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন, কিন্তু কমলার ভয়ে বাইরে প্রকাশ করতে পারেন না।

পুষ্পও ভাবে, এ দু'দিন ভুতু আসছে না কেন ? সকালে শিউলি চারায় জল দিতে-দিতে ভুতুর কথাই ভাবছিল পুষ্প, ছন্দাও ষষ্ঠীতলায় পুজো দিতে যাচ্ছিল, পুষ্পকে জিজ্ঞেস করে, 'কিলো পুসী, তোর পুষ্যিপুত্তরকে দেখছি না তো, দু'দিন আসে নি বুঝি ?'

পুষ্প বলে—'না। বোধহয় ওর নতুন মা বকেছে।'

'তা হবে।' বলে ছন্দা চলে যায়।

পুষ্প শিউলিচারায় জল দিয়ে বাইরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। ভুতুদের বাড়ির দিকে তাকায় ভুতুকে দেখতে পাওয়ার আশায় ; কিন্তু কোথায় ভুতু ? জানালাটিও তো বন্ধ।

* * *

সন্ধ্যাবেলায় হারাধন অফিস থেকে ফিরে এসে থার্মোমিটার দিয়ে ভুতুর টেম্পারেচার দেখে একটু গম্ভীর হয়েই কমলাকে বলেন, 'হ্যাঁ, বেশ জ্বর বেড়েছে।'

কমলা তার স্বভাব অনুযায়ীই ঠোঁট উল্টে বলে, 'কপালে দুর্ভোগ আছে দেখছি।'

হারাধন বলেন, 'সময়টা ভালো নয়, একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।'

কমলা বলে—'এখানে ডাক্তার ডাকা মানেই টাকার শ্রাদ্ধ। এদিকে মুদি দু'বার তাগাদা দিয়ে গেছে। বাড়িওয়ালাও আসছে দিনে দু'বেলা।'

হারাধন বলেন—'হ্যাঁ, ওদের বেশ কিছু টাকা বাকী পড়ে গেছে। তা বলে এভাবে তাগাদা করছে কেন, বুঝতে পারছি না।'

কমলা বলে—'কি করে জানতে পেরেছে পূজোর আগেই আমরা দেশে চলে যাব।'

এমন সময় বাইরে থেকে বাড়িওয়ালা মদনবাবুর ডাকে শোনা যায় 'হারাধনবাবু বাড়ি আছেন নাকি' ?

কমলা ঘোমটা টেনে ভেতরের ঘরে চলে যায়। মদনবাবু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। হারাধন তাকে অভ্যর্থনা জানান—'আসুন মদনবাবু, আসুন—আসুন।'

মদনবাবু ভেতরে এসে ভুতুকে চুপ করে শুয়ে থাকতে দেখে বলে—'একি, ভুতুবাবু, শুয়ে কেন ?'

ভুতু নিরুত্তর। জ্বরের ঘোরে প্রায় অচেতন হয়ে শুয়ে আছে।

হারাধন জবাব দেন মদনবাবুর কথার। বলেন—'ওর জ্বর হয়েছে।'

মদনবাবু বলেন—'ও, ফিভার। আজকাল তো ঘরে-ঘরে ফ্লু হচ্ছে। কত রকমের ফ্লু—এশিয়াটিক ফ্লু, সাইবেরিয়ান ফ্লু! একটু সাবধানে রাখবেন, ডাক্তার-টাক্তার দেখান।' বলে মদনবাবু একটু চুপ করে থাকে আমতা-আমতা করে বলে—'আমি যেজন্যে এসেছিলাম মানে'—তার কথা শেষ করতে না দিয়েই হারাধন বলেন—'বুঝেছি, আপনার টাকাটা আমি দু'এক দিনের ভেতর দিয়ে দেবো মদনবাবু।'

মদনবাবু বেশ মোলায়েম করে বলে, 'তাই দেবেন কাইণ্ডলি, দু'মাসের রেণ্ট্ বাকি পড়ে গেছে তো!'

হারাধন বলেন—'হ্যাঁ। পূজোর আগেই আপনার সব মিটিয়ে আমরা দেশে চলে যাব।'

মদনবাবু বলে—'চলে যাবেন ?'

হারাধন বলেন—'হ্যাঁ, এদের দেশেই রেখে আসবো ভাবছি। আমাদের মত লোকের পক্ষে কলকাতায় সংসার করা সম্ভব নয়।'

মদন বলে—'যা বলেছেন। কলকাতা হলো আমির আর ফকিরদের শহর। আমাদের মতন এই মিডিল ক্লাস পিপ্‌লদের খুবই বিপদ। আচ্ছা, চলি নমস্কার।'

হারাধন প্রতি-নমস্কার করেন। মদন চলে যায়। কমলা আবার ভিতরে এসে দাঁড়ায়। হারাধন বলেন—'আমি একটু বেরুচ্ছি।'

কমলা বলে—'ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছ'?

হারাধনের ইচ্ছা করে এখুনি ভুতুর জন্যে ডাক্তার ডেকে আনতে, কিন্তু কমলার কাছে অভাবের হাজার ফিরিস্তি শুনতে হবে ভেবে বলেন—'না, ওই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছ থেকে একটু ওষুধ নিয়ে আসি।'

—'অ'—বলে কমলা আবার ভিতরে চলে যায়। হারাধন বেরুতে যাচ্ছিলেন। ভুতু জড়িত স্বরে ডাকে—'বাবা।'

হারাধন আবার ভুতুর পাশে বসেন, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—'কি বাবা? তুমি চুপ করে শুয়ে থাক, আমি তোমার জন্যে মিষ্টি-মিষ্টি ওষুধ নিয়ে আসছি।'—বলে সংস্কার অনুযায়ী পকেট থেকে পয়সা বের করে ভুতুর কপালে ছুঁইয়ে বালিশের তলায় সেই পয়সাটা রেখে দিয়ে, চাদরটা ভাল করে ঢেকে দিয়ে হারাধন ওষুধ আনতে যান। ভুতু একা চুপ করে শুয়ে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হারাধন ওষুধ নিয়ে ফিরে আসেন। ভুতু ওষুধ খায়। কিন্তু পরদিন সকালেও তার জ্বর কমার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। হারাধন আবার যান ডাক্তারের কাছে। কমলা নিজের ছেলে-মেয়েদের নিয়েই ব্যস্ত। ভুতু একা চুপ করে শুয়ে আছে। হঠাৎ জানালা দিয়ে পুষ্পর ডাক শুনে আস্তে-আস্তে মুখ বাড়িয়ে ছাখে—পুষ্প আর বীণা জানলার ওধারে দাঁড়িয়ে। পুষ্প বলে—'কি হয়েছে তোমার? যাও নি কেন?'

ভুতু বলে—'আমার জ্বর হয়েছে।'

পুষ্পর মুখ শুকিয়ে যায়। বলে, 'কবে থেকে?'

ভুতু বলে—'আজ তিন চার দিন হলো। তোমরা যাও—নতুন মা দেখতে পেলে তোমাদের বকবে? আমি সেরে উঠেই যাব।'

পুষ্প বলে—'আচ্ছা বাবা, তুমি সাবধানে থেকো।' বলে পুষ্প ও বীণা চলে যায়। ভুতু জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে তাদের যাওয়ার দিকে। পুষ্প বার-বার পেছন ফিরে দেখতে-দেখতে যায়। ভুতুর চিন্তায় তার মনটা খুব ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু কি করবে কিছু ভেবে পায় না, প্রকাশ্যে ভুতুর সঙ্গে দেখা করার, তাকে যত্ন করার কোনো অধিকার তার নেই। সমাজের

কাছে অস্পৃশ্য, ঘৃণিতা সে।

পুষ্প এসে নিজের ঘরে পূজোর জায়গায় বসে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানায়—'ঠাকুর, আমার ভুতুকে ভাল করে দাও। নিরোগ করে দাও।'

দুপুর বেলা পুষ্প আবার এসে দাঁড়ায় ভুতুর জানলার পাশে। চোরের মত চুপিচুপি আর একটু জানলার কাছে গিয়ে ভুতুকে দেখতে যাবে, এমন সময় কমলাকে এ ঘরে আসতে দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে জানলার পাশে সিঁটিয়ে দাঁড়ায়। কমলা সাবুর বাটিটা ভুতুর বিছানার পাশের টুলটায় ঠক্ করে নামিয়ে দিয়ে বলে—'খা'।

ভুতু বলে—'রোজ-রোজ সাবু আমার ভালো লাগে না।'

কমলা ঝাঁপিয়ে উঠে বিকৃত স্বরে বলে—'না, অসুখে তোমায় রাজভোগ দেবো, খাবি তো খা।'—বলে আবার গট্‌গট্ করে চলে যায়।

ভুতু সাবু খায় না। তেমনি নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকে। পুষ্প আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার জানলার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই, আবার কমলাকে এ ঘরে আসতে দেখে পুষ্প এবার সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আবার একটু পরেই পুষ্প আসে আঁচলে করে আপেল, আঙ্গুর আর কমলালেবু নিয়ে। ভুতু তেমনি একা শুয়ে আছে। পাশে বাটিতে ঠাণ্ডা সাবুটা তেমনিই পড়ে আছে, ভুতু স্পর্শও করে নি।

মৃদুস্বরে ডাকে পুষ্প—'ভুতু বাবু—'

মুখ ফেরায় ভুতু। পুষ্পকে দেখে একটু ম্লান হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে।

শুক্‌নো মুখে ফিস্‌ফিস্ করে পুষ্প বলে—'কেমন আছো বাবা?'

ভুতু বলে—'আগের মতই।'

পুষ্প বলে—'তোমার জন্যে ক'টা ফল এনেছিলাম—দেবো?'

'দাও।' বলে ভুতু জানলার দিকে পাশ ফেরে।

'না-না, উঠো না, তুমি উঠো না বাবা।'—বলে পুষ্প আঁচল থেকে ফলগুলো বার করে দেয়। বলে—'তোমার যেটা ভাল লাগবে খেয়ো বাবা।'

ভুতু বলে—'খাবো।'

'হ্যাঁরে, ডাক্তার দেখছে?'

'হোমোপ্যাথি ডাক্তার দেখছে।'

'বড় ডাক্তার ডাকে নি কেন?'

'বাবার তো অতো পয়সা নেই।'

পুষ্প কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ও ঘর থেকে কমলার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। 'কার সঙ্গে কথা বলছিস্ সে ভুতো ?'

ভুতু ব্যস্তভাবে ফলগুলো বালিশের তলায় লুকোতে-লুকোতে বলে—'কারও সঙ্গে না।' বলে পুষ্পকে বলে—'যাও-যাও, আবার কাল এসো।' পুষ্প ঘাড় নেড়ে ব্যস্তভাবে চলে যায়। ভুতু চুপ করে শুয়ে থাকে।

* * *

এর পর বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেছে। ভুতুর অসুখ ক্রমশ বাড়তির দিকে চলেছে। হারাধন যথারীতি সেই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছেই যাওয়া-আসা করছেন।

ভুতুর অসুখ বাড়ার পর থেকে পুষ্প খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। নানান্ ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করে মাথা কুটে বেড়াচ্ছে। আজও সকালে উঠেই ষষ্ঠীতলায় গেছল পুজো দিতে। বাড়ি ফিরে ছাখে অনঙ্গ-বাবুর পি, এ, বঙ্কিমবাবু তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

পুষ্প তাকে দেখে বলে—'আরে, কি খবর ?' বঙ্কিম একটা খাম দিয়ে বলে—'অনঙ্গবাবু এই খামটা পাঠিয়ে দিয়েছেন'।

পুষ্প খামটা নিয়ে কি ভেবে বলে—'আপনি অনঙ্গবাবুকে একবার পাঠিয়ে দেবেন তো।'

বঙ্কিম বলে—'আচ্ছা'—বলে চলে যাচ্ছিল।

পুষ্প বলে—'আজই যেন আসেন।'

বঙ্কিম ঘাড় নেড়ে চলে যায়। পুষ্প ঘরে এসে খামটি খুলে ছাখে—একশো টাকা আর দশ টাকা মেশানো কতকগুলো নোট আর একটি চিঠি। পুষ্প চিঠিটা খুলে পড়ে, অনঙ্গবাবু লিখেছেন,।

পুষ্প,

যদিও তোমার বাড়ির দরজা আমার কাছে বন্ধ, তবুও তোমার মাসোহারার টাকাটা বন্ধ করলাম না, পাঠালাম। আশা করি কুশলে আছো। ভালবাসা জেনো।

ইতি—তোমার
অনঙ্গ দত্ত

পুষ্প চিঠিটা বুকে চেপে ধরে। তার চোখ দু'টো জলে ভরে আসে।

ভুতুর অসুখ দিনের দিন বেড়েই চলে। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বলেছেন ভুতুর টাইফয়েড হয়েছে। ওষুধ চলছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হারাধনের এখন আর্থিক অবস্থাও খুব টানাটানি যাচ্ছে। তার উপর কমলাও ভুতুর সেবা শুশ্রূষায় কোন ভ্রূক্ষেপ করছে না। শুধু পুষ্প সব সময় লুকিয়ে-লুকিয়ে ছুটে আসছে, ভুতুর জানলার কাছে। ভুতুর জন্যে সব সময় তার মনটা ছট্‌ফট্ করছে কিন্তু কিছু একটা উপায় ঠিক করতে পারছে না। পুষ্প জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিল ভুতুকে।

এখন আর ভুতু কোন কথা বলে না। অচেতন হয়ে শুয়ে আছে, তার মাথায় জলপট্টি। লক্ষ্মী হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করছে।

কমলা অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দিবা নিদ্রায় গা এলিয়ে দিয়েছে পাশের ঘরে। ভুতু তার সতীন-কাঁটা, সুতরাং তার সম্বন্ধে কোনো চিন্তা না হওয়াই কমলার পক্ষে স্বাভাবিক।

পুষ্প দিনের পর দিন চোখের সামনে দেখছে—ভুতু কত অবহেলিত, কিন্তু কি করবে পুষ্প? ইচ্ছা করে, জোর করে ঘরে ঢুকে, ভুতুকে নিয়ে যায় নিজের ঘরে। সেবা, দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, বড়-বড় ডাক্তার দেখিয়ে এখুনি সারিয়ে তোলে তাকে, কিন্তু এ ইচ্ছা তার পূরণ হবার নয়। বুক ভরে ভালবাসলেও ভুতুর ওপর তার কোনো অধিকারও নেই, দাবী নেই।

লক্ষ্মীর দৃষ্টির অন্তরালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই পুষ্প দেখছিল ভুতুকে। কি হয়ে গেছে অমন সুন্দর সোনারপানা ছেলেটা, দেখলে চেনা যায় না। কঙ্কালসার দেহ, কালিমাখা মুখ, চোখ দুটো যেন কোঠরে ঢুকে গেছে. অনড় হয়ে শুয়ে ভুতু। লক্ষ্মীর পাখাটা মাঝে-মাঝে ভুতুর কপালে মাথায় লাগছে দেখে পুষ্পর মনে হয় তার বুকে যেন ওই সামান্য আঘাতটাই কাঁটার মতন বিঁধছে। পুষ্প তার থাকতে পারে না, এক সময় হঠাৎ বলে বলে—'এই মেয়েটা ভাল করে বাতাস কর্, দেখছিস্ না পাখাটা মাথায় লাগছে।'

লক্ষ্মী পুষ্পকে কিছু না বলে চিৎকার করে ঘরের দিকে মুখ করে ডাকে —'মা'—

পুষ্প তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে এসে হাঁপাতে

থাকে। কিছুক্ষণ পরেই অনঙ্গদত্ত এসে উপস্থিত হন। পুষ্প তাঁকে আদ্যোপান্ত সব কিছু বলে, ভুতুর কথা। বলতে-বলতে কেঁদে ফেলে পুষ্প। অনঙ্গ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—'তুমি কিছু ভেবো না পুষ্প। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এ পাড়ার সবচেয়ে বড় ডাক্তার ঘোষ আমার বন্ধু, আমি তাকে বলে সব ব্যবস্থা করছি, তোমার ভুতুনাথ দেখবে দু'দিন ভাল হয়ে যাবে।'

পুষ্প আলমারী থেকে কিছু টাকা এনে অনঙ্গর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—'এই নিন, ভিজিট আর ওষুধের দামটা দিয়ে দেবেন।'

'না—না, এখন তোমার টাকা দিতে হবে না। যা করার আমি করছি, তুমি কিছু ভেবো না। তুমি বরং আমায় এককাপ ভাল করে চা খাওয়াও। অনেকদিন হয়ে গেল গেল—তোমার হাতে কিছু খাই নি।'

পুষ্প তাড়াতাড়ি চা করতে বসে। চা করতে-করতে বলে—'আমরা ডাক্তার ঘোষকে দিয়ে ভুতুর চিকিৎসা করাচ্ছি—জানতে পারলে কিন্তু ভুতুর বাবা-মা সে চিকিৎসা নেবে না, উল্টে আমার উপর ক্ষেপে যাবে।'

অনঙ্গ বলেন—'তার জন্যে চিন্তা নেই, আমি ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করে সব ঠিক করে নিচ্ছি, ভুতুর বাবা-মা কিছু টের পাবে না।'

'আচ্ছা—' বলে পুষ্প চায়ের কাপটা অনঙ্গ'র হাতে দিয়েই তাড়া দিয়ে বলে—'আপনি বেশী দেরী করবেন না, চা-টা খেয়েই ডাক্তারকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন অনঙ্গবাবু, ভুতুর অবস্থা দেখে আমি একতিল স্থির থাকতে পারছি না—' বলতে-বলতে পুষ্প'র চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করে ওঠে।

অনঙ্গ চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন—'সত্যি পুষ্প তোমাকে যতই দেখছি, ততই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাচ্ছি!'

* * *

ভুতুর অসুখ বেশ বেড়েছে। বিকার নিয়েছে—ভুতু মাঝে-মাঝে হাত পা ছুঁড়ছে। বিড়বিড় করে কি সব বলছে। একবেলা অফিস করে, বাড়ি ফিরে এসেছেন হারাধন। হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে ডেকে এনেছেন।

ডাক্তার বললেন—'এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে খুব ভালো ডাক্তার ডাকা দরকার।'

হারাধন শুক্‌নো মুখে প্রশ্ন করেন—'এ পাড়ার কে ভালো ডাক্তার?'

ডাক্তার বলেন, 'কেসটা যা দাঁড়িয়েছে—তাতে ডাক্তার ঘোষ ছাড়া আর

কারও ওপর নির্ভর করা যায় না।'

হারাধন বলেন—'কিন্তু ওঁর অতো বেশী ফিজ্ দিয়ে নিয়ে আসা এখন আমার পক্ষে'—

হারাধনের কথা শেষ হওয়ার আগেই ডাক্তার বলেন—'তা ছাড়া উনি একটি পয়সা বাকি রাখেন না। তবে এ অবস্থায়—'হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে গুরু গম্ভীর গলায় কার ডাক শোনা যায়—'বাড়িতে কেউ আছেন? হারাধনবাবু—'

হোমিওপ্যাথি ডাক্তার অবাক হয়ে হারাধনকে বলে—'ডাক্তার ঘোষ এসেছেন।' হারাধন শশব্যস্তে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন—'আসুন-আসুন।'

ডাক্তার ঘোষ বলেন—'এটা কি হারাধনবাবুর বাড়ি? আপনি কি—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই হারাধন। আসুন—' বলে হারাধন ডাক্তার ঘোষকে আপ্যায়িত করেন। ডাক্তার ঘোষ ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বলেন—'আপনার ছেলের অসুখ?'

হারাধন বলেন—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কই দেখি!'—বলে ডাক্তার ঘোষ এগিয়ে গিয়ে ভুতুর বিছানায় বসে ভুতুকে পরীক্ষা করেন। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে ডাক্তার ঘোষের পরীক্ষা করা লক্ষ্য করেন। হারাধনও অবাক হয়ে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ডাঃ ঘোষ ভুতুকে পরীক্ষা করে বলেন—'একটা কাগজ দেখি।'

হারাধন কাগজ কলম দেন। ডাঃ ঘোষ খস্‌খস্ করে প্রেসক্রিপশন লিখে হারাধনের হাতে দিয়ে বলে—'এই ওষুধটা আমার ডাক্তারখানা থেকে নিয়ে এসে খাওয়ান।'—বলেই ডাঃ ঘোষ গট্‌গট্ করে চলে যাচ্ছিলেন, হারাধন ইতস্ততঃ করে কি বলতে যাচ্ছিলেন, ডাঃ ঘোষ বলেন —'আমার সময় খুব কম, তাড়াতাড়ি ওষুধটা এনে খাওয়াবার ব্যবস্থা করুন।'—বলেই ঝড়ের মতন যেমন এসেছিলেন, তেমনিই বেরিয়ে যান ডাঃ ঘোষ।

হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আর আর হারাধন অধিকতর আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বলেন—'আশ্চর্য! উনি ফিজ্ ছাড়া কোথাও দেখেন না অথচ—' হারাধন বলেন—'আমারও আশ্চর্য লাগছে। আমি ওঁকে 'কলও' দিই নি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' বলে হারাধন পকেট থেকে দু'টি টাকা বের করে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের হাতে দিয়ে বলেন—'এই নিন আপনার ভিজিট।'

'ওঃ, থ্যাঙ্ক্ ইউ—'বলে টাকাদু'টি পকেটে পুরে স্যুট করে চলে যায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। হারাধন কমলাকে বলে—'ওগো, শুনছো, আমার জামাটা দাও। আমি ডাক্তারখানা থেকে ওষুধটা নিয়ে আসি।' কমলা জামা এনে দিয়ে ঠোঁট উল্টে বলে—'কিছু বেশী করে টাকা নিয়ে যেও। এ্যালোপ্যাথি ওষুধের অসম্ভব দাম।'

'জানি',—বলে হারাধন বিরক্ত হয়েই চলে যান কমলার ব্যবহারে।

* * *

'ডাঃ ঘোষের ফার্মেসী, এ পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশী চালু। কমপাউণ্ডার খুব ব্যস্ত, তবু হারাধনের প্রেসক্রিপশনটা দেখা মাত্রই সবার আগে তাকে ওষুধ দিয়ে বলে, 'এই মিক্‌চারটা সারাদিনে চারবার, আর এক দাগ মিক্‌চারের পর একটা করে বড়ি।'

হারাধন জিজ্ঞেস করেন—'কত দাম দিতে হবে?'

এমন সময় ডাক্তার ঘোষ একটা রোগীকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের আলোয় তার গলাটা পরীক্ষা করতে থাকেন।

কম্পাউণ্ডার হারাধনের প্রেসক্রিপশনটার পেছন দিকটা দেখে বলে—'ডাক্তারবাবু জানেন।'

হারাধন ডাক্তার ঘোষের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন—'ডাক্তারবাবু ওষুধের কত দাম দিতে হবে?'

ডাঃ ঘোষ রোগী দেখায় ব্যস্ত। প্রথমটা হারাধনের কথার কোনো জবাব না দিয়েই রোগীকে বলেন, 'হাঁ করুন, আর একটু বেশী করে হাঁ করুন।' বলে রোগীর গলা পরীক্ষা করতে থাকেন।

হারাধন আবার বলেন, 'ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তার ঘোষ নিজের কাজ করতে-করতেই বলেন, 'ওষুধ পেয়েছেন, তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে ছেলেকে খাওয়ান, দেরী করবেন না। দামের

হিসেব-নিকেশ পরে হবে।' বলে রোগীকে বলেন, 'হু' টনশিলটাকে বেশ বাড়িয়েছেন দেখছি। চলুন দেখি' বলে রোগীকে নিয়ে ভেতরে চলে যান।

হারাধন আর কিছু বলতে সাহস করেন না, ওষুধ নিয়ে চলে যান।

পুষ্প ষষ্ঠীতলায় স্নানজল এনে ভুতুর লাগানো সেই শিউলিচারায় ঢালে। ঠাকুর দেবতার পায়ে প্রার্থনা জানানোর বিরাম নেই তার। ভুতুর অবস্থা দেখে খাওয়া-ঘুম তার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সুযোগ পেলেই ছুটে যায় ভুতুর জানালার পাশে। ভুতুকে দেখে তার বুকটা হু-হু করে ওঠে, চোখ ফেটে জল আসে।

ভগবানের কাছে পুষ্পর প্রার্থনা নিষ্ফল হলো না। কয়েকদিনের মধ্যে ধীরে-ধীরে জ্বর ছাড়লো ভুতুর। পুষ্পও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচালো। অনঙ্গর নির্দেশে ডাঃ ঘোষ এখনও যাওয়া-আসা করছেন।

ভুতু আজ উঠে বসেছে। বসে-বসেই ডাঃ ঘোষকে হাত দেখাচ্ছিল ভুতু। ডাঃ ঘোষ হাসিমুখে বলেন, 'এই তো, একেবারে ভাল হয়ে গেছ।'

ভুতু বলে, 'ডাক্তারবাবু, ভাত?'

ডাঃ ঘোষ বলেন, 'হ্যাঁ, ভাত নিশ্চয়ই খাবে, তবে আজ আর কালকের দিনটা থাক্—পরশু ভাত খেয়ো।' বলে হারাধনের দিকে ফিরে বলেন, 'আরও ক'দিন ওষুধ চালিয়ে যান, তাড়তাড়ি জ্বরটা বন্ধ করা হয়েছে তো, এখন ওষুধ বন্ধ করে দিলে আবার রিল্যাপস্ করতে পারে। চলি ভুতুবাবু' বলে ডাক্তার ঘোষ যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ান। হারাধনও উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ডাক্তারবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব কিছু মনে করবেন না।'

'বলুন।' বলে ডাক্তার ঘোষ ফিরে দাঁড়ান।

হারাধন বলেন—'আপনি এত দিন ধরে রোজ আসছেন, ওযুধের দাম নিচ্ছেন না, ভিজিট্ নিচ্ছেন না আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ডাঃ ঘোষ বলেন—'আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি।'

হারাধন বলেন—'মানে?'

ডাঃ ঘোষ বলেন—'মানে, যা বুঝছি—আপনি একটি তাল-ভোলা লোক।'

হারাধন কিছু না বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাঃ ঘোষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ডাঃ ঘোষ ভুতুকে দেখিয়ে বলেন—'এর মা যে প্রতিদিন আমাকে

ভিজিট্ আর ওষুধের দাম দিয়ে আসছেন। আগাম, আপনি তার কিছুই খবর রাখেন না?'

হারাধন এ কথা শুনে অবাক হন। দরজার ওপাশে কমলাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এঁদের কথাবার্তা শুনছিল, তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বিস্ফারিত চোখে ডাক্তার ঘোষের কথা শুনতে থাকে।

ডাঃ ঘোষ বলছেন—'খালি অফিস আর বড়বাবু নিয়ে আছেন বুঝি? বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কিছুই খোঁজ রাখেন না। স্ট্রেঞ্জ।'—বলে ডাঃ ঘোষ গটগট্ করে চলে যান। হারাধন আর কোনো কথার সুযোগ পান না। কমলা এগিয়ে আসে হারাধনের কাছে?

হারাধন বলেন—'কি ব্যাপার বল তো কমলা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—কে এতো টাকা খরচ করলো?'

কমলা বলে—'কি জানি বাবা, আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না গো।'

হারাধন বলেন—'সত্যি, ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে। এক কাঁড়ি টাকা। আজ অফিসফেরতা ডাক্তারবাবুর কাছে খবরটা নিশ্চয়ই জেনে আসবো। ওই সময়টা ডাক্তারবাবুও একটু ফ্রি থাকেন।'

কমলা বলে—'আর শোনো, এবার আমাদের যাবার দিনটা ঠিক করতে হয়।'

—'হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি করবো।' বলে হারাধন ওষুধ আনতে যাবার জন্যে শিশিটা নেন। কমলা গলার স্বরে যতদূর সম্ভব মধু ঢেলে 'আর ছাখো, আমার একটাও ভালো শাড়ি নেই, যাবার আগে এনে দিও।'

হারাধন মুচ্কি হেসে বলে—'আচ্ছা, আজই এনে দেবো।'

'খুব সুন্দর চওড়া পাড় দেখে এনো, কেমন!'—বলে গদগদ হয়ে কমলা মুচ্কি-মুচ্কি হাসতে থাকে।

অফিস ছুটি হওয়ার পর হারাধন কমলার জন্য একটা দামী শাড়ী কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। বাসস্টপটা ডাঃ ঘোষের ফার্মাসির কাছাকাছি। হারাধন বাস থেকে নেমে ডাঃ ঘোষের ফার্মাসিতে গিয়ে ঢুকলেন। চেম্বারে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় ভেতরে থেকে পুষ্পর কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ালেন।

পুষ্প তখন চেম্বারের ভেতরে ডাক্তার ঘোষকে বলছে—'আমার ভুতুনাথ ভালো হয়ে গেছে তো ডাক্তার বাবু?'

ডাঃ ঘোষ বলছেন—'হ্যাঁ—হ্যাঁ, আপনার ভুতুনাথ ভালো হয়ে গেছে। কাল থেকে আর আমার যাবার দরকার নেই। আমি ভুতুনাথের বাবাকে বলে এসেছি। কাল আর আপনার ছেলেকে ভাত দেবেন না, একাদশী। —পরশু দেবেন।"

পুষ্পর তবুও সন্দেহ যায় না। বলে, 'আর কোনো ভয়ের কারণ নেই তো ডাক্তার বাবু?'

'না—না, আর কদিন ওষুধ চলুক। তারপর একটা পেটেন্ট্ ওষুধ লিখে দেবো। দেখবেন আপনার ভুতুনাথ কিছুদিনের মধ্যেই আবার আগের স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।'

হারাধন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন এদের কথা। এতক্ষণে ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

পুষ্প চেম্বার থেকে বেরিয়েই সামনে হারাধনকে দেখে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যায়। হারাধন ডাকেন—'পুষ্প—পুষ্প—শোনো'—

পুষ্প দাঁড়ায় না। ভাবে হারাধন শুনেছেন তার কথা, ধরা পড়ে গেছে পুষ্প, হয়তো হারাধন তাকে যাচ্ছেতাই অপমান করবেন।

পুষ্প তাই তাড়াতাড়ি চলে যায় তার বাড়ির দিকে। হারাধনও তার পিছু-পিছু যেন তাড়া করে আসেন। ডাকেন—'পুষ্প—পুষ্প, শোনো'—পুষ্প ততক্ষণে বাড়ির সামনে চলে এসেছে। হারাধনের ডাকে আর না থেমে পারে না। থমকে দাঁড়ায় তার বাড়ির সামনের সেই ডাষ্টবিনটার পাশে, যেখানে হারাধন একদিন তাকে অপমান করে বলেছিলেন—'তুমি অসামাজিক, তোমার সঙ্গে কথা বললে পাপ হয়—অসম্মান হয়।'

আজও ঠিক সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে পুষ্প। হারাধন এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ান। পুষ্প অপমানিত হবার ভয়ে স্থির-নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু হারাধন সেদিনের সেই কথা মনে করে নিতান্ত অপরাধীর মতন কৃতজ্ঞতার সুরে বলেন—'পুষ্প, আমার সে দিনের সে-সব কথা তুই ভুলে যা। আমি তোকে ঠিক চিনতে পারিনি।'

পুষ্প কিছু বলে না। মাথা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হারাধন আবার বলেন—'তুই যে এতদিন ধরে ডাক্তারের ভিজিট্, ওষুধের দাম দিয়ে আমার ভুতুকে বাঁচিয়ে তুলেছিস্—এ ঋণ আমি জীবনে

শোধ করতে পারবো না। তুই যে টাকা খরচ করেছিস—তা ফেরত দিয়ে তোকে অপমান করার সাধ্য আমার নেই। শুধু আমার একটা অনুরোধ—আমার সে দিনের সেই অপরাধের জন্য তুই আমায় ক্ষমা কর।'

ছলছল চোখে পুষ্প মুখ তুলে বলে—'দাদাবাবু!'

হারাধন বলেন—'হ্যাঁ, আমায় ক্ষমা করো বোন, তোকে আমি অন্যায় ভাবে অপমান করেছি। তোর এই অবস্থার জন্যে আমরাই দায়ী—তোর কোন দোষ নেই।'—বলে একটু থেমে হারাধন কমলার জন্যে কেনা সেই দামী শাড়িটা পুষ্পর হাতে দিয়ে বলেন,—'আমার আর একটা অনুরোধ রাখিস বোন—এই শাড়িটা ভাইদ্বিতীয়ার দিন তোর এই হতভাগা দাদার কথা মনে করিস বোন।'

বলে হারাধন আর এক মুহূর্ত সেখানে না দাঁড়িয়ে হন্‌হন্‌ করে নিজের বাড়ির দিকে চলে যান। পুষ্প নতুন শাড়িটা বুকে চেপে ধরে মাথা হেঁট করে হারাধনের উদ্দেশ্যে অশ্রুভরা নয়নে বারবার প্রণাম জানাতে থাকে।

* * *

ক'দিনের মধ্যেই ভুতু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পুষ্পর ঘরে এসে উপস্থিত হলো। পুষ্প তখন ঠাকুরের কাছে প্রণাম করছিল। প্রণাম করে ওঠবার আগেই ভুতু নিশব্দে এসে তার পেছনে দাঁড়ালো। পুষ্প প্রণাম করে উঠেই ভুতুকে দেখে একমুখ হেসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে আদর করতে-করতে বলে—'বেশ ভালো আছিস্ বাবা?'

ভুতু ঘাড় নেড়ে বলে—'হ্যাঁ।'

পুষ্প বলে—'তোর জন্যে এক বাক্স ভালো বিস্কুট এনে রেখেছি। দাঁড়া, তার আগে এইটে তোকে পরিয়ে দিই।'

—বলে পুষ্প ঠাকুরের জায়গায় রাখা একটা লাল কারে বাঁধা সোনার মাদুলি তুলে নিয়ে আর একবার ঠাকুরদের পায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে কপাল ঠেকিয়ে ভুতুর বাহুতে বাঁধতে থাকে।

ভুতু প্রশ্ন করে—'এটা কিসের মাদুলি?'

পুষ্প বলে—'ষষ্ঠীতলার মাদুলি। এ পাড়ার মা ষষ্ঠী খুব জাগ্রত। তোর জন্যে মানত করেছিলাম, পরে থাকলে আর অসুখ করবে না।'

ভুতু মাদুলিটা দেখতে দেখতে বলে—'সোনার না-কি?

'সে তোমায় জানতে হবে না।'—বলে পুষ্প বিস্কুটের একটা টিনের শীল খুলে ভুতুকে বিস্কুট দেয়।

ভুতু বিস্কুট খেতে খেতে বলে—'পরশু আমরা চলে যাচ্ছি—জানো?'

চম্‌কে ওঠে পুষ্প। বলে—'না তো, কোথায় যাচ্ছিস্?'

ভুতু বলে—'দেশে।'

পুষ্প বলে—আবার কবে আসবি?'

ভুতু বলে—'আর আসবো না। বাবা এখানকার বাসা তুলে দিচ্ছে।'

আঁতকে ওঠে পুষ্প! কিছুক্ষণ কোনো কথা আসে না তার মুখে। তারপর ধীরে-ধীরে করুণ স্বরে বলে—'তুই আমায় ছেড়ে চলে যাবি বাবা'?

ভুতু বলে—'না—না, আমি আবার এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।'

পুষ্প কিছু বলে না, এ সু-সংবাদ তার কাছে যে কতখানি দুঃসংবাদ, তা পুষ্প নিজে ছাড়া আর কাউকে বোঝাতে পারবে না। ভুতু তাকে ছেড়ে চলে যাবে। কথাটা শুনে অবধি হু-হু করতে থাকে। ভুতু চলে যায়। পুষ্প তার যাওয়ার দিকে উদাস ভাবে তাকিয়ে থাকে।

তার দু'চোখ জলে ভরে আসে।

কমলা ভুতুর হাতে পুষ্পর দেওয়া সোনার মাদুলি দেখে তেলে-বেগুনে জলে ওঠে। জোর করে ভুতুকে ধরে হাত থেকে মাদুলিটা খুলতে থাকে।

ভুতু বাধা দিয়ে বলে—'না—না, খুলো না, মা ষষ্ঠীর মাদুলি, খুলো না—খুলো না।'

কমলা মাদুলি খুলতে-খুলতে বলে—'চুপ, নিশ্চয় পুষ্প এই মাদুলি দিয়েছে তোকে?'

ভুতু বলে—হ্যাঁ। মানত করা মাদুলি।'

'বড্ড বাড় বেড়েছে দেখছি বাজারের মেয়েটার।'—বলে জোর করে ভুতুর হাত থেকে মাদুলিটা খুলে ঝিকে-কে ডাকে—'নাকুর-মা, নাকুর-মা—'

'কি বলছেন দিদি?' বলে নাকুর-মা আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে এসে দাঁড়ায়।

কমলা মাদুলিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে—'ওই বাড়িতে গিয়ে পুষ্পকে মাদুলিটা দিয়ে এসো, আর বোলো, মাদুলি আমরাও দিতে জানি,

মাদুলি কেনবার টাকাও আমাদের আছে, ও যেন আর আদিখ্যেতা করতে না আসে।'

ভুতু সাহস করে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু রাগে-দুঃখে তার সর্বাঙ্গ থর-থর করে ওঠে। ঝি নাকুর-মা মাদুলিটা নিয়ে পুষ্পকে ফেরত দিতে যায়।

কমলা ভুতুর দিকে ফিরে বলে—'আর শোন ভুতু, যাবার আর দু'দিন বাকি আছে আমাদের, এ দু'দিন তুই আর ওদিক পানে মাড়াবি না।'—বলে ভেতরের ঘরে চলে যায়।

পুষ্পর জন্যে ভুতুর বুকটা কেমন মুচড়ে ওঠে। পুষ্প নাকুর-মা'র কাছ থেকে মাদুলিটা নিয়ে, সেটা বুকে চেপে নীরবে কাঁদতে থাকে।

দেখতে-দেখতে দু'দিন কেটে গেল। আজ ভুতুরা চলে যাবে কার্তিকপুরে। হারাধন ভোর থেকে উঠে জিনিস পত্র গোছগাছ বাঁধা-ছাঁদা করছেন।

সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে হারাধন গাড়ী ডাকতে যান। কমলা তখনও টুকিটাকি গোছগাছে ব্যস্ত, ভুতু সকাল থেকে সুযোগ খুঁজছে, কতক্ষণে একবার গিয়ে পুষ্প'র সঙ্গে দেখা করে আসবে। দেশে যেতে তার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু পুষ্পর জন্যে যে সব সময় কান্না পাচ্ছে।

কমলা একটুখানি দৃষ্টির অন্তরালে যেতেই ভুতু ছুটে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। লক্ষ্মী হঠাৎ জানালা দিয়ে ছাখে, ভুতু ছুটতে-ছুটতে গিয়ে পুষ্পর বাড়িতে ঢুকলো। লক্ষ্মী চিৎকার করে বলে—'মা দাদা চলে গেলো।'

কমলা ভেতরের ঘর থেকেই বলে -'কোথায় ?'

লক্ষ্মী বলে—'পুষ্পর ঘরে।'

কমলা হারাধনের স্যুটকেসটা এ ঘরে এনে ট্রাঙ্কের ওপর রাখতে-রাখতে গিজগিজ করে বলে, 'যাবার সময় একটা কাণ্ড না করে ছাড়বে না দেখছি।'

পুষ্প বঁটি নিয়ে আনাজ কুটছিল, ভুতুকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে যেতে গিয়ে বঁটিতে লেগে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের পা'টা অনেকখানি কেটে গেল। কিন্তু পুষ্পর সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, ছুটে যায় ভুতুকে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে। ভুতু ছাখে পুষ্পর পায়ের কাটা জায়গায় ঝর্‌ঝর্‌ করে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়ছে। ভুতু ভয় পেয়ে বলে—'এঃ, তোমার পা কেটে গেল।'

পুষ্প অগ্রাহ্য করে বলে—'যাক্‌ বাবা ও একটু কেটেছে—চুন লাগিয়ে

দেখো।'

'না-না, আমি ওষুধ নিয়ে আসছি।' বলে ভুতু পুষ্পর হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে চলে যায়। পুষ্প ডাকে—'ওরে থাম্—থাম্, ও ভুতু শোন—ভুতু—'

ভুতু এতক্ষণে দৌড়ে চলে গেছে তাদের বাড়িতে।

ভুতু হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে এসে এখানে-সেখানে ডেটলের শিশিটা খুঁজতে থাকে। কোথাও না পেয়ে হারাধনের স্যুটকেশ খুলে হাতড়ে হাতড়ে ডেটল, তুলো আর ব্যাণ্ডেজের কাপড় বের করে। লক্ষ্মী এসে দেখে বলে—'মা, দাদা বাবার স্যুটকেশ খুলেছে।'

কমলা ভেতর থেকে এসে তিক্ত স্বরে বলে—

'এই স্যুটকেশ খুলেছিস কেন!'

ভুতু বলে—'ওষুধ নিলাম।'

—বলে ডেটল ইত্যাদি নিয়ে দৌড়ে বেড়িয়ে যেতে যায়, কমলা খপ্ করে মুচড়ে ধরে বলে—ডেটল নিয়ে যাচ্ছিস, কার কাটলো?'

ভুতু, পুষ্পর বাড়ির দিকে দেখিয়ে বলে—'ওই যে—ওর।'

'ওর মানে পুষ্পর! তার জন্য সোহাগ করে এখন থেকে ওষুধ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লক্ষীছাড়া—'বলে কমলা ডেটল কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। ভুতু দেয় না। বলে—'ছেড়ে দাও, আমায় যেতে দাও।'

কমলা চোখ রাঙিয়ে চিৎকার করে বলে—'না, যেতে পাবি না।'

'আমি যাবই।'—বলে ভুতু ছাড়াবার চেষ্টা করে।

কমলাও ছাড়ে না, বলে—'যাবি! যতবড় মুখ নয়, ততবড় কথা।' রাখ্—রাখ্ বলছি ডেটল।'

'না, আমায় ছাড়, ছেড়ে দাও'—বলে ভুতু হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে। দু'জনে প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ভুতু আজ যেন ক্ষেপে গেছে! কোন কিছুতেই এখন সে ভয় পায় না। কমলার কোলে গাবু, তার ওপর ভুতু তার সর্বশক্তি দিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। কমলা বেশীক্ষণ তাকে এঁটে উঠতে পারে না। ভুতু এক ধাক্কা মেরে কমলার হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলে যায় পুষ্পর ঘরে। কমলা রাগে ফোঁস্-ফোঁস্ করতে থাকে।

ভুতু বসে নিজের হাতে পুষ্পর পায়ে ডেটল দিয়ে, তুলো দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। পুষ্প বলে—'আমার জন্যে কেন এত করছিস বাবা? কেন

পায়ে হাত দিচ্ছিস ?'

ভুতু বলে—'তাতে কি হয়েছে ?'

পুষ্প কান্নাভাঙা গলায় বলে—'হ্যাঁরে, তোরা কি এখুনি যাবি ?'

ভুতু বলে—'হ্যাঁ আমি এবার যাই! না হলে নতুন মা বকবে।'

পুষ্প লে—'যাই—বলতে নেই বাবা, এসো।'

ভুতু ছলছল চোখে পুষ্পর ম্লানমুখের দিকে চেয়ে বলে—'বড় হয়ে, তোমার মাদুলি আমি ঠিক নিয়ে যাব দেখো।'—বলে ঠক্ করে পুষ্পকে প্রণাম করতে যায়।

পুষ্প তার দু'হাতে ধরে বাঁধা দিয়ে বলে—'এ কি করছিস বাবা। বামুনের ছেলে হয়ে—'

ভুতু বলে—'আমি যে তোমায় ভালবাসি, তোমাকে প্রণাম করবো না তো কাকে করবো ?'

এই কথায় বুকটা আরও ডুকরে কেঁদে ওঠে, পুষ্প অশ্রুভরা চোখে ভুতুতে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—'আমাকে তুই ভালবাসিস ?'

'হ্যাঁ, তোমাকে সবার চেয়ে ভালবাসি। তুমিও তো আমায় কত ভালবাসো।'

'আমায় ছেড়ে থাকতে তোর কষ্ট হবে না ?'

'হবে। খুব কষ্ট হবে।'

'আমায় ভুলতে পারবি না ?'

'না কক্ষণো না।'—বলতে-বলতে ভুতুর চোখ দু'টোও জলে ভরে আসে।

পুষ্প সস্নেহে তার চোখের জল মুছিয়ে বলে—'কাঁদিস না বাবা। যাবার সময় কাঁদতে নেই। আমি তোকে আশীর্বাদ করছি, ভগবান তোর ভাল করুন।

ভুতু হঠাৎ পুষ্পর অন্যমনস্কতার সুযোগে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দৌড়ে চলে যায়। পুষ্পও কাঁদতে-কাঁদতে বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে ভুতুব যাওয়ার দিকে।

বাইরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী আসতে দেখে চীৎকার করে ঘরের দিকে মুখ করে বলে—'মা, দাদা আসছে।'

'কইরে—কই ?'—বলতে-বলতে কমলা মারমূর্তিতে ঝড়ের বেগে

বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। ভুতু ততক্ষণে সিঁড়ির কাছে এসে গেছে। কমলা তাকে ধরে এলোপাথাড়ি প্রহার করতে থাকে। ভুতু কাঁদে না, কোনো প্রতিবাদ করে না। কাঠের পুতুলের মতন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মার খায়।

কমলা রাগে কাঁপছে। মারতে-মারতে বলে, 'হতভাগা পাজি-নচ্ছার, ঘর থেকে ওষুধ নিয়ে গিয়ে সোহাগ দেখাতে যাওয়া। আজ তোকে মেরে শেষ করে ফেলবো।'

পুষ্প তার বাড়ির বাইরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, ভুতুকে ওভাবে প্রহার করতে দেখে, ছট্‌ফট্ করে ওঠে। ভুতুর প্রহারটা যেন হাতুড়ির ঘা হয়ে তার বুকে বাজে। কমলা তখনো ভুতুকে একটানা প্রহার করে চলেছে। বলে—'কেন গিয়েছিলি? বল্—কেন গিয়েছিলি?'

কঠিন কণ্ঠেই ভুতু জবাব দেয়—'বেশ করেছি।'

কমলা এই কথা শুনে আরও ক্ষেপে যায়। ভুতুর চুলের মুঠি ধরে গায়ের জোরে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে বলে—'বেশ করেছি। এত বড় সাহস। আবার মুখে এই কথা। বল্ আর যাবি? বল্ আর যাবি কখনো?'

ভুতু আগের মতই বলে—'হ্যাঁ যাবো। একশোবার যাবো।'

'তবে দূর হয়ে যা, মরে যা—মর্ মর্--' বলে খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে ভুতুকে ছিট্‌কে ফেলে দিতে যায়। পুষ্প ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কমলা ভুতুকে গায়ের জোরে ঠেলে ফেলে দিতেই পুষ্প তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ফেলে মিনতি করে বলে—'মারবেন না, আর মারবেন না।'

কমলা রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলে—'না, মারবো না। মেরে শেষ করে দোব—ও রকম ছেলে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।'

'বালাই ষাট্-ষাট্—' বলে পুষ্প ভুতুর গায়ে মাথায় হাত বোলাতে থাকে। কাঁদতে-কাঁদতে বলে—'কেন তুই আমায় ওষুধ দিতে গেলি বাবা? —কেন গেলি?'

ভুতুও কাঁদতে-কাঁদতে বলে—'তোমার যে পা কেটে গেল?'

পুষ্প ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেলে বলে—'আমার পা কেটে গেল, তো তোর কিরে হতভাগা। বল্ আর যাবি না, বল আর আমার কাছে যাবি না।'

পুষ্পর মুখের দিকে মুখ তুলে ভুতু একটু চুপ করে থেকে কাঁদতে-কাঁদতে

বলে—'তুমিও বলছো?'—বলে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে ভুতু। পুষ্প তাকে বুকে চেপে ধরে ঝর্‌ঝর্‌ করে নীরবে কাঁদতে থাকে।

কঠিন কর্কশ কণ্ঠে কমলা বলে—'পুষ্প, তুমি যাও এখান থেকে। আমরা এখুনি বেরুবো, যাবার সময় তোমার মুখ দেখে যেতে চাই না।'

কথাটা বজ্রাঘাতের চেয়েও বোধহয় বেশী লাগে পুষ্পর বুকে, সারা শরীর যেন পাথরের মূর্তির মতন হয়ে যায়। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে ভুতুর জড়িয়ে ধরা হাত দু'টো ধীরে-ধীরে ছাড়িয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে চলে যায় পুষ্প তার বাড়ির দিকে। ভুতু তার যাওয়ার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, পুষ্প কাঁদতে-কাঁদতে এসে দাঁড়ায় ভুতুর পোঁতা সেই শিউলির চারাটার কাছে। টপ্‌ টপ্‌ করে তার চোখের জল ঝরে পড়ে শিউলির চারার পাতার ওপর।

* * *

হারাধন ততক্ষণে একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে এনেছেন। মালপত্তর সব তুলে ওরা সবাই গাড়িতে উঠে বসে। ভুতুর তখনও কান্নার বিরাম নেই, একটানা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে গাড়ির ভিতর। পুষ্পর বাড়ির সামনে দিয়ে চলেছে গাড়িটা। ঘোড়ার পায়ের কপ্‌-কপ্‌ আওয়াজের সঙ্গে সহিসের কথা শুনে দৌড়ে বেরিয়ে আসে পুষ্প।

ভুতু গাড়ির ভেতর থেকে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায়। ছাখে পুষ্প মুখে আঁচল দিয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ করে কাঁদছে। ভুতুও ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। কমলা ধমক দিয়ে তাকে টেনে ভেতরে বসিয়ে দেয়। গাড়িটা এগিয়ে যায় বড় রাস্তার দিকে। পুষ্প যায় পিছু-পিছু। গাড়িটা বড় রাস্তায় পড়ে দ্রুত চলতে শুরু করে। যতক্ষণ গাড়িটাকে দেখা যায় তাকিয়ে থাকে, পুষ্প হতাশ হৃদয়ে, বাকরুদ্ধ কণ্ঠটা তার কন্‌কন্‌ করতে থাকে। গাড়িটা তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে ধীরে-ধীরে পুষ্প আবার এসে দাঁড়ায় সেই শিউলির চারাটার কাছে। ভুতুর সেই কথা বারবার তার কানে বাজতে থাকে—'আমি যে তোমায় ভালবাসি, তোমাকে প্রণাম করবো না তো কাকে করবো?'

পুষ্প ঝর্‌ঝর্‌ করে কাঁদে। চোখের জলে বুকের কাপড় ভিজে যায়। পুষ্প কতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার ভ্রূক্ষেপ নেই। বীণার

কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে মুখ তুলে চায়। বীণা আর বর্ণা বাইরে গেছল। দরজায় ঢুকেই বীণা বলে পুষ্পকে—'পুষ্পাদি, তোমার পুষ্যিপুত্তুর চলে গেল তুমি জানো না?'

'জানি'—বলে পুষ্প আঁচলে চোখ মোছে। তারপব ধীরে-ধীরে তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে। একটু পরে দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনে পুষ্প বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে ছাখে, অনঙ্গবাবুর পি. এ. বঙ্কিমবাবু অন্যদিনের মতন টাকা ভর্তি খাম নিয়ে দাঁড়িয়ে।

পুষ্প সে খামটা না নিয়েই বলে—'অনঙ্গবাবুকে বলবেন, আজ থেকে আর আমার টাকার দরকার হবে না।'

বঙ্কিম বলে—'সে কি!'

'হ্যাঁ, ও টাকার প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেছে।' বঙ্কিম পুষ্পর এই ভাবান্তরের কারণ কিছুই বুঝতে পারে না, তবে এর পেছনে যে বিরাট কোনো কারণ আছে, সেটা পুষ্পকে দেখেই বুঝতে পারে। তাই বঙ্কিম আর কোনো কথা বলে না, হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। পুষ্প বলে—'আপনি আসুন, অনঙ্গবাবুকে বলবেন, উনি যেন আমায় ভুল না বোঝেন।'

বঙ্কিম চলে যায়। পুষ্প আবার দরজা বন্ধ করে ঘরের চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে ছাখে চারিদিকেই ভুতুর স্মৃতি জড়ানো। ওই তো ঠাকুরের কাছে সেই সোনার মাদুলিটা পড়ে রয়েছে। ভুতু বলে গেছে, বড় হয়ে সে ওই মাদুলি আবার নিয়ে যাবে। সেটা কি আর এ জীবনে সম্ভব? আর কি কখনো ভুতুর দেখা পাবে পুষ্প? আর কি কখনো তার এই ফাঁকা হয়ে যাওয়া বুকটা ভরে উঠবে? ··এ আশা করতেও দুরাশা জাগে পুষ্পর অন্তরে। ধীরে-ধীরে ঘরের এক পাশের দেওয়ালের কাছে গিয়ে পুষ্প একটি টাঙানো ফটো খুলে নিয়ে সযত্নে আঁচল দিয়ে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে থাকে। এ ফটোটা একবার রথের মেলায় ভুতুকে কোলে নিয়ে তুলিয়েছিল পুষ্প। ভুতু এর একটা কপি চেয়েছিল, কিন্তু নতুন মা'র ভয়ে নিয়ে যেতে পারে নি।

দিন গেল, রাত হলো, সারারাত চোখে ঘুম নামলো না পুষ্পর। সারাদিন রাত তার কেটে গেল ভুতুর চিন্তায়।

• • •

গ্রামে ফিরে ভুতুরও সেই অবস্থা। কিছু ভালো লাগে না। সব সময়

পুষ্পর কথা মনে পড়ে। কাছে থাকতে যতটা না হতো গ্রামে এসে যেন টানটা শতগুণ বেড়ে গেছে। বোসেদের সেই শান বাঁধানো পুকুর ঘাটে ভুতু খেলা করছিল নন্দ'র সঙ্গে।

নন্দ বলে—'কলকাতায় অনেক মোটর আছে, না রে?'

ভুতু বলে—'অনেক। এক-একটা আবার দোতলা বাড়ির মতন।'

নন্দ অবাক হয়ে বলে—'ও বাবা—"

ভুতু বলে—'কত রকমের খাবার পাওয়া যায়, ফুলকপির সিঙাড়া, হিঙের কচুরি—'

নন্দ বলে—'হিঙের কচুরি? সে কি রকম খেতে রে?'

ভুতু বলে—'খুব ভালো।'

নন্দ আবার প্রশ্ন করে—'তোর নতুন মা বুঝি কিনে দিতো?'

ভুতু বলে—'না।'—বলে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে-ধীরে নেমে যায় জলের দিকে। নন্দও তার পিছু-পিছু এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—'তা হলে কি করে খেতিস?'

ভুতু তখন পুষ্পর চিন্তায় পূর্ব কথা ভুলে খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, সে নন্দকে পাল্টা প্রশ্ন করে—'কী?'

নন্দ বলে—'এই যে বললি, ফুলকপির সিঙাড়া, হিঙের কচুরি?'

ভুতু বলে—'সে একজন খাওয়াতো।'

নন্দ বলে—'কে?'

ভুতু অন্যমনস্ক হয়ে অসংলগ্ন প্রায় উত্তর দেয়—'সে খুব ভালো'—বলে অন্যমনস্কভাবেই ঢিল কুড়িয়ে-কুড়িয়ে ছুঁড়তে থাকে পুকুরের জলে। স্থির হয়ে থাকা পুকুরের জলে ঢেউ জাগে। ঢিলের পর ঢিলে ঢেউয়ে ভরে যায় পুকুরটা।

* * *

কালের স্রোতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পার হতে-হতে তিরিশটা বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু ভুতু এখনো ভুলতে পারেনি পুষ্পকে। ভুতু এখন কলকাতা কর্পোরেশনের ডাক্তার। কাজের অবসরে প্রায়ই একটা জায়গায় এসে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। সে জায়গা হলো, বাগবাজার অঞ্চলের গঙ্গায় যেখানে শহরের নোংরা জল বয়ে

এনে বিরাট একটা খালে এসে মিশেছে।

আজও ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে উদাসদৃষ্টিতে গঙ্গার জলে নোংরা জলের সংমিশ্রণের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে ছিল ভুতু। তার পাশে বসে ছিল তার সহকর্মী পরেশ দাস। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মাঝে-মাঝে দূরের স্টীমারের ভোঁ আর গঙ্গার জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

পরেশ দাস এক সময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ধ্যানগম্ভীর প্রায় ভুতুকে জিজ্ঞেস করে—

'আচ্ছা ভুতুবাবু—'আপনি প্রায় রোজ এইখানে এসে কি ছাখেন? আর এমনি উদাসভাবে কি ভাবেন?

ভুতু বলে—'এই জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে। ওই যে দেখছেন শহরের কত নোংরা জল, কত আবর্জনা বয়ে এনে ওই খালটা মিলেছে জলে, তাতে কিন্তু গঙ্গার জলটা অপবিত্র হচ্ছে না, নোংরা জলটা গঙ্গাজলে মিশে হয়ে যাচ্ছে পবিত্র গঙ্গার জল। আমি চেয়ে-চেয়ে দেখি, আর ভাবি আমার কৈশোরে পরিচিত একজনের কথা। তার জীবনটা ছিল ওই খালটার মতন অপবিত্র, কিন্তু মনটা ছিল গঙ্গাজলের মতন পবিত্র। তার খারাপ, জঘন্য জীবন-যাত্রাও যেমন ভুলতে পারি না, তেমনি তার পবিত্র মাতৃত্বের কথাও ভোলা যায় না।'

পরেশ বলে—'তিনি আপনার কে?'

'কেউ না, মা বেঁচে থাকলেও বোধহয় তার মতন আপন হতেন না।'

'আপনার বুঝি মা বেঁচে নেই?'

'না, তিনি আমাকে ছুনিয়ার বাস স্টপেজে নামিয়ে দিয়েই অফিস আওয়ারের বাসের মতই চলে গেছেন। তারপর সংমা এলেন, তিনিও চলে গেলেন, তার সঙ্গে বাবাও মহাপ্রস্থানের পথে প্রস্থান করলেন।'

'তা'হলে আপনি একা?'

'না-না, বাবার আগে বাবা তাঁর পুরো কর্ত্তব্যই করে গেছেন—আমার বিয়ে দিয়ে সংসারী করে, ছু'টি সৎভাই আর একটি সৎবোনের ভার আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে চরম বিশ্রাম নিয়েছেন। আমি এখন সেই দায়িত্ব বয়ে চলেছি। ছু'টি ভাইকে পড়াচ্ছি। বোনের বিয়ে দিয়েছি। আমার স্ত্রীর কোলেও একটি চাঁদ এসেছে, সেও মা ষষ্ঠীর কৃপায় বছর

চারেকের হলো।'

'এই বয়সে অনেক কিছুই তা'হলে করতে হয়েছে আপনাকে?'

'হ্যাঁ, তাইতো আর বেশী রিস্ক নিতে পারলাম না। ডাক্তারি পাশ করেই অনেক চেষ্টায় কর্পোরেশনের চাকরিটাই নিয়ে নিলাম।

পরেশ বলে—'বুঝলাম, কিন্তু ভুতুবাবু, যার চিন্তায় আপনি এখানে এসে এমন উদাস হয়ে যান, তার কথা তো শেষ হলো না।'

ভুতু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'সে কথা আর একদিন বলবো, আজ অনেক দেরী হয়ে গেল, চলুন যাওয়া যাক্, ওদিকে আবার একজন অপেক্ষা করে আছেন।'

পরেশ বলে—'কে?'

'গৃহিণী।'—বলে ভুতু হাসে।

পরেশও হাসে। দু'জনে হাসতে-হাসতে চলে যায় যে যার বাড়ির পথে।

ভুতুর বাসায় তখন ভুতুর স্ত্রী রানু খুব ব্যস্ত। তার দেবর দু'টি মাঠে যাবে—তারই আয়োজন করতে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে রানুকে। ঠিক এমনি সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হয়। রানু ব্যস্তভাবে দেবরদের খাবার-দাবার গোছগাছ করতে করতেই বলে—কে?'

বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় উত্তর আসে—'ভুতুবাবু—বাড়ি আছেন?'

রানু বলে—'না, আপনি কে?'

বাইরে থেকে উত্তর আসে—'আমি পুলিশের লোক।'

'পুলিশের লোক।'—চমকে ওঠে রানু।

বাইরে থেকে আবার শোনা যায়—'হ্যাঁ, ভুতুনাথ বাবুর নামে ওয়ারেণ্ট আছে, আমরা তাঁকে য়্যারেষ্ট করতে এসেছি।'

রানু ভয় পেয়ে বলে—'ওয়ারেণ্ট—য়্যারেষ্ট। ও ঠাকুর পো—'

বাইরের লোকটি ধমক দিয়ে বলে—'আরে ঠাকুরপোকে পরে ডাকবেন —আগে দরজা খুলুন।'

ধমক শুনে, ওয়ারেণ্ট-য়্যারেষ্টের কথা শুনে রানু কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে দরজা খুলে দেয়—ভয়ে প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে।

দরজা খুলতেই ভুতু হেসে ওঠে হা-হা করে।

রানু আশ্বস্ত হয়ে বলে—'ওরে দুষ্টু—আবার পুলিশ সাজা হয়েছে'।

ভুতু গম্ভীর ভাবেই বলে—'উপায় কি—ঘরে চোর রয়েছে যে!'

রান্নু বলে—'চোর! কে চোর? কোথায় চোর?'

'এই যে—সম্মুখে দাঁড়ায়ে মোর।'—বলে ভুতু রান্নুর দিকে দু'পা এগিয়ে আসে।

রান্নু বলে—'আমি তোমার কি চুরি করেছি শুনি?' ভুতু যাত্রার দলের এ্যাকটিং করার মতন বলে—'মন চোর, মন চুরি করিয়াছ তুমি, বাহুপাশে করিয়া বন্ধন—হৃদি-কারাগারে তোমা করিব প্রেরণ।' বলে দু'হাত দিয়ে রান্নুকে জড়িয়ে ধরতে যায়। রান্নু দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলে—'আঃ, কি করছ, ঠাকুরপোরা রয়েছে।'

ভুতু অপ্রস্তুত হয়ে বলে—'আগে বলবে তো।'

এমন সময় পাশের ঘর থেকে গাবুর ডাক শোনা যায়। 'বৌদি—বৌদি—'

'যাই—'বলে খুব ব্যস্তভাবে রান্নু পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে। ভুতুও যায় তার পিছু-পিছু। ঘরে ঢুকে ভুতু অবাক হয়ে ছাখে তার সৎভাই দু'টি খুব ব্যস্ত, যেন যুদ্ধে যাবার তোড়জোড় হচ্ছে। রান্নুও তাদের সঙ্গে ব্যস্ত, ওপাশের তাক থেকে বড় একটা কিড্ব্যাগ নিয়ে পাটুকে জিজ্ঞেস করে,—'এইটেতে করে দেবো?'

পাটু বলে—'হ্যাঁ, তবে বেশী কিছু দিও না।'

'সে তোমায় ভাবতে হবে না।'—বলে রান্নু পাশের ঘরে যেতে যায়, ভুতু দরজায় দাঁড়িয়ে।

রান্নু ব্যস্ত হয়ে তাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে—'সরোতো—' বলে পাশের ঘরে চলে যায়।

ভুতু এবার যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে 'সরোতো, সরো তো—বলে সরিয়ে নিয়ে পাটু সাইড্ ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আলমারী থেকে গল্পের বই বের করে সেই ব্যাগে ভরতে থাকে।

ভুতু এবারও যেখানে দাঁড়িয়েছিল, গাবু এসে, সরো তো, সরো তো দাদা'—বলে তাকে সরিয়ে দিয়ে টেবিলের ড্রয়ার টেনে গগ্লসটা বের করে রুমাল দিয়ে সেটা মুছতে থাকে।

ভুতু আবার দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে, রান্নু ভর্তি ব্যাগ্টা হাতে নিয়ে

এঘরে আসতে গিয়ে বাধা পেয়ে বলে—'আঃ, সরো না একটু'—বলে ভুতুকে আবার ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কিড্ ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বলে—'ছ'টো বড় পাঁউরুটি, চারটে ডিম সেদ্ধ, এক ডজন কলা আর বারোটা বড় সন্দেশ দিয়ে দিলাম, আর কিছু দেবো ?'

পাটু বলে—'আরে না-না, খেয়েই তো যাচ্ছি। কাল দুপুরের ব্যাপারটা তো, সে আমি কাল ম্যানেজ করে গোরাকে পাঠিয়ে দেবো।'

রানু বলে—'হ্যাঁ তাই কোরো, আমি পরোটা, তরকারি করে রাখবো।'

ভুতু এতক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে এদের সাজসজ্জা দেখছিল। এতক্ষণে কথা বলার একটু সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করে—'তোমরা কোথায় চললে ব্রাদারস্ ?'

পাটু বলে —'খেলা দেখতে।'

ঘড়ি দেখে অবাক হয়ে ভুতু বলে—'খেলা দেখতে। তা খেলা তো এতক্ষণ হাফ-টাইম পার হয়ে ফুল টাইম হতে চলল।'

গাবু বলে—'খেলাতো আজকে নয়, সে তো পরশু।'

ভুতু আরও অবাক হয়। বলে—'তা আজ থেকে কোন কর্মে যাওয়া হচ্ছে ?'

পাটু ব্যস্তভাবে রেন্ কোট্টা কাঁধে ফেলতে ফেলতে বলে—'আজ থেকে লাইন না দিলে টিকিট পাবো কি করে ? কই বৌদি, হলো ?'

'এই যে ভাই—' বলে ওয়াটার বট্লে জল ভরে হন্তদন্ত হয়ে এনে দেয় পাটুর হাতে।

ভুতু বলে—'টিকিট পাবে না—কাদের খেলা ?'

গাবু বলে—'ওঃ তুমি কিছুই খবর রাখো না দাদা।'

ভুতু বলে—'এসব ব্যাপারে একটু খবর রাখি, তা খেলাটা কাদের ?'

পাটু বলে—'মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের। এই খেলার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে।'

ভুতু হাসি চেপে বলে—'তাই নাকি! সব এই খেলার ওপর নির্ভর করছে ?'

গাবু বলে—'নিশ্চয়, এ একটা মারাত্মক ব্যাপার।'

'ও বাবা, একেবারে মারাত্মক ব্যাপার। তা খাবার-দাবার যা নিয়ে

যাচ্ছ তা তো দেখলাম—টাকা-পয়সা নিয়েছো তো।'

পাটু বলে—'হ্যাঁ, চল্ গাবু; দেরী হয়ে যাচ্ছে।'—বলে ওরা দু'জনে ওয়াটার বট্‌ল, বইয়ের থলে, রেণকোট্, খাবারের ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে যুদ্ধে যাবার ভঙ্গিতে যেই এগিয়ে যেতে যায় ভুতু তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'ভাইয়ের কাঁধে দু'টি হাত রেখে বলে, 'একটা কথা শোনো ব্রাদার, তোমাদের এই খেলা দেখার এনার্জি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি।'

পাটু ও গাবু পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি কতে গর্বের হাসি হাসে।

ভুতু বলে—'এমন এনার্জি কেউ কখনো দেখেছে? খেলা দেখার জন্য এমন প্রস্তুতি, এমন জীবন—মরণ পণ—, বলে ভুতু দু-ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসে, ওরাও দু'ভায়ে ভুতুর কথায় গদ্‌গদ্ হয়ে হাসতে থাকে।

ভুতু বলে—'কিন্তু তোমার এই এনার্জি যদি ওয়ান ফোর্থ মানে চার ভাগের এক ভাগও পড়াশোনায় দাও, তাহ'লে—' বলে ভুতু দেওয়ালের টাঙানো হারাধনের ছবিটাকে দেখিয়ে বলে, 'দিস্ ওল্ড ম্যান্ স্বর্গ থেকেও ধন্য হয়ে যাবে।'—বলে ভুতু আবার দু'ভায়ের মুখের দিকে চায়, ভাখে তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। লজ্জায় দু'জনেই মুখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ভুতু বলে—'যাও তোমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে—আর তোমাদের আটকে রাখবো না। ভবিষ্যতে আমার কথাটা একটু মনে রেখো। যাও-যাও—জয়যুক্ত হয়ে এসো—'বলে ভুতু দু'ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে পাঠিয়ে দেয়।

ওরা চলে যেতেই রানু তার ছোট্ট ছেলে বিশুকে কোলে নিয়ে আসে।

ভুতু তাকে আদর করে বলে—'দাও বিশুবাবুকে দাও।'

রানু বিশুকে ভুতুর কোলে দিয়ে আবার ওঘরে চলে যায়।

ভুতু বিশুকে কোলে নিয়ে আদর করতে থাকে। বলে—'বুঝলে বিশুবাবু, তুমি যখন বড় হবে, তখন যেদিন থেকে লীগ খেলা আরম্ভ হবে—সেদিন থেকে মাঠে তাঁবু খাটিয়ে লাইন দেবে।'

রানু ডিসে করে এক ডিস সিঙাড়া এনে ভুতুর কাছে রাখে। বলে, ঠাকুরপো আজ গরম সিঙাড়া নিয়ে এসেছ খাও।'

ভুতু সিঙ্গাড়া ভেঙ্গে এক টুকরো বিশুর মুখে দিয়ে বলে—'খাও বিশুবাবু।'

রানু তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে সিঙ্গাড়ার টুক্‌রোটা কেড়ে নিতে-নিতে

বলে, 'আরে না—না, দিও না, দিও না। ঠাকুরপো খাইয়েছে। সিঙাড়ায় ওর যা লোভ।'

ভুতু বলে—'হবেই তো, বাপকা বেটা, তুমি জানো—ছোট বেলায় সিঙাড়ায় আমার কি ভয়ঙ্কর লোভ ছিল?'

—'সে গল্প তো বহুবার শুনেছি।' বলে রানু জল আনতে চলে যায়।

ভুতু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সিঙাড়াটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে আপন মনেই বলে—'হ্যাঁ গল্পই বটে।' বলে ভুতু চিন্তা করতে থাকে পুষ্প'র কথা। কত দিনের কথা। তবু যেন ভুতুর মনে হয়—এই তো সেদিন ঘটেছে।

কর্পোরেশনের কাজে তাকে প্রায় কলকাতার অলিতে-গলিতে ঘুরতে হয়। ভুতুর সন্ধানী দৃষ্টি কতো খুঁজেছে পুষ্পকে, কিন্তু কোন দিন তার চোখে পড়ে নি। ভুতুর দৃঢ় ধারণা, সে কখনো সারা জীবন ঐভাবে কদর্য জীবন যাপন করতে পারে না। হয় সে মরে গেছে—নয় সন্ন্যাসিনী হয়ে কোনো তীর্থে-টীর্থে চলে গেছে। তার মতন মহৎ মহিলা—'

—'কি হলো? সিঙাড়া হাতে বসে আছো যে? আবার বুঝি তোমার সেই মায়ের কথা মনে পড়েছে?—খাও-খাও।' বলে রানু জলের গেলাসটাকে পাশের টেবিলে রেখে বিশুকে কোলে নেয়। ভুতু চিন্তা করতেই-করতেই সিঙাড়া খায়।

* * *

ভুতুর ধারণা একেবারে মিথ্যে নয়, তবে সন্ন্যাসিনী হয়ে কোনো তীর্থে যায় নি পুষ্প। কিন্তু ভুতু তাকে ছেড়ে চলে যাবার পরেই পুষ্প সেই কদর্য পল্লীর জঘন্য জীবনযাত্রা ত্যাগ করে পরিচিত লোকের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গিয়ে লোকের বাড়ি-বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। অনঙ্গ দত্ত অনেক অনুসন্ধান করেও এই বৃহত্তর কলকাতার লোকারণ্যের মধ্যে তার দেখা পায়নি কোনোদিন। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাঁচ-বাড়িতে দৌড়ঝাঁপ করে কাজ করার ক্ষমতা কমে গেছে পুষ্পর। তাই আজ কুমোর-টুলির গঙ্গার ধারে একটি মেসে এসে ঝিয়ের কাজে যোগ দিল সে। কিন্তু এখানেই বা কাজের কমতি কোথায়? নানা মনের, নানা ধরণের বোর্ডারদের ফরমাস, বিরাট-বিরাট হাঁড়ি, কড়া, বাসনপত্র মাজা, কাঁড়ি-

কাঁড়ি আনাজ কোটা, চাল ধোওয়া, মসলা পেষা, একদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে পুষ্প। তবু তার এই জায়গাটা কত ভাল লাগে। সামনেই গঙ্গা, দূর থেকে হেঁটে এসে আর গঙ্গাচান করতে হবে না, যখন খুশী পাপে ভরা দেহটাকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে নিতে পারবে।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতেই পুষ্প কলকাতায় বসে চায়ের কাপডিস্ গুলো সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধু'চ্ছিল। কোনো-কোনো বোর্ডার, চৌবাচ্চার জলে স্নান করছিল। এখানকার একজন বোর্ডার বিজয় দাস শুধু রোজ দু'বেলা গঙ্গাস্নান করে। দূর থেকে যাত্রার এ্যাকটিংয়ের মতন স্তোত্র পাঠ করতে-করতে বিজয় এসে মেসে ঢোকে।

রজত গামছা দিয়ে মাথা মুছতে-মুছতে বলে—'আচ্ছা বিজয় বাবু—অতো চিৎকার করে গঙ্গা স্তোত্র পড়ছেন কেন—মা গঙ্গা কি কালা ?'

বিজয় বলে—'হ্যাঁ—কালা।'

কেউ স্নান করতে-করতে বলে—'কি কন্ ?'

বিজয় বলে—'ঠিকই কইছি। মা গঙ্গা কালা না হ'লে আজ তিরিশ বছর ধরে দু'বেলা গঙ্গাস্নান করছি, কোনো ফলই ফলছে না।'

রজত বলে—'তা'হলে ছেড়ে দিন গঙ্গায় চান করা।'

বিজয় বলে—'মাকে ছাড়তে পারছি কই' বলে আবার চিৎকার করে গঙ্গা স্তোত্র পাঠ করতে-করতে দোতলায় উঠে যায়। রজত তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে কেষ্টকে বলে—'ভদ্রলোক ট্রেনে ক্যানভাস্ করে-করে গলাটাকে তৈরী করেছে বটে।'

কেষ্ট বলে—'পিকিউলিয়ার ক্যারেকটার।'

রজত বলে—'আরে দাদা, দুনিয়ার আমরা সবাই পিকিউলিয়ার। তা কেষ্টদা সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছি মাইরি। একবার হাতটা দেখুন তো।'

কেষ্ট চটে গিয়ে বিরক্ত স্বরে বলে—'এ্যাস্ট্রোলজি ছাম্‌ড়াগো খেলা না—তাম্‌সা কইরো না।'

রজত বলে—'না-না, তামাশা করছি না। আপনি ভাল হাত দেখেন—'

কেষ্ট তার কথা শেষ হতে না দিয়েই তেমনি বিরক্ত স্বরেই বলে—'তামাশা না তো কি ? স্নান করতে-করতে ইয়ার্কি মাইরা, হাতখানা বাড়াইয়া কইছেন—হাতটা ত্থাহেন। প্রত্যেক জিনিসির একটা টাইম আছে

তো—কি ভাবেন আপনারা।'—বলে গামছা দিয়ে মাথা ভর্তি টাক্‌টা মুছতে-মুছতে গট্‌গট্‌ করে চলে যায়।

পুষ্প তখন বাসনগুলো ধুয়ে রান্নাঘরে সামনে গুছিয়ে রাখছিল। অনেকক্ষণ থেকে দোতলায় একজন বুড়ো বোর্ডার চাকরের নাম ধরে ডাকছে। জল চাইছে।

ঠাকুর রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে—'ও ঝি, তুমি ওই ওপরের পূর্বদিকের কোণের ঘরের বুড়োটাকে এক গেলাস জল দিয়ে এসে তাড়াতাড়ি আদাটা বেটে দাও তো।'

পুষ্প এক গেলাস জল ঢালে কুঁজো থেকে। পাশে দু'জন বোর্ডার কি বলাবলি করছিল। একজন বলে—'আচ্ছা, ওই অন্ধ বুড়োটা এই মেঝে পড়ে আছে কেন, ওর কি কেউ নেই?'

ঠাকুর বলে—'ওর সব আছে।'

বোর্ডার বলে—'তবে?'

ঠাকুর বলে—'সে আপনারা ছেলে ছোক্‌রা মানুষ বুঝবেন না।' বলে রান্নাঘরে চলে যায়। বোর্ডার দু'জন আবার খবরের কাগজে মন দেয়। পুষ্প এক গেলাস জল নিয়ে যায়। সামনের বারান্দায় একটি বলিষ্ঠ যুবক ওঠ্‌বোস করে ব্যায়াম করছে। পুষ্প তার সামনে দিয়ে যায়। দু'জন বোর্ডার রেসের বই নিয়ে আলোচনা করছে খুব মনোযোগ দিয়ে। পুষ্প তাদের সামনে দিয়ে সিঁড়ির মুখে আসতেই একজন বোর্ডার তর্‌ তর্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, তার গায়ে লেগে পুষ্পর হাতের জলটা পড়ে যায়। লোকটা সরি—বলে চলে যায়। পুষ্প আবার জল আনতে চলে যায়।

একজন বোর্ডার—অনাদি, সিঁড়ির পাশে ছোট রুমটা থেকে খালি গায়ে হাই তুলতে-তুলতে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মেসের চাকর হারুকে খোঁজে। দেখতে না পেয়ে—পাশে দাঁড়িয়ে থামে আয়না ঝুলিয়ে যে বোর্ডারটি দাঁড়ি কামাচ্ছিল, তাকে বলে—আচ্ছা, হারু কোথায় গেল বলুন তো?'

লোকটি মুখে সাবান মাখতে-মাখতে বলে—'ভগবান জানেন।'

অনাদি বিরক্ত হয়ে বলে—'হারুর গতিবিধি ভগবানও জানেন না।'

—'এই যে, হারু এসে গেছে।'—বলতে-বলতে হারু আসে। তার

হাতে সিগারেট, বিড়ি, পান, খুরিতে মিষ্টি।

অনাদি বলে—'এই যে হারু, কোথায় থাকিস?'

হারু বলে—'কোথায় থাকি না তাই বলুন। মেসের চাকরের চেয়ে মন্ত্রীর কাজ ঢের সোজা, এই দেখুন না—বিনয়বাবুর সিগ্রেট, বরেনবাবুর বিড়ি, পিণ্ডিবাবুর—'

অনাদি তাকে থামিয়ে—'পিণ্ডিবাবু নয়—পুণ্ডরীকাক্ষ।'

হারু বলে—'হ্যাঁ, ওই পুণ্ডবাবুর পান, কল্যাণবাবুর রসগোল্লা, আর ঠাকুরের দোক্তা।

অনাদি বলে—'থাক, তোমাকে আর ফিরিস্তি দিতে হবে না। আমার কুঁজোটা ভরিস্‌নি কেন, জানিস, সকালে উঠে এক গেলাস জল না হ'লে আমার চলে না।' চিৎকার করে বকতে থাকে হারুকে। এমন সময় পুষ্প তাদের সামনে দিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছিল!

হারু বলে—'এই ঝি তুমি কার জন্যে জল নিয়ে যাচ্ছো।'

পুষ্প বলে—'ওপরের এই কোণের ঘরের বাবুর জন্যে।'

—'এই বাবুকে আগে দাও'—বলে একরকম জলের গেলাসটা কেড়ে নিয়ে অনাদির হাতে দেয় হারু। অনাদি এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে গেলাসটা ফিরিয়ে দেয় পুষ্পর হাতে। পুষ্প আবার জল আনতে যায়। এবার জল নিয়ে যেতে নীচের তলায় আর কোনো বাধা পায় না পুষ্প, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়।

ওপরের বারান্দায় তখন রজত আর কেষ্টতে তর্ক বেঁধেছে।

কেষ্ট বলছে—'ঘটিরা খাওনের জানে কি? আমাগোর ইলিশমাছের ভাজা খাইছেন? কই মাছের পুতুরি?'

রজত বলে—'ওই পাতুরি কি খোলামকুচি জানি না, আমাদের পোস্তর তরকারি, কলাইয়ের ডাল আর মাছের টক্ খেলে আপনার টাকে চুল গজিয়ে যাবে।'

'ইঃ'—বলে কেষ্ট নীচে নেমে যায়। রজত যায় তার পিছু-পিছু।

পুষ্প তাদের পাশ দিয়ে জলের গেলাসটা নিয়ে পূব দিকের কোণের ঘরে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা ঘর থেকে একজন বোর্ডার শিবব্রতবাবু একটা কেটলি হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে সামনে পুষ্পকে জল নিয়ে যেতে দেখে

বলে—'জলটা দাও তো।'

পুষ্প বলে—'ওই কোণের ঘরে বাবু অনেকক্ষণ থেকে জল চাইছেন।' —বলে একরকম পুষ্প'র হাত থেকে জলটা কেটলিতে ঢেলে তাড়াতাড়ি শিবব্রত ঘরে ঢুকে যায়। পুষ্প আবার খালি গেলাসটা নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে যায়। নীচের বারান্দা দিয়ে পুষ্প এগিয়ে যেতে গিয়ে কাকে দেখে থমকে থামে। ছাখে অনঙ্গবাবু আর এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। পুষ্প নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না, আজ এতদিন পরে এই ভাবে এখানে যে অনঙ্গবাবুর সঙ্গে দেখা হবে, ভাবেই নি পুষ্প।

অনঙ্গও দেখতে পান পুষ্পকে। দু'জনেই কিছুক্ষণ দু'জনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কারোর মুখেই কোনো কথা নেই।

পুষ্প-ধীরে ধীরে অনঙ্গ'র কাছে দু'পা এগিয়ে এসে বলে—আপনি ?'

অনঙ্গ বলেন—'সে প্রশ্ন তো আমিও তোমায় করতে চাই—তুমি এখানে ?'

পুষ্প বলে—'আমি এখানে ঝিয়ের কাজ নিয়েছি।'

অনঙ্গ বলেন—'ও, স্ট্রেঞ্জ্। আমি এখানে আসি—আমার এক শেয়ার মার্কেটের বন্ধু এখানে থাকে।'

পুষ্প বলে—'আপনি ভাল আছেন তো ?'

অনঙ্গ বলেন—'দেখে কি মনে হচ্ছে ?'

—'ভাল।'—জল আনতে চলে যায়। অনঙ্গ অন্যমনস্ক হয়ে যান।

অনঙ্গবাবুর বন্ধু সুধাংশু বলে—'তুমি এই ঝি-টাকে চেনো নাকি ?'

অনঙ্গ'র অন্যমনস্কতার জন্যে সুধাংশুর কথা তার কানে যায় না। উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি যেন চিন্তা করছেন।

সুধাংশু আবার বলে—'তোমার বাসায় ছিল বুঝি ?

অনঙ্গবাবু অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দেন—'ছিল—না, এখনো আছে।'

সুধাংশু বলে—'এসব তুমি কি বলছ—তোমার হল কি ?'

অনঙ্গ চমক ভেঙে বলেন—'উ—কি বলছ তুমি ?'

সুধাংশু বলে—'আমি বলছি তুমি কি ঝিটাকে চিনো ?'

অনঙ্গর উদাসীনতা এখনো কাটে নি, সেইভাবেই উত্তর দেন, 'না—না। ও পুষ্প—ঝি নয়। এখন যেমন এখানকার সকলের এঁটো-বাসন ছাই পাঁশ

দিয়ে মেজে পরিষ্কার করে দিচ্ছে, তেমনি ও আমার অনেক নোংরা পরিষ্কার করে দিয়েছে।'

সুধাংশু বলে—'কিছু লাটঘাট ছিল নাকি ?'

অনঙ্গ এবার সুধাংশুর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন—'দ্যাখো সুধাংশু, তুমি হচ্ছো শেয়ার মার্কেটের দালাল। যারা জীবনে কোন শেয়ারই নিতে চায় না, তাদের তুমি বুঝবে না। তাদের করুণা করতে বলছি না তাই বলে—তবে বিদ্রূপ করো না।'

এমন সময় সামনের ঘর থেকে বিনয় হাতে রিষ্টওয়াচ বাঁধতে-বাঁধতে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে বলে—'চল ভাই—চল, আমার একটু দেরী হয়ে গেল।'

ওরা চলে যায়। পুষ্প এক গেলাস জল নিয়ে আবার ওপরে যায়।

দোতলার বারান্দা পার হয়ে পূর্বদিকে কোণের ঘরে জল নিয়ে যায়।

ঘরের ভেতর অন্ধ, রুগ্ন, বৃদ্ধ ধরণী কাতরাচ্ছে আর বলছে—'সবাই কি মরে গেছে ? এক গেলাস জল কি কেউ দিতে পারে না ?'

বিজয়—ক্যানভাসার এই ঘরের একটা সিটে থাকে। সে তখন তার স্যুটকেসে পারফিউমারী জিনিসপত্র গোছাচ্ছে।

পুষ্প জল নিয়ে এসে ঘরে ঢুকে ধরণীকে দেখেই থম্‌কে থাকে। এ কি ! এ যে তার স্বামী। কি অবস্থা হয়েছে ওর। শরীরটা যেন বিছানায় মিশে গেছে, চোখে দেখতে পায় না। পুষ্প চিত্রার্পিতের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। বিজয় তাকে বলে—'হারু কোথায় ?'

পুষ্প বলে—'জানি না।'

বিজয় স্যুট্‌কেস গুছিয়ে জামা পড়তে-পড়তে বলে, 'তুমি একে একটু দেখো, উনি অন্ধ। আমি যাচ্ছি ধরণীবাবু, এটি এখানকার নতুন ঝি—আপনার জন্য জল এসেছে। আমাকে আবার ৮টা ১০-এর রাণাঘাট লোকাল ধরতে হবে। দেরী হয়ে গেল ?'—বলে বিজয় স্যুটকেস নিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যায়।

পুষ্প জল নিয়ে ধরণীর কাছে গিয়ে কম্পিত প্রায় কণ্ঠে বলে—'জল।'

—'কে ?'—বলে ধরণী প্রায় চম্‌কে ওঠে।

পুষ্প বলে—'আমি এখানকার নতুন ঝি।'

—'ও'—বলে ধরণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে-বলে—'হারু কোথায় ?'

পুষ্প বলে—'জানি না।'

ধরণী অতিকষ্টে মাথা তুলতে-তুলতে বলে—'তখন থেকে এক গেলাস জল চাচ্ছি—আমি যে, অন্ধ তাই নিজে-নিজে নিতে পাড়ি না—'

পুষ্প বলে—'এই যে জল এনেছি।

—'দাও'—বলে কম্পিত হাতে জলের গেলাসটা নিয়ে চক্‌চক্‌ করে জলটা খায়।

পুষ্প'র মনটা পিছিয়ে যায় বহুদিন আগের সেই শ্বশুর বাড়ির চিন্তায়, কত সুখের স্বপ্নই না সেখানে দেখেছিল পুষ্প। স্বামী-পুত্র-সংসার।

একটা টিয়া পাখী পুষেছিল পুষ্প, একদিন সকালে টিয়াকে ছোলা ভিজে দিচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ তার আর দশ বছরের দেবর বাইরে থেকে ছুটতে-ছুটতে এসে বলে—'বৌদি—বৌদি—'

পুষ্প বলে, 'কি রে বিজু?'

বিজু হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে, 'দাদা আবার বিয়ে করেছে, বউ নিয়ে এসেছে।'

পুষ্প চম্‌কে ওঠে বলে—'কই?'

দেবর বলে—'ওই যে—'

পুষ্প ঘুরে ছাখে—প্রৌঢ় ধরণী, একটি বউকে নিয়ে সদর দরজা পার হয়ে উঠোনের দিকে এগিয়ে আসছে।

পুষ্প সেদিকে তাকিয়ে কাঠের পুতুলের মতন নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ধরণী নতুন বউটিকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্প'র কাছে এসে বলে—'পুষ্প—একে সতীনের মতন না দেখে ছোট বোন মনে করবে, যা চাইবে—তাই দেবে।'

পুষ্প বলে, 'আমাকে না বলে তুমি ওকে বিয়ে করে নিয়ে এল?'

ধরণী বলে—'তোমাকে বলার কোন প্রয়োজন মনে করি নি'—বলে বউকে নিয়ে মধ্যে চলে যায়।

পুষ্প উদাসীন ভাবে বিগত দিনের এই সব কথাই ভাবছিল। ধরণীর কথায় তার চমক ভাঙ্গে।

ধরণী বলছে, 'কি হলো গেলাসটা নাও, কোথায় গেলে?'

পুষ্প ধীরে-ধীরে হাত বাড়িয়ে নীরবে গেলাসটা নেয়।

ধরণী আবার অতি কষ্টে শুয়ে পড়ে বলে, 'একবার হারুকে পাঠিয়ে দিও

তো, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

—'আচ্ছা'—বলে পুষ্প ধরণীর চাদরটা ভালো করে ঢেকে চলে যায়।

* * *

ধরণী যে স্বামী, একথা পুষ্প কাউকেই জানতে দেয় নি। শুধু সুযোগ পেলেই ধরণীর সেবা করে। ধরণীকেও জানতে দেয় না যে সে তার স্ত্রী।

ক'দিনের মধ্যেই ধরণীর অসুখ খুব বেড়ে গেল। আজ সকাল থেকেই পুষ্পর মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে। তবুও নীরবে নিত্যকার কাজ করে যাচ্ছে যাচ্ছে সে। কলতলা থেকে এক ঝুড়ি আনাজ ধুয়ে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল। একজন বোর্ডার নীচে থেকে একটা জামা তুলে নিয়ে মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে পুষ্পকে বলে—'তুমি এখানে কি জন্যে আছো? জামাটা পড়ে গেছে তুলতে পারো নি?'

পুষ্প ধীরস্বরে বলে, 'আমাকে তো বলেন নি বাবু।'

—'বলবে আবার কি? তুমি কি এখানকার পাটরাণী না কি যে, তোমাকে সব ব'লে ব'লে করাতে হবে। চোখ নেই, দেখতে পাও না?'

বলতে-বলতে ঠাকুর এগিয়ে আসে।

পুষ্প মাথা নামিয়ে নীরবে অপামানজনক কথা শুনছিল, হঠাৎ কার জুতোর শব্দে ঘুরে তাকিয়ে ছাখে, এ-পাড়ার একজন বড় ডাক্তার গট্ গট্ ক'রে দাওয়ায় উঠে জিজ্ঞেস করে—'আচ্ছ, ধরণীবাবুর ঘর কোন্‌টা?

ঠাকুর বলে—'ওই ওপরের পুবদিকের কোণের ঘরটা।'

ডাক্তার আর কিছু না বলে উপরে উঠে যায়। পুষ্প তাড়াতাড়ি আনাজের ঝুড়িটা রেখে ওপরে যেতে যায়। ঠাকুর কর্কশ কণ্ঠে বলে, আবার কোথায় যাও? খপ করে চালগুলো ধুয়ে দিয়ে যাও।'

পুষ্প করুণ স্বরে মিনতি করে বলে, 'আসছি বাবা।'

বলে ব্যস্তভাবে ওপরে যায়। ঠাকুর গজ্-গজ্ করতে থাকে।

পুষ্প ধরণীর ঘরে ঢুকে ছাখে, বেহুঁস্ হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তার খুব গম্ভীরভাবে পরীক্ষা করছেন। পরীক্ষা করে ডাক্তার আরো বেশী গম্ভীর হয়ে যায়। বিজয় প্রেসক্রিপশন লিখবার কাগজ কলম এগিয়ে দিতে-দিতে বলে—'কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু?'

ডাক্তার আমতা-আমতা করে বলে, 'দেখে ঠিক বুঝতে পারছি না, এই

ওষুধটা খাওয়ান—দেখি কি হয়'—ব'লে প্রেসক্রিপশন লিখতে থাকে।

বিজয় বলে—'কি খাবে?'

ডাক্তার প্রেস্‌ক্রিপশন লিখতে-লিখতে বলে—'হরলিক্‌স্‌ দিন একটু।'

বলে প্রেসক্রিপশনটা বিজয়ের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বিজয় ইতঃস্তত ক'রে বলে, 'আপনার ফিস্‌—'

ডাক্তার তার কথা শেষ হবার আগেই বলে, 'আট টাকা।'

বিজয় এ পকেট ও পকেট হাত্‌ড়ে চারটাকা বের করে বলে—'মুস্কিল হয়েছে, ওর তো টাককড়ি কোথায় আছে জানি না, অথচ ওর অবস্থা দেখে আপনাকে না ডেকেও পারলাম না। এখন এই চার টাকা—

পুষ্প বলে, 'আমি দেবো?'

ডাক্তার ও বিজয় পুষ্পর দিকে তাকায়।

পুষ্প বলে 'আমার কাছে আছে। আমি টাকা এনে দিচ্ছি।'

—ব'লে তাড়াতাড়ি পুষ্প চলে যায়।

ডাক্তার চুপিচুপি বিজয়কে বলে, 'রোগীর অবস্থা খুব ভালো বুঝছি না, আপনি ওর আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেবার ব্যবস্থা করান।'

বিজয় বলে, 'কাকে আর খবর দেবো?'

ডাক্তার বলে, 'কেন, ওর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে কেউ নেই?'

বিজয় বলে, 'থাকবে না কেন? শুনেছি, হি হ্যাজ টু ওয়াইভ্‌স্‌।

ডাক্তার বলে, 'তাই নাকি! তাহ'লে তাদেরই খবর দিন।'

বিজয় বলে, "তারা কি আছে। শুনেছি—একটা বউকে নিজেই মেরে তাড়িয়েছে আর একটা বউ সুইসাইড্‌ করেছে। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মামলা হচ্ছে, তারই তদ্বির করতে এখানে পড়ে আছে।'

এমন সময় পুষ্প এসে বিজয়কে দশটা টাকা দেয়। বিজয় তার থেকে চারটাকা নিয়ে আর নিজের চার টাকা দিয়ে ডাক্তারকে ফিস্‌ দেয়।

—'ওষুধটা আনিয়ে নেন্‌ তাড়াতাড়ি—'বলে ডাক্তার চলে যায়।

বিজয় বাকি টাকা পুষ্পকে ফেরত দিতে যায়।

পুষ্প বলে, 'ওই টাকা দিয়ে ওষুধটা আনিয়ে নেন।'

বিজয় বলে—'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তুমি এক কাজ কর, আমার ওই স্টোভে হরলিকস্‌টা করে খাইয়ে দাও। আমি তো রাণাঘাট বনগাঁ-

লোকালটা মিস্ করলাম। আমিই ওষুধটা নিয়ে আসছি। বলে প্রেসক্রিপশন নিয়ে বিজয় চলে যায়। পুষ্প স্টোভ জ্বেলে হরলিক্সের জল ছড়ায়। তাকিয়ে ছ্যাখে ধরণী তেমনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। আজ কত অসহায় ধরণী। ভগবান আজ অদ্ভুত যোগাযোগ করে দিয়েছেন, তবুও তো ওর শেষ সময়ে পুষ্প একটু সেবা করতে পারছে।

মনে পড়ে পুষ্প'র, এই ধরণী কি না অত্যাচার করেছে তার ওপরে। যেদিন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ধরণী,সেদিনের দৃশ্য যেন পুষ্প'র চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ধরণী পুষ্পকে ঘাড় ধরে মারতে-মারতে ঘর থেকে ঠেলে বের করে নিয়ে আস। সতীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে।

পুষ্প কাঁদতে-কাঁদতে বলে—'তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছো?'

ধরণী বলে, 'হ্যাঁ দিচ্ছি, বেরিয়ে যা, বেড়িয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।'

বলে ধাক্কা দেয় পুষ্পকে। পুষ্প টাল সামলে দাওয়ার খুঁটিটাকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বলে, 'না-না, আমি যাব না। এ ভিটে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না।'

'তবে রে হতচ্ছাড়ি, এত মার খেয়েও তোর সাধ মেটে নি?' বলে ধরণী একটা চেলাকাঠ নিয়ে এসে বলে, 'বেরিয়ে যা আঁটকুড়ি আমার বাড়ি থেকে, নইলে তোকে মেরে শেষ করে ফেলবো।'

পুষ্প খুঁটিটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরে বলে, 'তাই কর, তুমি যত খুশি আমাকে মার, মেরে আমাকে খুন করে ফ্যালো। তবু তোমার ভিটে ছেড়ে আমাকে যেতে বলো না। আমি তোমার দু'টি পায়ে পড়ছি।' বলে পুষ্প উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ধরণীর পায়ে। ধরণী তবুও মানে না, চেলা-কাঠটা দিয়ে মারতে-মারতে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

এইসব কথাই তন্ময় হয়ে ভাবছিল পুষ্প। স্টোভের জলটা উপচে পড়ে শব্দ হতেই পুষ্পর সম্বিত ফিরে আসে। তাড়াতাড়ি জলটা নামিয়ে নেয়। ফিরে ছ্যাখে ধরণীর মাথাটা বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়েছে। পুষ্প ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে সযত্নে ধরণীর মাথাটা তুলে বালিশে দিয়ে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে থাকে।

ভুতুরা যে পাড়ায় ছোটবেলায় থাকত, সেই পাড়ার রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। বড় রাস্তার পাশেই তাদের সেই স্কুল। এখন স্কুলটা আরও বড় হয়েছে

তার মনে পড়ে। মনে পড়ে সহপাঠী বন্ধুদের কথা। ভুতু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে যায় পার্কের দিকে।

পার্কের সেই বাঁধানো ঘাটের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ঘাটের সেই শান-বাঁধানো রোয়াকটার পাশে থামে। এইখানে সে ছোটবেলায় আচারের জার ভাঙ্গার জন্যে নতুন মা'র কাছে মার খেয়ে অভুক্ত অবস্থায় ভুতু বসে-বসে কতই না কেঁদেছিল। পুষ্প সেদিন কত স্নেহে, কত যত্নে তাকে প্রসাদ খাইয়েছিল, সেইদিন থেকেই তো পুষ্পর সঙ্গে তার প্রাণের যোগাযোগ শুরু। ভুতু রোয়াকটায় বসে এইসব কথাই ভাবছিল। কতক্ষণ যে এখানে বসেছিল, তার হিসাব নেই। তারপর এক সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে কথা চিন্তা করতে-করতে এগিয়ে যায়, তাদের সেই বাসার সামনে দিয়ে। বাসার [illegible]

বুড়ো হয়ে গেছেন মদনবাবু।

ভাড়াটে ভদ্রলোক ভাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

মদনবাবু এদিকে ফিরতেই দ্যাখেন ভুতু দাঁড়িয়ে। মদন তাকে চিনতে পারেন না। বলেন, 'কাকে চাই?'

ভুতু বলে—'কাউকে চাই না, মানে আমরা বহুদিন আগে এই বাড়িতে ভাড়া ছিলাম।'

মদন বলেন—'তাই না কি?' বলে ভুতুকে চেনবার চেষ্টা করেন।

ভুতু বলে—'আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না, তখন আমি খুব ছোট্ট ছিলাম। আপনাকে অবশ্য আমি চিনতে পারছি। আমার বাবার নাম হারাধন মুখার্জি।'

মদন বলেন—'আরে ইউ আর সন অফ্ হারাধন মুখার্জি। হারাধনবাবু কেমন আছেন?'

ভুতু বলে—'বাবা অনেকদিন হলো মারা গেছেন।'

মদন বলেন—'আ-হা-হা, ভেরি সরি, হারাধনবাবু খুব ভাল লোক ছিলেন। আজকাল হারাধনবাবুদের মতন মানুষ রেয়ার হয়ে যাচ্ছে। তা কি করা হয় বাবা?'

ভুতু বলে, 'কর্পোরেশনের হেলথ ডিপার্টমেণ্টে রয়েছি। চলি নমস্কার।' বলে ভুতু এগিয়ে যায় পুষ্পদের বাড়ির দিকে।

একটুখানি এগিয়ে গিয়েই থমকে থাকে ভুতু। একি! সে বাড়ি তো এখন নেই। তার বদলে বড় আধুনিক ডিজাইনের ফ্ল্যাট বাড়ি হয়ে গেছে।

ভুতু ধীরে-ধীরে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ছাখে, বাড়ির ভেতরে যাবার সেই ছোট্ট দরজাটার বদলে ছ'পাশের থামে লাইট সেট করা। সুন্দর গেট। পুষ্প যে ঘরটায় থাকতো, সেই ঘরটার জায়গায় অন্য ঘর হয়েছে। এক কথায় বাড়িটাকে আর চেনা যায় না। পুষ্পর ঘরের জায়গায় সে ঘরটা তৈরী হয়েছে।

ভুতু দেখে তার দরজা-জানালা সব বন্ধ। দেওয়ালের গায়ে কি একটা লেখা পিচবোর্ড ঝুলছে। ভুতু এগিয়ে গিয়ে ছাখে—তাতে লেখা 'ফ্ল্যাট টু লেট।'

ভুতু এদিক-ওদিক তাকায়। কাউকে দেখতে না পেয়ে ওদিকে যায়। সেই পানের দোকানটা প্রায় তেমনি আছে। শুধু পানের দোকানের সঙ্গে কিছু স্টেশনারী জিনিস বেড়েছে, আর দোকানটাও একটুখানি বড় হয়েছে, দোকানের সেই হিন্দুস্থানী মালিককে দেখে ভুতু চিনতে পারে। তার কাছে গিয়ে ভুতু প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, এখানে পুষ্প, বীণা, ঝর্ণা বলে যারা থাকতো তারা এখন কোথায় গেছে জানো?'

হিন্দুস্থানী পানওয়ালা বলে, 'তারা তো বহুত দিন হলো চলিয়ে গেছে। ঝর্ণাদি শুনছি বেরিয়ে গেছে।'

ভুতু বলে 'ও, তা এ-বাড়ি তো ভাড়া দেবে দেখছি। কার সঙ্গে কথা বলতে হবে?

পানওয়ালা বলে, 'ভেতরে যান দারোয়ান আছে, সে সব বুঝিয়ে দিবে।'

ভুতু আর কিছু না বলে ধীরে-ধীরে বাড়ির গেট পার হয়ে এগিয়ে যায়। ছাখে উঠোনের পাশে তার লাগানো শিউলি চারাটা এখন বড় হয়েছে। গাছ ভর্তি ফুল ফুটেছে। ভুতু ধীরে-ধীরে এসে সেই শিউলিগাছটার

তলায় দাঁড়ায়। কত কথা মনে পড়ে, পুষ্পর অকৃপণ মাতৃস্নেহ, যা একদিন ভুতুর স্নেহ বুভুক্ষত অন্তরে মন্দাকিনীর পবিত্র ধারা বইয়ে দিয়েছিল, তার কথা ভাবতে-ভাবতে ভুতু পাথরের মূর্তির মতন নীরব, নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার কানে যেন বাজতে থাকে সেইসব দিনের পুষ্পর কত স্নেহসিক্ত কথা। যেদিন এই শিউলির চারাটা এনে এখানে পুঁতেছিল ভুতু, পুষ্প এসে বলেছিল, 'শিউলির চারায় কি হবে?'

ভুতু বলেছিল, 'খুব বড় হবে, গাছ ভর্তি ফুল হবে।'

পুষ্প বলেছিল. 'সে ফুল দিয়ে কি হবে?'

ভুতু বলেছিল, 'তোমার পুজোয় লাগবে।'

এইসব কথা ভাবছিল ভুতু, তার চোখ ছ'টো জল্‌ছল্ করে ওঠে। পুষ্প আজ কোথায়? কি অবস্থায় আছে, জানে না ভুতু। তার লাগানো শিউলি গাছে আজ অজস্র ফুল, সে ফুল কি কোনোদিন পুষ্পর পুজোয় লেগেছিল?

অনঙ্গবাবু বলেছিলেন—'এ গাছে অনেক ফুল হবে, শিউলি ফুলের গন্ধে এ পাড়াটা সন্ধ্যেবেলা মত্ত হয়ে থাকবে।'

তাঁর সে কথা আজ ফলেছে। গাছ ভর্তি শিউলি ফুল, সুন্দর গন্ধে চারদিক ভরে উঠেছে। কিন্তু এ সৌন্দর্য, এ গন্ধ যারা উপভোগ করলে ভুতু সুখী হতো তারা আজ কোথায়?

শিউলি গাছটাও যেন ভুতুকে দেখে থমকে গেছে। একটি পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ভুতুর মতন। গাছটিও অনড়, ভুতুও অনড়। শুধু দু-চারটি শিউলিফুল ঝরে পড়ছে ভুতুর মাথায়, গাছটা যেন ঋণ শোধ করছে ভুতুর।

* * *

পুষ্প মেসের চৌবাচ্চাটার পাশে বসে বিরাট একটা রুইমাছ কাটছিল। সেই মাছটা কাটতে যাবে, এমন সময় একজন বোর্ডার ওপর থেকে নেমে এসে ঠাকুরকে বলে—'ঠাকুর, ধরণীবাবু মারা গেলেন।'

এই কথা শুনে মাছ শুদ্ধ পুষ্পর হাতটা বঁটিতে থেমে যায়। সেই সঙ্গে পুষ্পও পাথরের মতন স্থির হয়ে উদাসভাবে চেয়ে থাকে।

সময় মতন বোর্ডারদের সাহায্যে চাঁদা তুলে ধরণীর মৃতদেহ সৎকারের

ব্যবস্থা হলো। পুষ্প কিন্তু এখনও কাউকে জানতে দিল না যে, ধরণীবাবু তার স্বামী। শুধু সবার অগোচরে গঙ্গায় গিয়ে শাঁখা ভেঙে, সিন্দুর মুছে গঙ্গাস্নান করে এলো। তখন আর মেসের কারুর কাছে গোপন থাকলো না। পুষ্পর কাছে আদ্যপান্ত ঘটনা শুনে তাদের এই শেষ বয়সে এই রকম অদ্ভুত যোগাযোগের কথা শুনে সবাই অবাক হলো। ঈশ্বর বিশ্বাসীরা বলল, 'সবই তাঁর ইচ্ছে।'

পুষ্প আবার সব ভুলে নিজের কাজ করে চলেছে। শুধু ভুতুর কথা মনে হলেই তার বুকটা টন্‌টন্ করতে থাকে। মাঝে-মাঝে সবার অলক্ষ্যে ভুতুকে কোলে নিয়ে তোলানো ছবিটা বুকে নিয়ে কাঁদে। সেই সোনার মাদুলিটা বের করে কপালে ঠেকিয়ে আবার সযত্নে তার সুটকেশে রেখে দেয়। ভুতু তাকে যাবার আগে বলে গেছে 'বড় হয়ে আমি তোমার মাদুলি ঠিক নিয়ে যাব।' পুষ্প অবশ্য সে আশা করে নি কোনদিন, আজও করে না। তবুও মাদুলিটাকে সে নষ্ট হতে দেয় নি। মাঝে-মাঝে গঙ্গাজলেও ডুবিয়ে নিয়ে আসে মাদুলিটাকে। যাতে কোনো রকম অপবিত্র হয়ে না পড়ে। তার দৈব ক্ষমতা নষ্ট না হয়ে যায়।

আজ সকালেই গঙ্গাস্নান করার সময় মাদুলিটা গঙ্গাজলে ডুবিয়ে ভুতুর কথাই ভাবছিল পুষ্প। ঘাট থেকে স্নান করে উঠে আসার সময় পাশের শ্মশানটা মনে পড়িয়ে দিল ধরণীর কথা। এই শ্মশানেই শেষকৃত্য সমাধা হয়েছে ধরণীর। তার হয়তো এতো পাপের মধ্যেও কিছু পুণ্য ছিলো, তাই গঙ্গা পেয়েছে। শেষ জীবনের ক'টা দিন সেবাও পেয়েছিল পুষ্পর। পুষ্পর গ্লানিময় জীবনের খানিকটা পাপ হয়তো ধুয়ে গেছে শেষ সময় স্বামীসেবার সুযোগ পেয়ে।

'বলহরি—হরিবোল।' শব্দে পুষ্প ঘুরে তাকায়, ভাখে ১০-১২ বছরের একটি মৃত ছেলেকে শবাধারে শুইয়ে কতকগুলি লোক শশ্মানে এনে নামালো। পুষ্প চমকে ভাখে ছেলেটি ঠিক ভুতুর মতন দেখতে। পুষ্প চোখ ফেরাতে পারে না মৃত ছেলেটির দিক থেকে। ভুতু ঠিক এমনি দেখতে ছিল। এখন সে কতবড় হয়েছে। হয়তো বিয়ে থা করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে, গ্রামের সেই সুন্দর পরিবেশে হয়তো সুন্দর সংসার জীবন যাপন করছে ভুতু। পুষ্পর কথা হয়তো ভুলেই গেছে।

সেইটেই স্বাভাবিক। সময়ের ধর্মই এই, পিতৃ-মাতৃ শোককেও সময়ের ব্যবধান ভুলিয়ে দেয়। পুষ্প দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেসে ফেরে। সেই বাবুদের তিরস্কার, বোর্ডারদের গঞ্জনা, আবার তাকে ভুলিয়ে দেয় সব চিন্তা।

আজ শারদীয়া ষষ্ঠী। ভুতু সপরিবারে ক'দিন হলো উঠে এসেছে পুষ্পদের বাড়ির সেই ফ্ল্যাটটায়। রাণুর ধারণা ছিল তার রুগ্ন ছেলে—হয়তো বাসা-বদল করলে শরীরটা সুস্থ হবে। কিন্তু এ বাসাতে এসেও আবার জ্বর হলো বিশুর। ক'দিনের মধ্যেই ডাক্তার ঘোষ তাকে সারিয়ে তুললেন।

ভুতু বিশুকে কোলে নিয়ে তার লাগানো শিউলি গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে ছিল, শরতের সকালের রোদে গাছটা যেন ঝল্‌মল্‌ করছিল, গাছের তলায় অজস্র শিউলি ফুল ঝরে পড়ে যেন বিছানা বিছিয়ে দিয়েছে। বিশু কোল থেকে নামবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছিল—এই ফুলের বিছানা দেখে। ভুতু তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতেই বিশু খুব খুশী। দু'হাতে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ফুলগুলো নিয়ে খেলতে লাগলো বিশু। রাণু বিশুর নতুন জামা-প্যান্ট নিয়ে পাশের ঘর থেকে এঘরে এসে ভুতু এবং বিশুকে দেখতে না পেয়ে জানালায় এসে দাঁড়িয়ে ছাখে ভুতু আর বিশু শিউলি ফুল নিয়ে খেলে চলেছে। যেন বিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে গেছে ভুতু। ফুল নিয়ে শিশুর মতই খেলছে সে বিশুর সঙ্গে।

রাণু জানালা থেকে বলে—'এই সবে মাত্র ছেলেটার জ্বর ছেড়েছে কি করছ, ঠাণ্ডার মধ্যে। নিয়ে এসো, ওকে জামা পরিয়ে দিই।'

ভুতুর হাতে একমুঠো ফুল, বিশুর দু'হাতে শিউলিফুল, ওরা আসে রাণুর কাছে। ভুতু হাতের ফুলগুলো রাণুর মাথায় ছড়িয়ে দেয়। বিশুও তার দেখাদেখি হাতের ফুলগুলো ছুঁড়ে দেয় রাণুর দিকে। ভুতু আর রাণু হেসে ছাখে—বিশুর হাতের ফুলগুলো ওদের দু'জনের পায়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

রাণু বিশুর হাত মুখ মুছিয়ে নতুন জামা-প্যান্ট পরাতে পরাতে বলে—হ্যাঁগো, আজ তো খোকার জ্বর নেই, ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞেস করে এসো—ভাত দেবো কিনা।'

ভুতু বলে—'পাটু গেল কোথায়?'

রাণু বলে—'ঠাকুর পো গেছে হাওড়া স্টেশনে, ঠাকুরঝিকে আনতে।'

ভুতু বলে—'ও—হ্যাঁ, ঠিক তো লক্ষ্মী আসছে। ছাখো লক্ষ্মীর জন্যে ইলিশমাছ এনেছি—ও খুব ভালবাসে মুড়োটা দিয়ে চচ্চড়ি করে দিও। গেবো, গেবো গেল কোথায়'?

রাণু বলে—'ছোট্‌ঠাকুরপো গেছে পুজো প্যাণ্ডেলে। ওদের ঠাকুর আনতে যাবার তোড়জোড় হচ্ছে। তুমিই যাও না ডাক্তারবাবু কাছে'।

ভুতু বলে—'অগত্যা'—বলে যেতে যায়।

রাণু বলে—'আর শোনো, আজ তো ষষ্ঠী, তুমি বলছিলে, এ পাড়ার মা-ষষ্ঠী, খুব জাগ্রত। আমাকে নিয়ে চল না—একটা মাদুলি নিয়ে আসবো।'

ভুতু অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবে। এই মাটিতে দাঁড়িয়ে সে পুষ্পকে কথা দিয়েছিল বড় হয়ে সে তার দেওয়া মাদুলি নিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় আজ পুষ্প আর কোথায় তার মাদুলি।

রাণু বলে—'কি হলো, ষষ্ঠীতলায় নিয়ে যাবে—তাতে এত আকাশ পাতাল চিন্তা করার কি আছে?'

ভুতু বলে—'উঁহু, ঠিক আছে, নিয়ে যাব'—বলে সে ডাক্তারখানা চলে যায়।

রাণু বিশুকে সাজাতে থাকে।

* * *

ডাক্তার ঘোষের ফার্মাসীতে তখন ডাক্তার ঘোষ একটি রোগীকে পরীক্ষা করে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন ডাক্তার ঘোষ। তবে স্বাস্থ্যটা এখনও সবলই আছে। ডাক্তার ঘোষ রোগীটিকে বলছিলেন—'আপনার কিচ্ছু হয় নি।'

রোগী বলে—'কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার যে খুব বুক ধড়ফড় করে।'

ডাঃ ঘোষ বলেন—'ওটা আপনার বুক নয়। মন ধড়ফড় করে।'

রোগী কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে বলে—'আজ্ঞে?'

ডাঃ ঘোষ বলেন—'ওটা আপনার মনের অসুখ। অন্য কিছু হয় নি। আপনি খুব ভাল আছেন। যান—'

রোগী প্রশ্ন করে—'ওষুধ-টষুধ দেবেন না?'

ডাঃ ঘোষ বলেন—'না-না, আমার ওষুধ হচ্ছে ফুর্তি। মনের আনন্দে

ভুতু বিস্কুট খায়। পুষ্প তার পাশে বসে সস্নেহে গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে বলে, 'আচ্ছা ভুতু বাবু'—

'উঁ ?'

'তুমি যে আমাদের এখানে এসেছো, তোমার বাবা-মা বকবে না' ?

'কেন ?'

বলে ভুতু বিস্কুট খেতে-খেতে পুষ্পর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

পুষ্প কথা ঘুরিয়ে বলে, 'না, এমনি বলছিলাম। আজ ইস্কুল নেই ?'

সন্তানহীনা পুষ্প তৃষিত চোখে ভুতুর মুখের দিকে চেয়ে করুণ স্বরে বলে —'কি করে জানবো বাবা, আমার তো আর 'তুমি' নেই। রোজ একবার করে আসবে তো ?'

'আসবো এখন চলি—'

'এক্ষুণি চলে যাবে ?'

'হ্যাঁ, বাবা নতুন বই এনেছে—পড়তে হবে না—

বলে হাসিমুখে পুষ্পর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

পুষ্প বলে—'ও বাবা, নতুন বই না হলে বুঝি পড়তে মন বসে না ?'

ভুতু বলে—'যাঃ—তা কেন ? নতুন বইয়ের নতুন পড়া মুখস্থ করতে হবে না ?'

'আচ্ছা বাবা এসো। আর তোমায় এখন ধরে রাখবো না, রোজ একবার করে এসো কিন্তু।'

ভুতু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যায়। পুষ্পও তার পিছু-পিছু বাইরে এসে দাঁড়ায়। ভুতু তাদের বাড়ির দিকে যেতে-যেতে বার-বার পেছন ফিরে পুষ্পকে ছাখে, পুষ্পও হাসি মুখে তার দিকে চেয়ে থাকে ভুতু তাদের বাড়িতে ঢুকে গেলে তবে পুষ্প ঘরে ফিরে যায় ?

ভুতুর আসায় আজকে সকালটা সবদিনের চেয়ে বেশী সুন্দর বলে মনে হয় পুষ্পর, সুন্দর একটা কোমল আবেশে তার মনটা ভরে যায়। গুন্‌গুন্‌ করে আপন মনে গান গাইতে-গাইতে বাড়ির কাজ সারতে থাকে পুষ্প। ত্বপুরবেলা। ভুতু তাদের বাইরের ঘরে নতুন বই নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়তে বসেছে। পাশের ঘরে কমলা পাটু ও গাবুকে নিয়ে ঘুমুচ্ছে, লক্ষ্মী জেগে আছে। সবাই ঘুমিয়েছে দেখে লক্ষ্মী ধীরে-ধীরে পা টিপে-টিপে

উঠে গিয়ে ভুতুর পাশে দাঁড়ায়। ভুতু তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনেই পড়ে চলেছে, মাঝে-মাঝে নতুন বইগুলোর নতুন-নতুন ছবি দেখছে। লক্ষ্মীও দেখছিল, হঠাৎ ছোঁ মেরে ভুতুর সামনে থেকে একটা ভালো ছবির মলাট দেওয়া বই নিয়ে দৌড়ে ওঘরে পালায়। ভুতুও ছুটে যায় তার পিছু-পিছু। বইটা লক্ষ্মীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য।

আগে লক্ষ্মী সুন্দর মলাটটা ছিঁড়ে ফেলে বইটা মেঝেতে ছুঁড়ে দেয়। ভুতু দেখে আঁতকে ওঠে। খপ্ করে লক্ষ্মীর চুলের মুঠি ধরে মারতে থাকে। মারের চেয়েও অনেক বেশী জোরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে লক্ষ্মী, কমলার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিক্ত বিরক্ত হয়ে বলে, 'আঃ, কি হচ্ছে কি?'

ভুতু ছেঁড়া বইটা তুলে নিয়ে কমলাকে দেখিয়ে বলে—'আমার নতুন বইটা লক্ষ্মী ছিঁড়ে দিয়েছে ছাখো—'

ঝঙ্কার দিয়ে কমলা বলে—'ভালো করে রাখলেই পারতে। এই লক্ষ্মী, এখানে শো, ওঘরে গেলে মেরে ফেলবে বা। ভুতু যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে।' বলে ভুতুকে বকে ঘর থেকে বার করে পাশ ফিরে শোয় কমলা। লক্ষ্মী তার পাশে এসে শুয়ে দুষ্টুমির দৃষ্টিতে ভুলুস্থুল্ করে তাকিয়ে থাকে।

ভুতু ধীরে-ধীরে এ ঘরে আসে। বইটার অবস্থা দেখে তার কান্না পায়। তাক থেকে আঠার শিশিটা এনে ছেঁড়া মলাটটা জোড়া দিতে থাকে।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পুষ্প তার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করছে। এমন সময় ভুতু এসে দাঁড়ালো পাশে।

পুষ্প তখন সাজগোজ করতে খুব ব্যস্ত। শুধু হাসিমুখে একবার ভুতুর দিকে চেয়ে বলল—'এসো ভুতুবাবু!'

বলে পাউডার মুখে, কপালে কালো একটা টিপ পরল।

ভুতু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছাখে। এর আগে পুষ্পকে এমন সাজ-গোজ করতে দেখে নি ভুতু—তাই তার অবাক লাগে। ঘরটাও এখন খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ভুতু চারিদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল, হঠাৎ কিসের ওপর তার দৃষ্টিটা থেমে যায়। ছাখে একটি বড়

প্লেটে অনেকগুলো বড়-বড় সিঙ্গাড়া রয়েছে। ভুতু সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলে—'ওগুলো কি?'

পুষ্প বলে—'ওগুলো ফুলকপির সিঙ্গাড়া।' বলে পুষ্প দেখে ভুতু সেগুলোর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তাড়াতাড়ি পুষ্প বলে—'ওগুলো বাসী, খেতে নেই, আমি তোমাকে কাল খুব ভাল সিঙ্গাড়া আনিয়ে দেবো, আজকে দুটো সন্দেশ খাও।' বলে পুষ্প ভুতুকে সন্দেশ এনে দেয়। ভুতু সঙ্গে-সঙ্গে খেতে আরম্ভ করে! পুষ্পর ঘরে কিছুদিন ধরে যাওয়া আসার জন্য ভুতুর এখন লজ্জা, সংকোচ, ভয় প্রায় কেটে এসেছে।

পুষ্প কিন্তু একটু বিব্রত বোধ করে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, অনঙ্গবাবু হয়তো এখুনি এসে পড়বেন। আশপাশের গলিতে, বাড়িতে লোকজন ঢুকতে আরম্ভ করেছে। কোনো-কোনো ঘর থেকে হারমোনিয়াম, তবলার আওয়াজও ভেসে আসছে।

পুষ্প একটু চঞ্চল হয়ে পড়ে। কিন্তু যতটা সম্ভব চঞ্চলতা গোপন করার চেষ্টা করে বলে—'ভুতুবাবু, তুমি এবার বাড়ি যাও।'

ভুতু যেন আকাশ থেকে পড়ে—'কেন?'

পুষ্প আমতা-আমতা করে বলে—'না রাত হয়ে এলো—পড়বে না?'

ভুতু পুষ্পর মনের কথা বুঝতে পারে না, তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলে—'সে পড়বো এখন।'

পুষ্প গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভুতুকে বোঝানোর চেষ্টা করে। বলে—'না বাবা, তুমি এখন যাও, অন্য লোকজন আসবে এখানে, তাদের সামনে তোমাকে থাকতে নেই!'

ভুতুর যেন এখানে যেমন খুশী আসার, যখন খুশী থাকার একটা অধিকার আছে। সেই ভাবে সে বলে—'আমি থাকবো, কি করবে তারা?'

পুষ্প ভুতুর এই জেদে আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন কাকুতি-মিনতি করতে থাকে ভুতুর কাছে, বলে—'কিছুই করবে না বাবা, তোমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না, তুমি যাও, এমন করে না লক্ষ্মীটি, যাও বাবা।'

ভুতুর আশ্চর্য লাগে, সে এখন থেকে চলে যেতে চাইলে পুষ্প তাকে যেতে দেয় না, যতক্ষণ পরে আটকে রাখার চেষ্টা করে, সেই সেই পুষ্প এখন তাকে তাড়ানোর জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন? কে এমন লোক

আসবে তার বাড়িতে, যার জন্যে ভুতুকে এখুনি চলে যেতে হবে? এই সব নানা কথা ভেবে বলে—'লোকেরা তোমার কে হয় ভাই?'

'না—না, সে তুমি বুঝবে না বাবা, লক্ষ্মী সোনা আমার, এখন যাও, আমি কাল তোমার জন্যে ভালো-ভালো ফুলকপির সিঙ্গাড়া, সন্দেশ, গজা আনিয়ে রাখবো, এখন যাও বাবা!'—বলে পুষ্প এক রকম জোর করেই ভুতুকে ঘর থেকে বার করে দেয়। ভুতু আর কিছু না বলে ধীরে-ধীরে চলে যায়। পুষ্প তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে! তার মাতৃ হৃদয় কেমন যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুচ্‌ড়ে ওঠে, কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি তার? ভুতু যদি তার এই জঘন্য জীবন-যাত্রার কথা জানতে পারে, ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে নেবে। দুনিয়ার সকলের ঘৃণা সহ্য করতে পারবে পুষ্প, কিন্তু ভুতু যদি তাকে ঘৃণা করে, তা'হলে সেই লজ্জিত মুখ লুকোবার জায়গা ইহজগতে খুঁজে পাবে না পুষ্প। অবশ্য অন্যান্য বারবণিতাদের চেয়ে তার জীবন যাত্রার অনেক তফাৎ—একমাত্রই অনঙ্গবাবুই তার এই পথের সাথী, অন্য কেউ তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে সাহস করে না।

পুষ্পর জীবন নেহাৎ বারবণিতার জীবন নয়। নেপাল বাঁড়ুজ্যে তাকে আরও—আরও অনেক নীচে নামাতে চেয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে পুষ্পকে বাঁচিয়েছিলেন এই অনঙ্গ দত্ত, তাই অনঙ্গ দত্ত'র কাছে পুষ্প কৃতজ্ঞ।

অনঙ্গ দত্ত'র সঙ্গে সম্পর্ক খাদ্য-খাদকের মতন নয়। দিনের পর দিন পরস্পরের সাহচর্যে একটা মধুর ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে, কিন্তু এসব কথা আজ আর কেউ বিশ্বাস করবে না। পতিতা পতিতাই, তার আর অন্য কোন জাত নেই।

জানলার গরাদ ধরে পুষ্প চুপ করে দাঁড়িয়ে। অনঙ্গবাবু এখনো আসেন নি। অন্যান্য ঘরগুলি থেকে নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় ভেসে আসছে। পুষ্প উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভুতুদের বাড়ির দিকে।

* * *

অনঙ্গ দত্ত'র আজ তার বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল—প্রায় সাড়ে সাতটার সময় বাড়িতে ফিরলেন। সঙ্গে দু'জন সহকর্মী বন্ধু—সুধাংশু আর বিনয়। বালিগঞ্জের একটি সুন্দর পরিবেশে, অনঙ্গ দত্ত'র বাড়ি। ওরা এসে বাইরের ঘরে ঢুকলেন। এটা অনঙ্গ'র

ড্রেইংরুম। রুমটি আভিজাত্যের চিহ্নে ভরা। ক্লান্ত দেহে ঘরে ঢুকতেই অনঙ্গ বলেন, 'ওঃ ড্যাম্ টায়ার্ড—আজ কি ভোগান্তিটাই না হলো।'

বিনয় হাই তুলে বলে—'যা বলেছ। অনঙ্গ কাল তুমি যেন ওখানে ফোনটা করতে ভুলো না।'

অনঙ্গ বলেন—'না-না। বোসো।'

বিনয় বলে—'না ভাই, আমি চলি।'

অনঙ্গ বলেন—'সে কি হে! এতদিন পর আমার বাড়িতে এলে, এসেই চলে যাবে?'

বিনয় বলে—'হ্যাঁ ভাই, আমার একটু তাড়া আছে।'

সুধাংশু প্রশ্ন করে—'কিসের তাড়া?'

বিনয় বলল, 'আমার জন্য একজন ওয়েট্ করে থাকবে।'

সুধাংশু বলে, 'সে কি হে, তোমার তো বউ নেই যে, ওয়েট্ করে থাকবে। থাকো তো মেসে।'

বিনয় বলে—'না ভাই, আমার একটা শাঁসালো পার্টি আসবে। আমি চলি, গুড্ নাইট—' বলে বিনয় তাড়াতাড়ি চলে যায়।

অনঙ্গ সুধাংশুকে বলেন—'বোস সুধাংশু। সুধাংশু সোফায় গা এলিয়ে দিতে-দিতে বলে—'জেঠ্মল আজকে হোল্-ডে-টা নষ্ট করলে।'

অনঙ্গ বলেন—'তিন ঘণ্টা বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে।'

সুধাংশু বলল—'অথচ ছ্যাখো কোন কাজ হলো না।'

'কাজ হলো বৈ কি?'

'কি কাজ?'

'ও ব্যাটা যে কতখানি ত্যাঁদোড়—সেটা বোঝা গেল, এই অভিজ্ঞতাটাই কাজ।'

অনঙ্গ'র এই কথা শুনে সুধাংশু হো-হো করে হেসে ওঠে, তারপর হাসতেই হাসতেই বলে—'তোমার মিসেস্‌কে চা খাওয়াতে বল।'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়, নিভা—নিভা—' বলে অনঙ্গ তার মিসেস্‌কে ডকেতে থাকেন। কিন্তু কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। অনঙ্গ আবার ডাকেন—'নিভা—নিভা—'

ডাক শুনে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে একটি চাকর। থতমত খেয়ে

বলে, 'আজ্ঞে সাহেব, মেমসাহেব তো নেই।'

অনঙ্গর হাসিমুখ গম্ভীর হোয়ে যায়। বলেন—'ও, তা তুমি আমাদের জন্য চট করে দু'কাপ চা করে দাও।'

'আচ্ছা'—বলে চাকরটি আবার খুব ব্যস্তভাবেই ভেতরে চলে যায়।

অনঙ্গ বলেত—'সুধাংশু'! তুমি একটু বোসো ভাই'—বলে নিজের সার্ট-টাই দেখিয়ে বলেন—'আমি আমার মলাটটা বদলে আসি।'

সুধাংশু হেসে বলে—'এসো।' বলে নিজের সিগারেটের প্যাকেট খুলে ছাখে খালি।

অনঙ্গ চলে যাচ্ছিলেন, সুধাংশু বলে—'তুমি প্লিজ একটা সিগারেট দিয়ে যাও ভাই। মাই প্যাকেট ইজ্ এম্প্টি।'

অনঙ্গ তার সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই দিয়ে ভেতরে যান।

* * *

অনঙ্গ'র শোবার ঘরটা দামী-দামী আসবাবে সাজানো, কিন্তু বড্ড বেশী অগোছালো। আলনায় স্তূপীকৃত জামা-কাপড়, মশারীটা ভালোভাবে তোলা হয় নি, ব্যটনে একটা সায়া-ব্লাউজ ঝুলছে। বিছানায় দামী বেডকভারটায় দামী সিল্কের শাড়ী খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গড্‌রেজের আলমারিতে চাবিটা লাগানোই রয়েছে। টেবিলে স্তূপীকৃত সিনেমা ও আমেরিকান ম্যাগাজিন, তার ওপর দু'টো চায়ের, কাপ পড়ে রয়েছে, দু'টো ডিসে আধ খাওয়া প্যাটিস—কারা যেন একটু আগেই চা খেয়ে গেছে অনঙ্গ এইসব দেখতে-দেখতে তাঁর মনে হয় এটা যেন জঞ্জালের আস্তাকুঁড়। নিজের মনেই ধিক্কার দেন তাঁর স্ত্রী নিভাকে আর নিজের মনেই স্বগতোক্তি করেন—'এই নতুন চাকর ব্যাটাও কিছু দেখে না,'—বলে টেবিলে মানিব্যাগটা রেখে কোটটা খুলে চারিদিকে তাকিয়ে হ্যাঙ্গার খুঁজে পান না। আলনায় তো তিলার্ধ স্থান নেই, তা ছাড়া পায়জামা কই? ধুতিও তো নজরে পড়ছে না। অনঙ্গ ডাকেন—'বলরাম—বলরাম।'

কারো কোনা সাড়া নেই, অনঙ্গ বিরক্তি-বোধ করেন, আবার ডাকেন—'বলরাম, ওহে বলরাম—'

'সাহেব আমাকে ডাকছেন?' বলে চাকরটি এসে দাঁড়ায়।

অনঙ্গ বলেন—'ডাকলে সাড়া দাও না কেন হে বলরাম?'

চাকরটি বলে, 'আজ্ঞে আমার নাম বলরাম নয়—বলহরি। আমায় হরি বলেই ডাকবেন।'

অনঙ্গ বলেন—'সরি, আমি ভুল করে তোমার দাদাটিকে ডেকে ফেলেছি। তবে কি জানো হরি—তোমার দাদাটি কিন্তু লোক খারাপ ছিল না, চাষ আবাদ করতো। আর আমার মতন অমৃত-টমৃত পান করতো, বেশ মেজাজি মানুষ ছিল—কি বল বলরা—সরি—'

'হ্যাঁ বলহরি, তা ছাখো বলহরি, আমি এখন ট্রাউজারটা খুলবো, আমার পায়জামা-টায়জামা দাও। আর কোট্‌টা—'

বলহরি অনঙ্গ'র হাত থেকে কোটটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায় পায়জামা আনতে। অনঙ্গ'র রিষ্টওয়াচটা খুলে রেখে টাইটা খুলতে থাকেন। এমন সময় বলহরি এসে বলে—'সাহেব, পায়জামাটা শুকোয় নি, ভিজে রয়েছে।'

অনঙ্গ বলেন—'ও, তাহ'লে একটা ধুতিই দাও।'

'ধুতি? আচ্ছা।'—বলে বলহরি আবার চলে যায়।

অনঙ্গ জুতো মোজা খুলে চটিটা খুঁজে নিয়ে পায়ে দেন।

বলহরি আবার খালি হাতে এসে বলে, সাহেব ধুতিও পাচ্ছি না। চানের ঘরে একটা আকাচা পড়ে রয়েছে, ঝি কেচে যায় নি।' বলে হরি আলনায় আগোছালো জামা-কাপড়গুলো আরো আগোছালো করে খুঁজতে-খুঁজতে বলে—'এখানেও তো কোনো ধুতি পাচ্ছি না।'

বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে অনঙ্গ বলেন, 'সেকি হে শ্রীহরি, তুমিই না একদিন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় আন্‌লিমিটেড্ নাম্বার অফ্ শাড়ী সাপ্লাই করেছিলে, আমার জন্যে একটা ধুতিও জোটাতে পারছো না? আরে ছ্যা-ছ্যা—'

অপরাধীর মত বলহরি বলে, 'বোধহয় লণ্ড্রী থেকে আনা হয় নি।'

'বেশ, আমাদের দু'জনকে দু'কাপ চা দিয়ে তুমি তাহ'লে লণ্ড্রীটা একবার ঘুরে এসো।' বলে বাইরের ঘরে চলে যান অনঙ্গ।

তার-সার্ট-টাই দেখে সুধাংশু প্রশ্ন করে, 'একি মলাট বদলালে না?'

অনঙ্গ ধীরে-ধীরে সোফায় বসতে-বসতে ম্লান হেসে বলেন—'মলাট কখন বদলায় জানো সুধাংশু, বইয়ের যখন নতুন-নতুন এডিশন হয়। যে

বইয়ের যত কাটতি, সেই বইয়ের তত এডিশনে তত রকম মলাট। আমার বাড়িতে 'আমি' নামক পুস্তকটির একেবারে কাটতি নেই, কাজেই এডিশনও হয় না, তাই-ই মলাটও বদলায় না।'

কথাগুলো যেন অনঙ্গ'র বুক ভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতন বেরিয়ে আসে। মুখে তাঁর ম্লান হাসি। সুধাংশু বুঝতে পারে না তার দুঃখ, কথাগুলো নেহাৎই অনঙ্গ'র হিউমার বলে হাসতে থাকে। এমন সময় বলহরি এসে বলে—'সাহেব, চা খাওয়ার একটু মুস্কিল আছে।'

অনঙ্গ প্রশ্ন করেন—কেন?'

হরি বলে—'দুধটা ছিঁড়ে গেছে।'

অন্যমনস্ক অনঙ্গ বলেন—'ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করে নে।'

'আজ্ঞে—দুধ কি করে সেলাই করবো? পচে গেছে যে।'

সুধাংশু এদের কথা শুনে হো-হো করে হেসে ওঠে। অনঙ্গ তাঁর অন্যমনস্কতার ভুল বুঝতে পারে। একটুখানি চুপ করে হরির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করেন—'তোর মেম সাহেব কোথায় গেছেন?'

বলহরি জবাব দেয়—'সেলুনে চুল বাঁধতে।'

বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে সুধাংশু বলে—'সেলুনে চুল বাঁধতে!'

অনঙ্গ বলেন—'ইয়েস্। আজকালকার মেয়েরা তো বাড়িতে খোঁপা বাঁধে না, সব ওই সেলুনে গিয়ে হেয়ারে-ডু—। তা হরি, তুমি না হয় আমাদের জন্যে সামনের রেষ্টুরেণ্ট্ থেকেই দু'কাপ চা নিয়ে এসো'।

সুধাংশু বাধা দিয়ে বলে—'থাক—থাক হরি, তুমি যাও। আমি বাড়িতে গিয়েই চা খাবো।'

অনঙ্গ বলেন—'তা খাবে জানি, কিন্তু আমরাও এখন এক কাপ চায়ের একান্ত প্রয়োজন।'

সুধাংশু বলে—'তুমিও চল না আমার বাড়িতে, এই তো কাছেই। আমার স্ত্রী বাড়িতেই খোঁপা বাঁধে। এখন গেলেই—যত্ন করে লুচি-আলু-চচ্চড়ি খাওয়াবে—চল না।'

অনঙ্গ কিছু না বলে শুধু একটু ম্লান হাসি হাসেন। তারপর একটু-খানি চুপ থেকে বলেন—'সত্যি সুধাংশু ইউ আর লাকি। তোমার স্ত্রী বাড়িতে খোঁপা বাঁধে। তোমার অপেক্ষায় আসা-পথ চেয়ে বসে থাকে।

তুমি ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরলে, তোমায় যত্ন করে লুচি-আলুচচ্চড়ি খাওয়াবে কিন্তু আমার ছাখো—নো হোম। আমার জন্যে, আমার বাসায় কেউ কখনো অপেক্ষা করে থাকে না।'—বলে অনঙ্গ তাঁর বুক থেকে ঠেলে আসা দীর্ঘশ্বাসটাকে কোনো রকমে চেপে রেখে আবার ম্লান হাসি হাসেন।

সুধাংশু বলে,—'ছাখ ভাই অনঙ্গ, আমি বলবো—এর জন্য তুমিই দায়ী। তুমি রাত কাটাবে অন্য জায়গায়, তোমার সতীসাধ্বী স্ত্রী সহ্য করবে কেন?'

অনঙ্গ বলেন—'সুধাংশু, মেয়েদের সতীসাধ্বী হওয়াটা কোয়ালিফিকেশন। স্ত্রৈণ পুরুষকে মেয়েরা পছন্দ করে না। আমি স্ত্রৈণ নই বলে স্ত্রীকে অবহেলা করি না, কিন্তু তার এই অতি আধুনিকতা আমি স্ট্যাণ্ড্ করতে পারি না।'

এমন সময় টেলিফোনটা বেজে ওঠে। হরি এসে রিসিভার তুলে বলে—'হ্যালো—আমি হরি। ও—মেমসাহেব—হ্যাঁ···হ্যাঁ, এসেছেন—ডেকে দেবো?'

অনঙ্গ ও সুধাংশু উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে হরির দিকে। হরি 'আচ্ছা—আচ্ছা' বলে ফোনটা কেটে দিয়ে এগিয়ে এসে বলে—'সাহেব, মেমসাহেব ফোন করছিলেন, বললেন—'উনি ওখান থেকেই পার্টিতে চলে যাবেন—ফিরতে রাত হবে।'

বলে হরি ভিতরে চলে যায়। অনঙ্গ চুপ করে বসে থাকেন।

সুধাংশু বলে—'আমি তাহলে চলি ভাই।'

অনঙ্গ উদাস ভাবেই বলেন—'যাবে? আচ্ছা এসো'—

সুধাংশু আবার অনুরোধ করে বলে—'তুমিও চল না আমার সঙ্গে।'

অনঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বলেন—'না ভাই, ধন্যবাদ।'

সুধাংশু চলে যায়। অনঙ্গ বসে-বসে তাঁর সংসারের কথা, অতি আধুনিক স্ত্রীর কথা চিন্তা করতে থাকেন।

একটু পরে হরি এসে বলে—'দোকান থেকে চা এনে দেবো?'

অনঙ্গ বলেন—'না থাক, তুই বরং লণ্ড্রী থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়ে আয়।'

হরি যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলে—'টাকা না দিলে আনবো কি করে?'

অনঙ্গ বলেন—'ঐ ঘরের টেবিলে মানিব্যাগে টাকা আছে, নিয়ে যা।'

হরি এ ঘরে এসে ব্যাগ থেকে কয়েকটি টাকা চুরি করে পকেটে পুরে একটি টাকা লণ্ড্রীর রসিদ নিয়ে ধুতি পাঞ্জাবি আনতে চলে যায়। বিরাট বাড়িতে একা চুপ করে বসে থাকেন অনঙ্গ দত্ত। সব কিছু শূন্য মনে হয়। অসহ্য লাগে তাঁর এই জীবনযন্ত্রণা, উঠে পায়চারী করেন। স্ত্রী নিভার আচার ব্যবহার, ঔদাসীন্য, জ্বালা ধরিয়ে দেয় অনঙ্গ'র মনে।

ধীরে-ধীরে আবার এসে সোফায় বসেন। অস্বস্তি বোধ করেন, আবার উঠে গিয়ে ফ্যানের স্পিড্‌টা বাড়িয়ে দেন। ফিরে এসে আবার সোফায় বসেন, টেবিলে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নেন্—সেটা ধরবার আগেই টেলিফোনের রিং হয়। অনঙ্গ উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে বলেন, 'হ্যালো,—না—নিভাদেবী নেই। হ্যাঁ,···না, পার্টিতে গেছেন। আমি? আমি তার স্বামী।···আজ্ঞে? না, কিসের পার্টি·· তা তো বলতে পারবো না। হ্যাঁ···না, নমস্কার' বলে অনঙ্গ রিসিভারটা রেখে দিয়ে অত্যন্ত অন্যমনস্কতায় না ধরাণো সিগারেটে দু'টি টান দিয়ে দ্যাখেন, সেটা ধরানো হয় নি। ধীরে-ধীরে আবার এসে সোফায় বসেন। টেবিল থেকে দেশলাইটা নিয়ে সিগারেটটা খুলে লাগিয়ে ধরাতে গিয়ে দ্যাখেন, দেশলাইয়ে একটিও কাঠি নেই। খালি দেশলাইয়ের বাক্সটা দু'বার কপালে ঠুকে শূন্য হাসি হেসে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। অধরা সিগারেটটা মুখে চেপে মাথার উপরে ফ্যানটার দিকে তাকান। ফ্যানটা তাঁকে বিট্রে করে নি—যথাসাধ্য বন্‌বন্ করে ঘুরে চলেছে।

* * *

পুষ্প অনঙ্গ'র যাত্রাপথ চেয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে আজ তার আসতে এতো দেরী হচ্ছে কেন? হঠাৎ দ্যাখে গলির ও'পাশের বড় রাস্তাটায় অনঙ্গ'র রিক্সা এসে থামলো। পুষ্প তাড়াতাড়ি জানালা থেকে সরে গিয়ে আলনার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনটা আর একবার ঠিক মতন সাজানো-গোছানো ঠিক আছে কিনা দেখতে থাকে।

অনঙ্গ তখন পানের দোকান থেকে সিগারেট নিচ্ছেন কিন্তু কান দুটো তার সজাগ হয়ে আছে গৃহস্থবাড়ির দরজায়।

গৃহস্থবাড়ির বউ—মলি তখন বয়ফ্রেণ্ড রমেনের সঙ্গে কথা বলছে। রমেন বলছে, 'আমার এভাবে তোমার এখানে ভয় করে।'

মলি প্রশ্ন করে, 'কেন ?'

রমেন বলে, 'তোমার কর্তার কাছে যদি কোনদিন ধরা পড়ে যাই ?'

'যাঃ এসো, ভেতরে এসো।' বলে বউটি দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে দাঁড়ায়।

রমেন বলে, 'উনি কোথায় ?'

'সিনেমায়। এসো—' বলে রমেনের একটা হাত ধরে টেনে আরো ভেতরে নিয়ে যায়।

অনঙ্গ তাদের সব কথা শোনেন। শুধু আজই নয়, আরো শুনেছেন, ওদের দু'জনের কথা অনেকেই জানে—শুধু ওর ব্লাক মার্কেটিয়ার, গৃহস্থ স্বামী ছাড়া। অনঙ্গ পুষ্প'র ঘরের দিকে যেতে-যেতে আর একবার ওর বাড়ির দরজার পাশে লেখা 'গৃহস্থবাড়ি'র ছোট বোর্ডটা ভালো করে দেখে এগিয়ে গিয়ে পুষ্পর দরজার পর্দা ঠেলে—'পুষ্প' বলে ডেকে ভেতরে ঢোকেন।

পুষ্প একমুখ হেসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলে—'এ্যাতো দেরী যে ? আমি সেই সন্ধ্যা থেকে ঘরবার করছি।'

'আমার অপেক্ষায় থাকতে ভাল লাগে না তোমার ?'

'জানি-না।'

'জানো তো, বিরহ যত বেশী ভোগ করবে—মিলন তত মধুর হবে।' —বলে পুষ্পর সামনে খাবারের ঠোঙাটা তুলে ধরে বলেন,—'যাক, মোর অমিয়ার লাগি অমৃতি এনেছি—ধর সখি ধর—ধর।'

পুষ্প খাবারের ঠোঙাটা হাতে নিয়ে বলে—'বাঃ বেশ গরম, আপনি খাবেন তো ?'

অনঙ্গ বলেন—'মিষ্টি, ফিষ্টি আমার ভালো লাগে না।'—বলে পুষ্পকে একটু কাছে টেনে তার চিবুক ধরে বলেন—'তোমার এই মিষ্টি মুখটি দেখলেই, প্রাণটি একেবারে ঠাণ্ডা।'

পুষ্প ভুতুর কথা ভেবে বলে—'কালকে বেশ ভাল দেখে ফুলকপির সিঙাড়া-সন্দেশ, নিয়ে আসবেন তো।'

'নিশ্চয় আনবো, তুমি যা হুকুম করবে তাই আনবো।'—বলতে-বলতে অনঙ্গ বিছানায় গিয়ে আধশোয়া হয়ে গা এলিয়ে দেন।

পুষ্প খাবারের ঠোঙাটা রেখে আলমারি খুলে হুইস্কি, সোডা, গেলাস

ইত্যাদি অনঙ্গ'র সামনে টেবিলটায় রাখতে-রাখতে বলে—'আপনার জন্যে গরম-গরম কাট্‌লেট আনাই?'

'না'।

'না—মানে'?

'মানে অম্বল হবে।'

'সে যাই-ই হোক, খালি পেটে আমি আপনাকে ও সব গিলতে দেবো না। কাট্‌লেট না খান—কি খাবেন বলুন?'

অনঙ্গ একটু চুপ করে থামেন। তাঁর মনে পড়ে আজকেরই সন্ধ্যের সুধাংশুর কথাগুলো, অফিস থেকে ফেরার আগে সুধাংশুর স্ত্রী সুধাংশুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। বাড়ি ফিরলে যত্নআত্তি করে তাকে লুচি আর আলু চচ্চড়ি করে খাওয়ায়। কত সুখী সুধাংশু। কত সুখের সংসার তার। আর অনঙ্গ'র অদৃষ্টে ঠিক তার উল্টো। সুখ-শান্তির জায়গায় অশান্তিতে ভরে উঠেছে তার মন। অতি আধুনিকা স্ত্রীর সংসার তার, হাঁপিয়ে উঠেছে অনঙ্গ'র জীবন। তাইতো তিনি ছুটে আসেন এইখানে, যে সুখ-শান্তি থেকে তিনি বঞ্চিত, সেই সুখ-শান্তি তিনি যেন খুঁজে পান পুষ্পর কাছে। পুষ্পও জীবনে কারও কাজ থেকেই ভালবাসা পায় নি। অনঙ্গবাবুর ভালবাসা যেন তাকে ধন্য করেছে। তাই অনঙ্গ'র সেবায় পুষ্প বিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে।

অনঙ্গ শুধাংশুর কথা ভেবে বলেন—'একটা জিনিস খাওয়াতে পারো'?

পুষ্প সাগ্রহে প্রশ্ন করে—'কি?'

'বেশ গরম লুচি আর আলু চচ্চড়ি।'

পুষ্প অবাক হয়, যে লোক অম্বল হবার ভয়ে কাট্‌লেট খেতে চাইছেন না, সেই লোক লুচি আলু চচ্চড়ি খেতে চাইছেন। তার উপর আজ পর্যন্ত তো কোনদিন অনঙ্গবাবু খাওয়ার ব্যাপারে কোনো ফরমায়েস করেন নি! এইসব ভেবে অধিকতর বিস্মিত হয়ে এবং খুশী হয়ে বলে, 'সেকি! আপনি খাবেন লুচি আলু চচ্চড়ি! আমি এখুনিই করে দিচ্ছি।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুষ্প সযত্নে লুচি-আলুচচ্চড়ি তৈরী করে খাওয়ালো অনঙ্গকে। অনঙ্গবাবুও খুব তৃপ্তি করে খেলেন। বললেন, জানো পুষ্প, অনেক ভালো-ভালো, দামী-দামী জিনিস খেয়েছি-খাই, কিন্তু

আজকের তোমার হাতের এই লুচি আলু চচ্চড়ির স্বাদ যতদিন বেঁচে থাকবো—মুখে লেগে থাকবে।'

পুষ্প বলে, 'অতো বাড়িয়ে বলবেন না, আমার অহঙ্কার বেড়ে যাবে সামান্য পাড়াগাঁয়ের মেয়ে আমি, তার উপর চিরটাকাল আমার কেটেছে গরীবের ঘর-সংসারে। ভালো খাবার করতে আর শিখলাম কোথায়?'

অনঙ্গ বলেন, 'যাক্, আজ তাহলে উঠি?'

'আসুন'—বলে পুষ্প অনঙ্গবাবুর সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে ভুতু বাসি সিঙাড়াগুলো খেতে গেছল। তাকে পুষ্প কথা দিয়েছে, কাল তার জন্য ভালো সিঙাড়া আনিয়ে রাখবে। তাই অনঙ্গকে বলে—'কাল একটু সকাল-সকাল আসবেন আর খুব ভালো দেখে ফুলকপির সিঙাড়া আনিবেন।'

অনঙ্গ খুব খুশী হয়ে বলেন—'ঠিক আছে। খুব ভালো সিঙাড়া আনবে। আর সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে আসবো।' বলে অনঙ্গ গিয়ে রিকসাতে ওঠেন। পুষ্প তার যাওয়ার দিকে চেয়ে কপাটের পাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরদিন বিকেল থেকেই পুষ্প চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভুতু তো এখানো এলো না। পুষ্প বার-বার ভুতুদের বাড়ির দিকে তাকায়, কিন্তু ভুতুকে দেখতে পায় না। ভুতুর সৎভাই-বোনেরা তো খেলছে কিন্তু ভুতু? এদিকে অনঙ্গবাবুও তো আসার সময় প্রায় হয়ে এলো, ওমা, একি! ঘড়িতে তো ছ'টাই বাজে। অনঙ্গবাবু এখুনি এসে পড়বেন, অথচ সাজ-গোজ তো দূরের কথা, মাথার চুলটা পর্যন্তও তো ভালো আঁচড়াতে থাকে।

ওদিকে অনঙ্গবাবু তখন গলির মুখটায় রিক্সা থেকে নামছেন। আজ যেন একটু বেশী সেজেছেন অনঙ্গ দত্ত।

রিক্সা থেকে নেমে পানের দোকানের দিকে এগোতেই আর দু'জনের খুব সাজগোজ নজরে পড়লো অনঙ্গ'র। তার দু'জন হলো, গৃহস্থবাড়ির বউ আর তার বয়ফ্রেণ্ড। দু'জনে সেজেগুজে বেরিয়েছে, অনঙ্গবাবু তাদের কথার দিকে একটু উৎকর্ণ হতেই কয়েকটি কথা তার কানে ভেসে এলো। বউটি বলছে—'তাড়াতাড়ি চল, ও এখুনি এসে পড়বে'।

ছোকরাটির কথা শুনে আজ তাকে একটু বেপরোয়াই মনে হলো। সে বললো—'আসুক না, তোমার কর্তাকে আমি ভয় করি না। আমি যদি তার

কাছে ধরা পড়ে যাই, আমিও তাকে পুলিশের কাছে ব্ল্যাকমার্কেটিং-এর জন্য ধরিয়ে দেবো।'

বউটি যেন তার কথায় খুশীই হলো। মুখে কিছু বললো না বটে, কিন্তু মনে-মনে যেন বললো, 'তোমার এই সাহস দেখে খুশী হলাম। পুরুষ মানুষের সাহস না থাকলে তাকে 'কাপুরুষ' বলে।'

ওরা দু'জনে হাসতে-হাসতে হেলতে-দুলতে চলে গেল অনঙ্গ'র সামনে দিয়ে। অনঙ্গ একবার পেছন ফিরে তাদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে একটু-খানি হাসলেন। হাসতে-হাসতে অন্যদিনের মত আজও একবার সেই বাড়ির দরজায় লেখা 'গৃহস্থবাড়ি'-র বউটির দিকে তাকালেন। আর এক-বার হাসলেন, তারপর এগিয়ে গেলেন পানের দোকানে।

সিগারেট নিতে-নিতে কাদের কথায় পেছন ফিরে দেখলেন—গৃহস্থ-বাড়ির কর্তা এবং তার একটি সঙ্গী কথা বলতে বলতে যাচ্ছে।

সঙ্গীটি বলছে—'কতোয় বেচলেন?'

গৃহস্থবাড়ির কর্তা তর্থাৎ বিরিঞ্চিবাবু বলল—'দু'শো।'

সঙ্গীটি পুনরায় প্রশ্ন করে—'কত ব্ল্যাক, কত হোয়াইট?'

বিরিঞ্চিবাবু বলল—'ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি।'

সঙ্গী বলে—'গুড।'

'জানবে।'—ব'লে বিরিঞ্চিবাবু এগিয়ে গিয়ে তার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খুলে দিল একটি বাচ্ছা চাকর। অনঙ্গ ওদের দিকে বক্র-দৃষ্টিতে তাকাতে-তাকাতে পুষ্পর ঘরের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়েন।

ব্যস্তভাবে দরজা খুলে দিল পুষ্প। অনঙ্গ একমুখ হেসে ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু পুষ্প যেন গম্ভীর! কেমন যেন একটু চঞ্চল। অনঙ্গ লক্ষ্য করে বলেন—'বুঝেছি, আমার আসতে দেরী হয়েছে বলে অভিমান হয়েছে বুঝি? বেশী তো দেরী হয় নি, মাত্র পাঁচ মিনিট, অবশ্য প্রেমিক-প্রেমিকার অপেক্ষা-মান সময়, পাঁচমিনিট মানে-পাঁচ ঘণ্টাও মনে হতে পারে। যাই হোক —বেটার লেট দ্যান নেভার। এই নাও, খুব ভালো সিঙাড়া নিয়ে এসেছি।'

পুষ্প কিছু না বলে অনঙ্গ'র হাত থেকে সিঙাড়ার ঠোঙাটা নিয়ে একবার দরজার পর্দা তুলে ভুতুদের বাড়ির দিকে তাকায়। অনঙ্গ বসে-বসে তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন না। পুষ্প তখন

সিঙাড়াটা রেখে জানলা দিয়ে অধীর আগ্রহে ভুতুদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে।

অনঙ্গ ততক্ষণে বসেছেন। মুখ না ফিরিয়েই কথাক'টি বলে পুষ্প তেমনি জানলা দিয়ে তাকিয়েই থাকে। কিন্তু যার জন্যে তার এই চঞ্চলতা তাকে দেখতে পায় না পুষ্প।

অনঙ্গ বলেন—'কি হ'লো? সিঙাড়া খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

পুষ্প অনমস্কভাবে সেইখানে থেকেই বলে—'হোক্।'

অনঙ্গ বলেন—'কি ব্যাপার বলো তো, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার কথামত গরম-গরম ফুলকপির সিঙাড়া ভাজিয়ে আনলাম, আর তুমি মুখ গোম্ড়া করে রয়েছ।' বলতে-বলতে পুষ্পের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন—'বলি একটু হাসো, একবার হাসিমুখে চাও, ওই হাসিটুকুর জন্যেই তো আসি।'

পুষ্প তেমনি পথের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ তার মুখ হাসিখুশীতে ভরে ওঠে। অনঙ্গ তার এই হাসির কারণ বুঝতে না পেয়েই বলেন—'বাঃ—বাঃ এইতো হেসেছো, কি সুন্দর দেখাচ্ছে বলত'?

পুষ্প কিন্তু তার কথা ভ্রূক্ষেপ না করে হাসিমুখে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। ওদিক থেকে ঝড়ের মতন ছুটে এসে ঘরে ঢোকে ভুতু। পুষ্প তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বলে—'তোর এত দেরী হলো যে?'

ভুতু বলে—'নতুন-মা আমাকে ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে ছিল।'

ভুতু অনঙ্গবাবুকে লক্ষ্য করে নি, কিন্তু তাকে দেখে অনঙ্গবাবু বুঝলেন বুঝলেন পুষ্পর এতক্ষণকার ভাবান্তরের কারণ এই ছেলেটি।

অনঙ্গবাবু ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে ভুতুর মাথায় সস্নেহে হাত রেখে পুষ্পকে প্রশ্ন করেন—'কে এই ছেলেটি?'

পুষ্প বলে—'ওই সামনের বাড়ির ভাড়াটে—মুখার্জীবাবুর ছেলে।'

'বামুন।' বলে অনঙ্গবাবু ভুতুর চিবুক ধরে তার মুখটা তুলে ধরে বলে —'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্য কুলজাত।' ভুতু এসব কথার কিছুই অর্থ বুঝতে পারে না। শুধু অনঙ্গবাবুর মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। পুষ্প তাকে সিঙাড়া এনে দেয়।

অনঙ্গ বলেন—'তুমি এবার বাড়ি যাও খোকা।' ভুতু অনঙ্গকে কিছু

না বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুষ্প'র দিকে চায়।

পুষ্প বলে—"হ্যাঁ বাবা আজ যাও, আবার কাল এসো।'

ভুতু সিঙাড়া খেতে খেতে বলে—'কাল আবার এমনি সিঙাড়া দেবে ?'

'হ্যাঁ, দেবো। দাঁড়াও, আরও কয়েকটা দিচ্ছি—খেতে খেতে যাও।'

বলে আরও কয়েকটা সিঙাড়া এনে ভুতুর হাতে দেয়। ভুতু সিঙাড়া খেতে-খেতে চলে যায়। পাশের ঘরগুলো থেকে নাচ-গান, হৈ-হল্লোড় ভেসে আসছে। পুষ্প তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজে মন দেয়। অনঙ্গ হুইস্কির বোতল খোলার আগেই পুষ্প তাড়াতাড়ি তাঁর সামনের টেবিলে খাবারের প্লেট, সোড়া ইত্যাদি সাজিয়ে দেয়।

অনঙ্গ হুইস্কিতে সোড়া মিশিয়ে খেতে শুরু করেন। পুষ্প তার পাশে বসে কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসে—'আচ্ছা অনঙ্গবাবু, আপনার ছেলে-পুলে নেই ?'

'না।'

'স্ত্রী ?'

'হ্যাঁ, সতী-সাধ্বী-লক্ষ্মী আছে।'

'তাহ'লে আপনি সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে ফেলে এখানে আসেন কেন অনঙ্গবাবু? আপনি তো ভদ্রলোক।'

'ফর্সা জামা-কাপড় পরলেই যদি ভদ্রলোক হওয়া যায়—তাহলে নিশ্চয়ই আমি ভদ্রলোক।'

'না মানে—আপনি তো শিক্ষিত।'

'পুষ্প, কয়েকটা বই পড়ে, কয়েকটা পাশ করলে যদি তাকে শিক্ষিত বলা যায়—তাহ'লে আমি শিক্ষিত, কারণ, আমি এম, এ, পাশ করেছি।'

'এত লেখা-পড়া শিখে কেন যে আপনি—'

পুষ্প'র কথা শেষ করতে না দিয়েই অনঙ্গবাবু পুষ্পর দিকে মুখ তুলে বলেন—'কি জানো পুষ্প—মানুষ সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে অ-মানুষ হতে, তাই আমি তোমার কাছে, অমানুষ হতে, অভদ্র হতে, অসভ্য হতে আসি। এক বোতল সোডা—'

পুষ্প আর কিছু না বলে আর এক বোতল সোডা এনে দেয়।

অনেক-অনেক পেছনে সে কোন দেশ, যেখানে এই এমনি ধূসর, মৌন চারিদিক, সে দেশের কথা মনে হ'তেই তার মন অবশ হয়ে আসত। তার দিদিমা যে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প করেন, সে সব ঘটনা সেই দেশেই ঘটে, রাম-রাবণের যুদ্ধ সেখানে এখনও চলেছে, সে দেশের সীমাহীন গহন বনের মধ্যে গলাকাটা কবন্ধ রাক্ষস এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যত অসম্ভব আর আজগুবি জিনিসের দেশ যেন সেটা।

কিন্তু সে সব অনেক দিনকার কথা। বড় হয়ে উঠে লোকনাথ অত্যন্ত রুক্ষদর্শন ও কঠোর প্রকৃতির লোক হয়ে উঠলেন। তাঁর নীরস শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার জন্যে তাঁর আকৃতি দিন-দিন লালিত্য হীন হয়ে উঠতে লাগল। যখন তাঁর প্রকাণ্ড মাথাটার অসংযত দীর্ঘ চুলের গোছা আর দীর্ঘ রুক্ষ দাড়ি বাতাসে উড়ত, তখন সত্যই তাঁকে অত্যন্ত ভয়ানক ব'লে মনে হ'ত। তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতন এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর দীপ্ত নীল আভা তাঁর চোখে খেলতে দেখা যেত, কিন্তু এক-এক সময় আবার সে দীপ্তি শান্ত হয়ে আসত, তাঁকে খুব সুদর্শন, খুব উদার ব'লে মনে হ'ত।

বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে লোকনাথের বাল্যের সে সুদূর-পিয়াসী মন ধীরে-ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বেই দৃশ্যমান জগৎটা একটা প্রশ্নের রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সামনে উপস্থিত হলো। জগতের সৃষ্টিকর্তা কেউ আছে কিনা, এই আজগুবি প্রশ্ন নিয়ে লোকনাথ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় কালাতিপাত করতে লাগলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্যও ছিল আজগুবি ধরণের। সাংসারিক সুখ-সুবিধা লাভের প্রচেষ্টাকে তিনি পূর্ব হ'তেই অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, যশোলাভ বিষয়েও তিনি হয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। একবার মঠের আচার্যের কাছে মগধ থেকে পত্র এল—মঠের অতীশদের মধ্যে আচার্য যাঁকে উপযুক্ত মনে করবেন, তাঁকে হস্তীর পৃষ্ঠে ক'রে সসম্মানে রাজধানীতে নিয়ে আসা হবে। রাজসভার সুরিপদতিলক মহাচার্য জীবনসুরির সম্প্রতি দেহান্তর ঘটেছে। আচার্য একমাত্র লোকনাথকেই এ পদের উপযুক্ত ব'লে ভেবেছিলেন, কিন্তু লোকনাথ কিছুতেই মগধে যেতে রাজী না হওয়ায় তাঁর এক সতীর্থ মগধে প্রেরিত হলেন। এর কিছুকাল পরেই

লোকনাথ মঠ পরিত্যাগ করলেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই পুণ্যভদ্রার নির্জন তীরভূমিতে আশ্রয় নিলেন।

সেই থেকে আজ ত্রিশ বৎসর তিনি এই নির্জন মাঠের মধ্যে এ কুটীর খানিতে একা বাস করছেন। জৈন ধর্মমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ তণ্ডুল ও দু'খানা বহির্বাস তাঁকে দেওয়া হ'ত। মাঠের ধারের বুনো কার্পাসের তুলা থেকে অন্য পরিধেয় নিজের হাতে প্রস্তুত ক'রে নিতেন। প্রথম-প্রথম দু'একজন ছাত্রকে নিয়ে তিনি অধ্যাপনা করছিলেন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও উন্নতচরিত্রের আকর্ষণে যখন শিক্ষার্থীর ভিড় বাড়বার উপক্রম হ'ল, অধ্যাপনা তিনি তখন একেবারেই বন্ধ ক'রে দিলেন।

পুণ্যভদ্রার দুই তীরের নির্জন মাঠ তখন স্থানে-স্থানে বনে ভরা ছিল। অনেক স্থানে এই সব বনের উপর পাহাড়ের শাল ও দেবদারু গাছের বীজের চারা, কোন স্থানে নানা রকমের কাঁটাগাছ ও বনজ লতার ঝোপ। দক্ষিণের পাহাড় একটা অপরিসর উপত্যকায় দ্বিধা-বিভক্ত, পুণ্যভদ্রার একটা ক্ষীণ স্রোতশাখা এর মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপারে বেরিয়ে গিয়েছে, তার গৈরিক জলধারার উপর সব সময় দুই তীরের পত্রশ্যাম শিশুদেবদারু শ্রেণীর কালো ছায়া।

এখানেই ছিল লোকনাথের কুটীর।

লোকনাথের ছোট কুটীরখানি হস্তলিখিত পুঁথির একটা ভাণ্ডার বিশেষ ছিল। কাঠের ত্রিপট্ট শক্ত করে বেত দিয়ে বেঁধে লোকনাথ একরকম পুস্তকাধার প্রস্তুত করেছিলেন এবং বৃহৎ তালপত্র ও ভূর্জপত্রের পুঁথিকে স্থান দেবার জন্য তিনি ত্রিপট্টের মাঝখানে অনেকখানি করে ফাঁক রেখেছিলেন। এই ত্রিপট্টটি পুঁথিতে ভরা থাকত—যড়্‌দর্শন, উপনিষদ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, অশ্বলায়ন ও আপস্তম্বাদি সূত্র, পাণিনি ও অন্যান্য বৈয়াকরণদের গ্রন্থ, সংহিতা ও নানা কোষকারদের পুঁথি প্রাচীন জ্যোতির্বিদের কিছু কিছু পুঁথি, ইত্যাদি। তা ছাড়া আরও নানাপ্রকার পুঁথি মেঝেতে এমন যদৃচ্ছক্রমে ছড়ানো প'ড়ে থাকত যে, কুটিরের মধ্যে পা রাখবার স্থান পাওয়া দুষ্কর।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান ক'রেই লোকনাথ কুটীরের সামনের প্রাচীন

নিমগাছটার ছায়ায় গিয়ে বসতেন এবং একমনে পড়তেন।

এক-একদিন অবসন্ন গ্রীষ্ম-অপরাহ্ণ ঈষত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে সদ্যফোটা নিমফুলের পরাগ মাখিয়ে এক অপূর্ব লোকের সৃষ্টি করত, সেখানে শুক্লকেশ আর্যভট্ট শিষ্য শকটায়নকে নীলশূন্যে খড়ি এঁকে গ্রহ-নক্ষত্রের সংস্থান উপদেশ করতেন, বুনো পাখীর অশ্রান্ত কাকলীর মধ্যে যাস্ক ভাষা-তত্ত্ব আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন, দুর্বোধ্য জ্যামিতিক সমস্যার সামনে প'ড়ে সেখানে কুঞ্চিত-ললাট পরাশর তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি অত্যন্ত একমনে সম্মুখস্থ বল্মীকস্তুপের দিকে আবদ্ধ ক'রে রাখতেন—চমক ভেঙে উঠে লোকনাথের কাছে এটাও একটা কম সমস্যার বিষয় হয়ে উঠত না যে, কেন তিনি এতক্ষণে মনে-মনে ভাষাতত্ত্ব আলোচনাকারী যাস্কের মুখকে সম্মুখস্থ নদী-জলে সন্তরণকারী বন্য হংসের মুখের মত কল্পনা করছিলেন।

রাত্রে আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে লোকনাথ ভাবতেন এগুলো কি? প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের পুঁথি এখানে তাঁকে বড় সাহায্য করত না। অবশেষে তিনি নিজে ভেবে-ভেবে স্থির করলেন, নক্ষত্রসমূহ এক প্রকার বৃহৎ স্ফটিক পিণ্ড। পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্যে এগুলো আকাশে আছে, চন্দ্রকে তিনি নক্ষত্রদের অপেক্ষা বৃহত্তর স্ফটিক পিণ্ড ব'লে ভেবেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হস্তলিখিত একখানি পুঁথিতে দেখা যায়, তিনি গ্রহনক্ষত্র সংক্রান্ত তাঁর এ মতবাদ লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছেন। তাদের আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে লোকনাথ লিখেছিলেন যে, পৃথিবীতে স্ফটিক প্রস্তরের যে শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, মহাব্যোমস্থ এই সমস্ত স্ফটিক তার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর হওয়ায় তাদের অভ্যন্তর থেকে এক প্রকার স্বভাবজ জ্যোতি বার হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত বহু প্রমাণ ও বহু জ্যামিতিক রেখা ও অঙ্কন তাঁর ঐ পুঁথিখানিতে ছিল দেখা যায়, কিন্তু লোকনাথের প্রতিভা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হওয়ায় তিনি তাঁর মত সম্বন্ধে আদৌ গোঁড়া ছিলেন না, সকলকে তাঁর মত প'ড়ে দেখে বিচার করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি মাঝামাঝি কিছু হওয়াটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন উচ্চজ্ঞান, নয় তো একেবারে মূর্খতা। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের উপর তাঁর একটা আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল। একবার তিনি কয়েক বৎসর ধ'রে বহু পরিশ্রম করে সাংখ্যের এক ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন।

লেখা শেষ ক'রে তাঁর মনে হ'ল তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন, ভাষ্য তেমনটি হয়নি, অনেক খুঁত রয়ে গিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও লোকনাথ সে খুঁত কিছুতেই দূর করতে পারলেন না। একদিন সকালবেলা হস্ত-লিখিত পুঁথিখানা নিয়ে তিনি পুণ্যভদ্রার তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। জলের স্রোতে তীরলগ্ন শরবনগুলো তখন থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। লোকনাথ অনেক বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পুঁথিখানিকে টান্ মেরে নদীর মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, একখণ্ড ইঁটের মতই সেখানা সেই মুহূর্তে ডুবে গেল, শুধু সংখ্যের উগ্র পাণ্ডিত্যের সংঘাতে বন্য নদীর নিরক্ষর বুকটি অল্পক্ষণের জন্য ভাববিহ্বল হয়ে উঠল মাত্র।

দিন যেতে লাগল। লোকনাথ পূর্বের মতন আর একস্থানে অনেকক্ষণ বসতে পারেন না। মনের শান্তি তিনি দিন-দিন হারাতে লাগলেন। এক-একদিন সমস্ত দিন তিনি কিছুই খেতেন না, কি জানি কেন, শুধু কেবল নদীর ধারে সারা দিনমান ধ'রে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরে-ঘুরে বেড়াতেন। রাত্রে আকাশের দিকে চাইতেন না, যদি হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে ফেলতেন, কালো আকাশের ভাঙা-ভাঙা মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে যে সব নক্ষত্র জ্বল্ জ্বল্ করত, তাদের সন্ত্রস্ত দৃষ্টির সামনে তিনি অনভ্যস্তপাঠ অপরাধী বালক-ছাত্রের মতন সঙ্কুচিতভাবে দৃষ্টি নামিয়ে দু'হাতে ঢেকে ফেলতেন। রাত্রে নির্জন মাঠে চারিধার থেকে অন্ধকারে রাশি-রাশি প্রশ্ন জেগে উঠত। ভগবান্ উপবর্ষের বেদান্ত-সূত্রের মধ্যে এদের উত্তর মেলে না কেন?

লোকনাথ আবার অত্যন্ত একমনে দর্শনের পুঁথি পড়তে সুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মুখ যদি সে সময় কেউ দেখত সে বেশ বুঝত যে, তৃপ্তির চেয়ে অসন্তোষই হয়েছে তাঁর বেশি। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করবার চেয়ে সহজ উপায় দার্শনিকরা নিরূপণ ক'রে গিয়েছেন, প'ড়ে, শুনে, দেখে লোকনাথের দুঃখ যেন তাতে বেড়েই চলেছে! রাত্রে বাঁশের আড়ার পুস্তকাধার থেকে ভূর্জপত্রের পতঞ্জলি বক্রচক্রে গৌতমের দিকে চাইতেন, কপিল গর্বমিশ্রিত ব্যঙ্গহাস্যে জৈমিনির দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে রইতেন, মূর্খগুলোর সঙ্গে এক আসনে বসতে হয়েছে ভেবে গম্ভীর অপমানে ব্যাসদেব পুঁথির মধ্যে দিন-দিন শুকিয়ে উঠতে থাকতেন। রাত দুপুরের সময় অধ্যয়ন-ক্লান্ত অবসন্ন

মস্তিকে শয্যাগ্রহণ ক'রে লোকনাথের মনে হ'ত অর্ধ অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা খণ্ডপ্রলয় চলেছে। দর্শনাচার্যগণ যেন কেউ কারুর কথা শুনে পরস্পর মহাতর্ক তুলেছেন, তাঁদের ভাষ্যকার ও উপভাষ্যকাগণের বাগ্‌যুদ্ধ হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে, কথার উপর কথা চড়িয়ে দু'দিক থেকেই কথার পাহাড় গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। লোকনাথের আর ঘুম হ'ত না, পুরাতন ভূর্জপত্রের গন্ধে ভারাক্রান্ত বদ্ধ বাতাসে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, শয্যা ছেড়ে উঠে তিনি বাইরের নিমগাছটার তলায় এসে দাঁড়াতেন, হয়তো কোন দিন ভাঙা চাঁদের নীচে বিশাল মাঠ আলো আঁধারে অস্পষ্ট দেখাত, কোন দিন কষ্টিপাথরের মতন কালো অন্ধকারে পথের তলায় ঘাসের মধ্যে থেকে কত কি কীটপতঙ্গ বিচিত্র সুরে ডাকতে থাকত, বনঝোপের মাথায় জোনাকি পোকার ঝাঁক জ্বলত···নদীর ঝির্‌ঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে একটু শান্তিলাভ করবার সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই সব নীরব-নৈশ প্রশ্ন প্রেতের মতন তাঁকে পেয়ে বসত। এবার সেটা আসত অন্ধকারের রূপ ধ'রে। আলোর যদি সৃষ্টিকর্তা থাকে, তবে অন্ধকারের আর একটা সৃষ্টিকর্তার কি প্রয়োজন আছে? আলোর অভাবই যদি অন্ধকার হয়, অন্ধকার কি তবে স্বপ্রকাশ? স্বয়ম্ভু?··· সৃষ্টির পূর্বের জিনিস?

লোকনাথ আবার ধীরে-ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকতেন, আবার তত্ত্বসমাসের পুঁথিখানা উঠিয়ে নিয়ে প্রদীপের শিখা আঙুল দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলতেন।

সেদিন তিনি পড়ছিলেন না, সারাদিন কেবল চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে কি ভাবছিলেন। যে রহস্য ভেদ করবার জন্য তাঁর মন সর্বদাই আকুল, সে রহস্য ভেদ করবার আশা ক্রমেই যেন দূরে চ'লে যাচ্ছে, সব দিকেই অন্ধকার, কোন দিক থেকে কোন আলোক আসবার চিহ্ন দেখা যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর মনে হ'ত কোন-কোন আত্মস্থ ঋষি কোন্ প্রাচীন যুগে তাঁদের জীবনের কোন এক শুভ মুহূর্তে এ জীবনরহস্যের সন্ধান বোধহয় পেয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য তাই তাঁরা আশ্বাসবাণী লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছিলেন 'পেয়েছি··· পেয়েছি···'। তাঁর মনে

হ'ল প্রথম যেদিন তিনি উপনিষদের এক জীর্ণ পুঁথির পাতায় এ কথার সন্ধান পেয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স এখানকার চেয়ে কুড়ি বৎসর কম। সে এক বর্ষার রাত্রিকাল স্তব্ধ নিশীথ রাত্রে, নির্জন মাঠে বেয়ে সেদিন অশান্ত বাধা-বন্ধনহীন বাতাস হু-হু ক'রে ঝড়ের বেগে বয়ে যাচ্ছিল, স্তিমিত প্রদীপ কুটীরে পুঁথির মধ্যে তার সন্ধান পেয়ে ক্ষণিকের জন্য লোকনাথের সমস্ত শরীর সর্পস্পৃষ্টের মতন শিউরে উঠেছিল···পুঁথি বন্ধ ক'রে ঘরের বাইরে চেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল গাছপালা, দূর্বা, নদীজল, সব যেন তাঁরই মতন শিউরে-শিউরে উঠছে। এখন তাঁর সেই কথা মনে প'ড়ে হাসি পেল। অল্প বয়সের সেই কাঁচা ভাবপ্রবণ মনের দিকে নিচু চোখে চেয়ে দেখে তাঁর বর্তমান সময়ের প্রবীণ মন সকৌতুকস্নেহে রঞ্জিত হয়ে উঠল। মানুষের মন নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'তে পারে না —যে বলে জেনেছি, হয় সে ভণ্ড, নয় সে আত্মপ্রতারক মূর্খ! কি বুঝতে হবে, সে সম্বন্ধে তার কিছু ধারণাই নেই।

হঠাৎ তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি দূরের নীল শৈলসানুলগ্ন প্রথম বসন্তের নবপুষ্পিত রক্ত পলাশের বনে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

অনেকদিন আগের কথা। তখন লোকনাথের বয়স একুশ বৎসর।

—কিছু না, মায়া, লক্ষ্মীটি, আমি, এই ধরো সাত বছরের মধ্যেই আসব·· পড়া শেষ হ'তে কি আর বেশী নেবে? বড় জোর সাত বচ্ছরই হোক। তোমায় ফেলে এর বেশী কি আর থাকতে পারব? বুঝলে?

সতের বৎসরের মায়া সলজ্জ হেসে বলে— সাত বচ্ছর···এত কম সময়? আর এমন বেশি কি?

লোকনাথ গাঢ়স্বরে উত্তর দেয়, সেই কথাই তো বলছি মায়া, সাত বছর কি আর বেশি আমাদের পক্ষে? তারপর মায়ার মুখে নির্ভরতার দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে—নয় কি, মায়া?

মায়া মুখে হাসি টিপে উত্তর দেয়—নাঃ, তা আর বেশি কি! মোটে সাত বছর—এবেলা-ওবেলা—ব'লেই প্রগল্‌ভ উচ্চহাস্যে হেসে ওঠে।

লোকনাথ অপ্রতিভ মুখে বলেছিল—না, শোনো মায়া—আমি বলছি —না—আমার বল্‌বার কথা··· -

যে মায়ার অভয়-ভরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি সেদিন তাঁকে প্রবাসের পথে সধীর

মতন আগ বাড়িয়ে দিয়ে চোখের জলে নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলেছিল, আজ লোকনাথের প্রবীণ হৃদয়ে কোথায় সে মায়ার স্থান, তা আমরা জানিনে, তবে এটুকু বোধ হয় ঠিক যে সে সময়ের মনোভাব এখন আর লোকনাথের ছিল না। জীবনের তুচ্ছ জিনিসে তাঁর কোন আসক্তি ছিল না।

মঠে থাকতেই লোকনাথের মন অন্যরকম হয়ে উঠেছিল, তিনি মায়ার কথা ভুললেন, জীবনের সুখকে মনে-মনে ঘৃণা করতে শিখলেন। তাঁর জীবনে শুধু অনুসন্ধিৎসু ঋষিদার্শনিকদের যাতায়াত শুরু হল—সে এক বিরাট রহস্যময় দার্শনিক···কে তুচ্ছ মায়া? মূর্খই শুধু এত সামান্য জিনিসে এত বেশি আনন্দ পায়, হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নপুঞ্জ তাদের মনে কস্মিন্‌কালে জাগে না ব'লেই।

তবু কখনো-কখনো, কোনো অসাবধান মুহূর্ত যজ্ঞভঙ্গকারী নিশাচরের মতন অতর্কিত ভাবে হঠাৎ এসে পড়ে। তাঁর বিশ বৎসরের যৌবন মায়ার মুখের লজ্জা-নম্র হাসিতে, তার প্রসন্ন ললাটের মহিমায় স্নিগ্ধ হয়েছিল, যৌবনলক্ষ্মীর বরণ-ঢালির সেই প্রথম মাঙ্গলিক।

অনেক বৎসর পরে মঠে থাকতে লোকনাথ শুনেছিলেন, মায়া বিবাহ করেনি, কোন্ মঠে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে ভিক্ষুণী হয়েছে। সেও অনেক, দিনের কথা, তার পর তার আর কোনো সংবাদ তিনি রাখেন না। যেখানে যায় যাক, তিনি গ্রাহ্য করেন না।

সন্ধ্যার ছায়া মাঠের চারিধারে ঘন হয়ে এল। কুটীরে যেতে-যেতে লোকনাথ আকাশের দিকে চাহিলেন, মনে-মনে বললেন—হে অদৃশ্য শক্তি, আমি দার্শনিকাচার্য লোকনাথ—অজ্ঞান, মূর্খ সাধারণ মানুষের মতন আমার যুক্তিপ্রণালী বা মানসিক ধারা নয়। আমি জানতে চাই, এই কার্যস্বরূপ দৃশ্যমান জগৎ কোন্ কারণ-প্রসূত। সাধারণ লোকে যাকে ঈশ্বর বলে, তার মূলে কিছু আছে কিনা। গ্রন্থের কথা আমি জানিনে, কারণ তার প্রমাণের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। আমি তোমার কাছে প্রমাণ চাই, জানিনে তোমার শোনবার ক্ষমতা আছে কিনা, থাকে তো জানিও। ···ভোলাবার চেষ্টা কোরো না,—তাতে আমি ভুলব না।

* * *

মহামণ্ডলীর মঠে প্রধান দার্শনিক বৈভাষিকপন্থী মাধবাচার্য বাস

করতেন। লোকনাথ তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। মাধবাচার্য বোঝাতে গিয়ে প্রথমত মুক্তি কি, মুক্তি কয় প্রকার, মুক্তির ও নির্বাণের মধ্যে প্রভেদ কিছু আছে কিনা, প্রভৃতি এত বিস্তৃতভাবে বলতে লাগলেন ও এত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত ক'রে তাঁর মতের পরিপোষণের চেষ্টা পেতে লাগলেন যে, লোকনাথ অত্যন্ত পাণ্ডিত্য-প্রিয় হলেও তাঁর মনে হ'তে লাগল, মুক্তির একটি স্বরূপ তিনি বুঝেছেন, সেটি সম্প্রতি মাধবাচার্যের বাক্যজালের হাত এড়ানো।

স্নান করতে-করতে একদিন তাঁর মনে হ'ল তাঁর পিঠে যেন কিসের লেজ ঠেকছে। তিনি তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে জলের মধ্যে হাত দিয়ে দেখলেন, লেজ নয়, একটা জলজ গাছের পাতা গায়ে ঠেকছে। গাছটাকে তিনি টান দিয়ে উপড়ে তুলে ফেললেন, দেখলেন একটা শেওলা-গাছ,—এ শেওলা নদীতে তিনি পূর্বে দেখেছেন, তেমন লক্ষ্য করেননি ভাল ক'রে চোখ পড়তে দেখলেন যে শেওলার ডাঁটার যে অংশটা তাঁর গায়ে সুড়সুড় ক'রে ঠেকেছিল, সেটা জলের নীচেকার অংশ, সে অংশের পাতাগুলি ঝাউ-পাতার মতন—কিন্তু জলের উপরের অংশের পাতাগুলি পানের মতন। জলের উপরের অংশের পাতা জলের উপরে ভাসে। নীচের অংশে পাতা ও রকম হলে স্রোতের তোড়ে ভেঙে যেত, কিন্তু চুলের গোছার মতন হওয়ায় তারা জলকে বাধা দেয় না, জল তাদের মধ্যে দিয়ে বেশ কেটে চ'লে যায়, যখন যেদিকে স্রোতের গতি, পাতাগুলি তখন সেদিকে হেলে পড়ে। লোকনাথ অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে স্নান ক'রে ফিরলেন। একটা কি জিনিস যেন তিনি ধরছেন।

তাঁর মনে হ'ল একই ডাঁটার উপরে নীচে দু'রকম পাতা হওয়ার মূলে প্রকৃতির মধ্যে একটা চৈতন্যসত্তা বেশ যেন ধরা পড়েছে—নইলে এই নগণ্য জলজ শেওলার পত্রবিন্যাসের মধ্যে এ নিপুণতা কোথা থেকে এল? পাছে ভেঙে যায়, এজন্যে কে এর জলের নীচের অংশের পাতা ঝাউপাতার মতন ক'রে গড়লে?

লোকনাথের আর একটা কথা মনে হ'ল। কয়েকদিন পূর্বে তিনি অত্যন্ত অধীরভাবে জাগতিক শক্তির কাছে তার চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ চেয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রার্থনা কি এইভাবে কেউ পূর্ণ করলে?

ন্যায়যুক্তির দিক্ থেকে এ সিদ্ধান্ত এত বিপজ্জনক তাঁর মনে হ'ল, যে তিনি এ কথা জোর ক'রে মন থেকে দূর ক'রে দিলেন। সাধারণ মানুষের মতন এত শীঘ্র তিনি কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেন না। তবু তিনি ভেতরে-ভেতরে দিন-দিন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে লাগলেন। সেই জলজ শেওলার শুক্‌নো ডাঁটা-পাতা কুটীরের সামনে প্রায়ই পড়ে থাকতে দেখা যেত। পুঁথিপত্র তিনি আজকাল কমই খোলেন।

নদীর ধারে-ধারে যেখানে বন্যগাছের শ্যামপত্রসম্ভার স্রোতের জলে ঝুপসি হয়ে পড়ে থাকত, দীর্ঘ-দীর্ঘ ঘাসের ফুল স্তূপে-স্তূপে ফুটে জলের ধার আলো ক'রে থাকত, পত্রনিবিড় ঝোপগুলির তলায় জলচর পরীক্ষা ডিমগুলি গোপনে শুকনো পাতা চাপা দিয়ে রাখত, লোকনাথ বেশির ভাগ সময় সেইসব স্থানে কি দেখে-দেখে ফিরতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কুটীরের সামনের মাঠে এক রকম ছোট ঘাসের কুচো-কুচো সাদা ফুল রাশি-রাশি ফুটত, লোকনাথকে দেখা যেত সেই ফুল তুলে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাদের গঠন লক্ষ্য করছেন—ঘাসের ফুল সম্বন্ধে লোকনাথে মনে হ'ত যে সব ফুলগুলি একই গঠনের—পাঁচটি করে পাপড়ি, মধ্যে একটা বিন্দু। প্রকাণ্ড মাঠে এ রকম ফুল দু'হাজার, দশহাজার, দু'লক্ষ, দশলক্ষ ফুটে থাকত, লোকনাথ, যদৃচ্ছাক্রমে এখান থেকে ওখান থেকে ফুল তুলে দেখতেন, সবগুলির সেই একই গড়ন, সেই পাঁচটা ক'রে পাপ্‌ড়ির মধ্যে একটা বিন্দু।

লোকনাথের পিপাসা বিকারের রোগীর মত বেড়ে উঠল। কত কি প্রশ্ন তাঁর মনে আসে—অসাধারণ বিভীষণ সব প্রশ্নদৈত্য। লোকনাথ বলতেন—জানাও হে চৈতন্যময় কারণ শক্তি, আমায় আরও জানাও।

দিনকতক পরে সত্যই তাঁর অসহ্য যাতনা হ'তে লাগল। একটা বিশাল ঘনান্ধকার গুপ্ত রহস্যজগৎ দ্বারপার্শ্বে সংকীর্ণ ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটুখানি আলোকরেখা যেন তাঁর চোখে ফেলেছিল, তাঁর বুভুক্ষু মন সমস্তটা একসঙ্গে দেখবার জন্যে ছটফট করতে লাগল ;—রাত্রে তাঁর নিদ্রা হ'ত না—কালো আকাশে চোখ তুলে বলতেন—চোখ খুলে দাও, হে মহাশক্তি চোখ খুলে দাও।

ইতিমধ্যে আবার একদিন তিনি দেখলেন—একটা কি পতঙ্গ আর একটা ছোট পতঙ্গকে শরীর-নিঃসৃত রসে অল্পে-অল্পে অচেতন ক'রে ফেলছে,

বড় পতঙ্গটা হাতে তুলে নিয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখে তাঁর মনে হ'ল সেটায় শুঁড়ের মত ছুঁচলো একটা প্রত্যঙ্গের খানিকটা অংশ ফাঁপা—একপ্রকার বিষাক্ত রস শরীরের মধ্যে থেকে বার হয়ে ঐ ফাঁপা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসবার বেশ সুন্দর, সুনির্দিষ্ট বন্দোবস্ত আছে।···

লোকনাথের মন একমুহূর্তে আবার অন্ধকার হয়ে গেল। নিষ্ঠুর ধ্বংসের এ কি কৌশলময় আয়োজন! মূর্খ ভক্তিশাস্ত্রকার, এই বুঝি তোমার দয়ালু ঈশ্বর?

বসন্তের বাকী দিনগুলো এবং গ্রীষ্মকালটা এই ভাবেই কেটে গেল। অবশেষে একদিন কৌতূহলপ্রদ এক ঘটনায় লোকনাথের দুঃখ, ব্যাকুলতা ও সন্দেহের এক অপ্রত্যাশিত রকমের উপসংহার ঘটল। সে সময়টা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। বহুদিন বৃষ্টি হয়নি, অসহ্য রৌদ্রতাপে মাঠের ঘাসগুলো জ্ব'লে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, বাতাস আগুনের ঝলকের মত তপ্ত।

বৈকালের দিকে কিন্তু খুব জোরে বাতাস বইতে লাগল, এবং একটু পরে ঈশান কোণে খুব মেঘ জমল। নদীর বড় বাঁকটায় বড়-বড় ঘাসের মধ্যে শুয়ে লোকনাথ পূর্ব দিক চক্রাবালে নবীন বর্ষার মেঘস্তূপের সজ্জা একমনে লক্ষ্য করছিলেন, হঠাৎ তাঁর ডান হাতে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মাঝখানে কিসে যেন কামড়ালে। সেদিকে চোখ ফিরিয়ে হাত টেনে নিতেই দেখতে পেলেন একটা শঙ্খচূড় সাপ ফণা তুলে হাতের সেখানে মুহূর্তে আর একটা ছোবল মারবার উপক্রম করতে গিয়ে হঠাৎ মাথা নীচু ক'রে লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হল। কি করছি, না ভেবেই লোকনাথ সাপটার অদৃশ্যমান পুচ্ছটা তাড়াতাড়ি হাতবাড়িয়ে চেপে ধরতে গিয়ে একগোছা ঘাস মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলেন, সাপটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

লোকনাথ তাড়াতাড়ি পরিধেয় বসন ছিঁড়ে হাতের কব্জিতে ও বাহুতে বাম হাতে পাকিয়ে-পাকিয়ে দু'টো বাঁধন দিলেন, বাঁধন তেমন শক্ত হ'ল না, অনেকটা আল্‌গা রয়ে গেল। তাঁর মনে হল শ্বেত আকন্দের মূল সর্পাঘাতের মহৌষধ। মাঠের ইতস্ততঃ শ্বেত আকন্দের সন্ধানে গেলেন, সে গাছ চোখে পড়ল না···হাতটা যেন অবশ হয়ে আসছে বলে তাঁর মনে হ'ল।

বিষ তবে নিশ্চয়ই উপরে উঠেছে···লোকনাথ সম্ভব-অসম্ভব সব স্থান খুঁজতে লাগলেন, আরও দু'একটা সর্পাঘাতের ঔষধ মনে আনবার চেষ্টা করলেন—কুসুম ফুলের বীজ, রক্তচন্দনের ছাল, ইত্যাদি কোনটাই হাতের কাছে নেই।

এদিক্ ওদিক্ খানিকক্ষণ খুঁজতে-খুঁজতে লোকনাথের মনে হ'ল তিনি আর দাঁড়াতে পারছেন না, চোখে অন্ধকার দেখে একটা ঝোপের কোলে তিনি ব'সে পড়লেন—অসহ্য-দংশন বিষে তাঁর সর্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করছে।

ধীরে-ধীরে তাঁর মনের নিভৃততম অংশ কিসের আলোকে যেন আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল···আসন্ন মরণের বজ্রকঠোর নির্মল করাল রৌদ্র সুর, দূরশ্রুত মুক্তস্রোত গিরি নির্ঝরের তালে যেন তাঁর কানে মুক্তির গান বাজাচ্ছে···তোমার পাষাণকারা এবার ভাঙ্‌ব—তোমার চোখের বাঁধন খুলব···

* * *

হে অনন্ত দেব, মহাব্যোমের অনন্ত শূন্যতার পারে কোন্ সুদূরতম, অপ্রকল্প রাজ্যের জ্যোতিঃসিংহাসন থেকে তুমি তোমার এই ব্যাকুল দীনতম প্রজার উপর লক্ষ্য রেখেছ? তাই বুঝি সেদিন জলের মধ্যে আমায় পথ দেখিয়েছিলে? সেদিন তোমায়ও চিনিনি, তোমার পথও চিনিনি—আজ বোধ হয় বুঝেছি—হৃদয়ের অন্তরে সেই তুমি আমার আত্মা, পৃথিবী অপেক্ষা মহান্, অন্তরীক্ষের অপেক্ষা মহান্, স্বর্গের অপেক্ষা মহান্, সর্বভূতের অপেক্ষা মহান্···মেঘ যেমন ওষধিগণের উপজীব্য তুমি তেমনি আমার প্রাণধারার উপজীব্য। তুমি আমার প্রাণের কথা শুনতে পাও?

বেশ, তা হলে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'লো, দেব, এই অন্ধ রাজ্যের পারে, এই দিগন্তসীমার পারে, জীবন-মহাসমুদ্রের পারে।···কোথায় তোমার চিরবিকশিত জ্যোতিঃ প্রভাত, কোথায় দৈন্য-মুক্ত জ্ঞান-সম্পদের অপরাজিত আয়তন দেখব···

হঠাৎ লোকনাথের মরণাভিভূত দার্শনিক বুদ্ধি মাথা তুলে ব'লে উঠল তোমার বিচারশক্তি চ'লে যাচ্ছে,—বিষের যাতনায় যখন তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসছে, তখন তোমার যে বিচার, সে কি বিচার? মনের এই তরল ভাব দুর্বলতার পরিচায়ক, মন থেকে দূর ক'রে দাও···

লোকনাথ কিছুই ঠিক করলেন না, তাঁর মন আর যুদ্ধ করতে পেরে উঠছিল না ·আফিমের নেশার মত মরণের তন্দ্রা ক্রমেই গাঢ় হয়ে এল···

* * *

কোথায় কোন্ দুটি বালক-বালিকা এক ক্ষুদ্র গ্রামের গ্রামসীমায় বুনো খেজুরের ঝোপে-ঝোপে তলায়-পড়া খেজুর কুড়িয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে··· সময়ের দীর্ঘ দিন পাষাণ অলিন্দের দূরতম সীমার তাদের ছোট্ট-ছোট্ট পা'গুলির অস্পষ্ট শব্দ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে আসছে—ওধারে তারা দু'টিতে ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে···

এক গ্রাম্য বনের মৌ-গাছের ডাল থেকে দু'জনে মৌ ফুল পেড়ে খাচ্ছে, বালিকাটি ভাল রসাল ফুল পেলেই বালকের হাতে তুলে দিচ্ছে—এই যে এটি, কি মিষ্টি দেখ, দেখ তুমি খেয়ে···

নীল ব্যোমপথে দীর্ঘদেহ, শ্বেতশ্মশ্রু সমিধ্‌বাহী, জ্যোতির্ময় ঋষিরা চলেছেন—তাঁদের মধ্যে কে যেন পিছন ফিরে সঙ্গীদের নিকট প্রস্তাব করছেন—ওহে সঙ্গীগণ আমাদের কমণ্ডলু যা দিয়ে পূর্ণ করেছি, এস তা দিয়ে পুনর্বার নূতন জল সংগ্রহ করি। এতদিন ভ্রমণের পর মিষ্টজলের ফেলে উৎসের সন্ধান পেয়েছি। তাঁদের কমণ্ডলু থেকে কালি-গোলার মতো কি ঝরে পড়ছে!

পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে কে খুব মেরেছে তার এলোমেলো চুলগুলো মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে—সে কেঁদে ফুঁপিয়ে বলছে—কেন তুমি মারবে? কেন আমায় মারবে তুমি?···এ পাড়ায় আসি বলে? আর কক্‌খনো আসব না···দেখে নিও, আর কক্‌খনো যদি আসি···

লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টি বিরাট বিশ্বের উপর সেই ভাবেই মুগ্ধ আবদ্ধ রইল, বহু বৎসর পূর্বের শৈশবকালে গ্রামসীমার মাঠে তাঁর অজ্ঞান শিশু নয়ন দু'টি যে ভাবে আবদ্ধ রইত···প্রায়ান্ধকার জগৎটা আবার একটা বিরাট প্রশ্নের রূপ পরিগ্রহ ক'রে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল···প্রশ্নের কোন উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া গেল না···

কর্ণপুর সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন।

সংসারে তাঁহার কেহই ছিল না। স্ত্রী পাঁচ-ছয় বছর মারা গিয়াছে, একটি দশ বৎসরের পুত্র ছিল, সেও গত শরৎকালে শারদীয়া পূজার অষ্টমীর দিনে হঠাৎ বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছে। সংসারের অন্য বন্ধন কিছুই নাই। বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল, সেগুলি সব জ্ঞাতিভ্রাতাদের দিয়া অত্যন্ত পুরাতন তালপত্রে কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ জীর্ণ তসরের পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া কর্ণপুর পদব্রজে বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কর্ণপুরের জন্মপল্লী অজয় নদের ধারে। তিনি পরম বৈষ্ণবের সন্তান। অজয়ের জলের গৈরিক দুই তীরের বন-তুলসী মঞ্জরীর ঘ্রাণে কোন্ শৈশবেই তাঁর বৈষ্ণব ধর্মে মানসিক দীক্ষা হয়। তিনি গ্রামের টোলে উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। দুই-একটি ছাত্রকে কিছুকাল স্মৃতি ও বৈদ্যকশাস্ত্রও পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রেরা দেখিত তাহাদের অধ্যাপক মাঝে-মাঝে ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া সমস্ত দিন কাঁদেন। পাগল বলিয়া অখ্যাতি রটাতে ছাত্রেরা ছাড়িয়া গেল, প্রতিবেশীরা তাচ্ছিল্য করিতে শুরু করিল, তাহার উপর প্রথমে স্ত্রী, তৎপরে পুত্রের মৃত্যু। সংসারের উপর কর্ণপুর নিতান্তই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

যাইবার সময় জ্ঞাতি-ভ্রাতা রসরাজ আসিয়া মায়াকান্না কাঁদিল, গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বহুদিন ধরিয়া কর্ণপুরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার পর হইতেই সে তাঁহাকে বাজিজ্ঞানে শত হস্ত দূরে রাখিয়া আসিতে ছিল। আজ যখন সে দেখিল কর্ণপুর সত্য-সত্যই বাহির হইয়া যাইতেছেন ফিরিবার কোন আশঙ্কাই নাই, তখন সে আসিয়া মহাপীড়াপীড়ি শুরু করিল —আর কয়েকটা মাস থাকুন, যে করিয়া পারি ঋণটা শোধ করিয়া ফেলি, কারণ ঋণ পাপ, ইত্যাদি।...উদারচিত কর্ণপুর এসব কপট প্রবন্ধ বুঝিলেন না। তিনি রসরাজকে তাঁহার প্রার্থনা মত তাল-দীঘির পাড়ের আশুধান্যের একটুকরা উৎকৃষ্ট ভূমি দানপত্র করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে বলিলেন—এক কড়া কড়ি আন ভায়া, গ্রহণ করিয়া তোমায় ঋণমুক্ত করি।

আপনার বলিতে কেহ না থাকায় গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার

জন্য সত্যকার ভাবনা কেহই ভাবিল না। শৈশব-স্মৃতির প্রথম দিনটি হইতে পরিচিত মাটির চণ্ডী-মণ্ডপ, স্বহস্তরোপিত কত ফল-ফুলের গাছ, কত খেলাধূলার জন্মভিটার আঙ্গিনা পিছনে ফেলিয়া চলিলেন, ফিরিয়াও চাহিলেন না, শুধু গ্রামসীমার অজয়ের ধারে গিয়া কর্ণপুর একটুখানি দাঁড়াইলেন।...অজয়ের ধারে প্রাচীন শিরীষ গাছের তলে গ্রামের শ্মশান, কয়েকমাস পূর্বে তিনি মাতৃহীন বালক পুত্রটিকে এইখানে দাহ করিয়া গিয়াছেন। অজয় আর বাড়ে নাই, সুতরাং সে চিতার চিহ্ন এখনও একেবারে বিলীন হয় নাই। তার কচিমুখের অবোধ হাসিটুকু মনে পড়িয়া গেল, মৃত্যুর পূর্বে শ্বাসকষ্টে বড় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সে সময়কার তার আতঙ্কে আকুল অসহায় দৃষ্টি মনে পড়িল। কর্ণপুর অবাক হইয়া অজয়ের ওপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।...ধু-ধু গৈরিক বালুরাশির শয্যায় জীর্ণ-শীর্ণ নদ অবসন্ন দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, উপরে এখানে-ওখানে এক-আধটা দিকহারা মেঘশিশু আকাশের কোন কোণ হইতে বাহির হইয়া তখনই আবার সুদূর অনন্তের পথে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, কোথাও কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে না। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। পৃষ্ঠের পুঁটুলিতে কয়েকখানি বস্ত্র, সামান্য কিছু তণ্ডুল ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, দক্ষিণ হস্তে মাধবীলতার আঁকাবাঁকা একগাছি দৃঢ় যষ্টি; বামহস্তে একটি পিত্তলের ঘটি মাত্র লইয়া অজয় পার হইয়া কর্ণপুর পশ্চিম মুখে যাত্রা করিলেন। জীবনে যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু পরিচিত ছিল—সবই এপারে রহিয়া গেল।

দিনের পর দিন তিনি অবিশ্রান্ত পথ চলিতে লাগিলেন। এক-একদিন সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামের চটিতে, নয়তো কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইতেন। গ্রামপথে চলিবার সময় লোকে আদর করিয়া গৃহত্যাগী সৌম্য-দর্শন ব্রাহ্মণের পুঁটুলি ভরিয়া খাদ্যদ্রব্য দিত, পিতলের ঘটিটা পূর্ণ করিয়া নির্জলা খাঁটি দুগ্ধ দিত; তিনি কোন দিন তাহার সামান্য অংশ খাইতেন, কোন দিন কোন দরিদ্র পথযাত্রী ভিক্ষুক বা কোন বুভুক্ষু কুকুরকে খাওয়াইতেন। কত গ্রাম, হাট, মাঠ, কত সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের গঞ্জ, কত কত নদী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে-যাইতে অবশেষে তিনি বসতি-বিরল খুব বড়-বড় নির্জন মাঠ ও বনজঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলেন। চিরকাল

নিতান্ত ঘরোয়া-ধরণের গৃহস্থ, বিদেশে কখনই বাহির হন নাই; সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার পরই দিগন্ত-বিস্তৃত জনহীন প্রান্তরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত; কর্ণপুর একস্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে লোকালয়ের অন্বেষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন—লোকালয় মিলিত না, তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইত। যদি কোন বন্যজন্তু বা কোন দস্যু আসিয়া আক্রমণ করে!...পর-ক্ষণেই ভাবিতেন, আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ, দস্যুতে আমার কি কাড়িয়া লইবে? অজয়ের ধারের বৃদ্ধ শিরীষ বৃক্ষতলে এক ধূসর হেমন্ত-সন্ধ্যার কথা মনে পড়িলেই অমনি কর্ণপুরের মন হইতে বন্যজন্তুর ভয় দূর হইত। বনের পথে চলিতে-চলিতে অন্য খাদ্য মিলিত না, কোন দিন বুনো কুল, মহুয়া ফুল, কোন দিন বা ছোট তালচারার নবোদ্গত পত্রকোরক খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন; অঞ্জলি পুরিয়া পার্বত্য নদীর জলধারা পান করিতেন। মাঝে-মাঝে আবার গ্রামও পাইতেন।

সন্ধ্যার সময় সেদিন তিনি একটি তালবনে আশ্রয় লইলেন। নিকটে লোকালয় নাই, পাথুরে মাটিতে অভ্রকণিকা চিক্ চিক্ করিতেছে, একটু পরে তালবনের পিছনে সূর্য ডুবিয়া গেল।...সন্ধ্যার আকাশে পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ।

সেদিন পথে এক ভিক্ষুকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হইয়াছিল, তিন-চার মাস পূর্বে জীবিকার চেষ্টায় বাড়ীর বাহির হইয়া কিছু উপার্জন করিয়া সেদিন সে বাড়ী ফিরিতেছে। বাড়ীতে তার ছোট-ছোট মেয়ে দুটি ও একটি ছেলে আছে, তাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রবাসের কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে নাই। ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে রাঙা-রাঙা পাথরের নুড়ি, নূতন ধরণের পাখীর রঙিন পালক, নানা তুচ্ছ জিনিস সযত্নে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে—বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের খেলনা করিতে।...কর্ণপুরের মনে হইয়াছিল সেদিন—দূর, মূর্খ সংসারাসক্ত জীব!...আজ কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে জাগিল ঐ ভিক্ষুকটা তাঁহার চেয়ে সুখী। সে তো তবুও কতদিন পরে গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার গৃহ কোথায়?...পরক্ষণেই দুর্বলতাটুকু বুঝিয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইয়া ভাবিলেন, ভগবান দয়া করিয়াই সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া লইয়াছেন। ভালই তো, ইহাতে মন খারাপ করিবার কি আছে?

তাহার পর বসিয়া-বসিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তালবনের মাথার পঞ্চমীর চাঁদের দিকে চাহিয়া বার বার গাঢ়স্বরে শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে-করিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছিল। রাত্রির পাতলা জ্যোৎস্নায় মাঠের নির্জনতায়, শ্লোকের পদলালিত্যে তাঁহার মনে কি একটা অব্যক্ত ব্যথা যেন ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। সেটাকে চাপা দিবার জন্য তিনি বসিয়া ইষ্ট-দেবতার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইষ্টদেবতার মূর্তি কল্পনা করিতে গিয়া কর্ণপুরের মনে হইল, ঐ অনন্ত আকাশের মত উদার-প্রাণ, ঐ জ্যোৎস্নার মত অনাবিল, চারিধারের প্রান্তর-বনের কত শান্ত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্লোকের ললিত শব্দের মত তাঁর বাণী মধুর, শ্যামায়মান বনভূমির মতই তাঁর স্নিগ্ধ কান্তি···কিন্তু তাঁহার মুখটি কল্পনা করিতে গিয়া কেমন করিয়া কর্ণপুর বার-বার তাঁহার মৃতপুত্রের মুখটিই ভাবিতে লাগিলেন। তাহাকে দাহ করিবার সময় হইতে কর্ণপুর সে মুখটি কখনই ভোলেন নাই, মনে কেমন আঁটিয়া ছিল। সেই মুখ ছাড়া অন্য কোন মুখ তাঁহার ভাল লাগে না। নিজের কাছে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিতে চাহিলেও কর্ণপুরের মনের গোপন কোণে একথা জাগিতেছিল, ইষ্টদেব যদি তাঁর পুত্রেরে রূপ ধরিয়া দেখা দেন, তবে না সুখ! যদি কখনও দেখা পান, তবে যেন পুত্রের সেই রূপেই পান।

শেষ রাতের স্বপ্নে কর্ণপুর দেখিলেন, জ্যোৎস্না দিয়া গড়া দেহ তাঁরই ছেলেটি আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে।···তাঁর মৃতপুত্রের মুখটি খুব সুশ্রী ছিল, তবুও তাহার মুখের যেখানে যাহা কিছু ছোটখাট খুঁত ছিল, সেই সুন্দর অতি-প্রিয় খুঁতগুলি ঠিক সেই ভাবেই আছে। বাম ভুরুর উপরে শান্ত-শিষ্টতার জয়-তিলকাটি এখনও তো বিলীন হয় নাই, সেই রকম পাগলের হাসি।···আস্তে-আস্তে সে তাঁর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি ডাক দিল—বাবা! অনেকদিন-হারা পুত্রকে ক্ষুধার্ত ব্যগ্র দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতে গিয়া কর্ণপুরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলেন সকাল তো হইয়াছেই, তালবনের মাথায় রৌদ্রও উঠিয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া তিনি পুনরায় পথ চলিতে শুরু করিলেন। পথে কয়েকখানা গ্রাম পাইলেও তিনি কোথাও বিলম্ব করিবেন না। সারাদিন পথ চলিবার পরে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দূর হইতে একটি গ্রাম দেখা গেল।

অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় সম্মুখে লোকালয় দেখিয়া কর্ণপুরের মনে বড় স্বস্তি-বোধ হইল। আশ্রয় স্থান সন্ধানে তিনি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামপ্রান্তের প্রথম দুই-চারিখানা বাড়ী ছাড়াইয়া গ্রামের ভিতর অল্প-দূর অগ্রসর হইতে-হইতে গ্রামের দৃশ্য যেন কর্ণপুরের কাছে কেমন ঠেকিল। কোন গৃহস্থ-বাড়ীতেই কোন সাড়াশব্দ নাই, কোন বাড়ী হইতেই রন্ধনের ধূম উঠিতেছে না, পথে পথিকের যাতায়াত নাই, জনপ্রাণী চোখে পড়ে না, অধিকাংশ গৃহস্থবাটির বাহির দরজা খোলা—খোলা দরজা দিয়ে চাহিলে বাটির ভিতর একখানা কাপড় পর্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য বোধ হইলেও সারাদিনের পথশ্রমে কর্ণপুর এত ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে—অতশত ভাবিবার, বুঝিবার বা ব্যাপার কি, অনুসন্ধান করিবার অবস্থা তাঁহার ছিল না। তিনি সম্মুখে এক গৃহস্থ বাটীর বাহিরের ঘরে গিয়া উঠিলেন ও মোট পুঁটুলি নামাইয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। দণ্ড দুই কাটিয়া গেল, অথচ বাড়ীর ভিতর হইতে কোন মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিল না। সম্মুখের পথ দিয়া এই দুই দণ্ডের মধ্যে মানুষ তো দূরের কথা একটি গৃহপালিত পশুকে পর্যন্ত যাইতে দেখিলেন না। ততক্ষণে তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন, ভাবিলেন এই বাড়ীটার মধ্যেই ঢুকিয়া দেখা যাউক, লোক-কি করিতেছে।

বাড়ীর মধ্যে পায়ে-পায়ে ঢুকিয়া যাহা তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, ঘরের মধ্যে তিনটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া আছে, মৃত্যু অনেকক্ষণ পূর্বে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া দেখিলেন, গৃহতলে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া আছে, মৃতদেহের পাশে একটি অনিন্দ্যসুন্দর গৌরবর্ণ শিশু খল্‌খল্ করিয়া শয্যার পাশে বেড়াইতেছে ও ঘরের আড়া হইতে ঝুলিয়া পড়া একগাছি মাকড়সার জালের অগ্রভাগে দোদুল্যমান একটি মাকড়সার দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাইতেছে এবং আপন মনে হাসিতিছে।

ভাবগতিকে কর্ণপুর অনুমান করিলেন, কোন ভীষণ মহামারীর আর্বিভাবে দুই একদিনের মধ্যে গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ঘরে-ঘরে মৃতদেহ রাশি হইয়া আছে, সৎকারের মানুষ নাই, দেখিবার মানুষ নাই, হয়তো যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছে।

কর্ণপুরকে দেখিয়া শিশুটি একগাল হাসিয়া হাত বাড়াইল। তাহার মা যে খুব বেশীক্ষণ মারা যায় নাই, ইহা দুইটি বিষয়ে তাঁহার অনুমান হইল। প্রথমতঃ, এই ক্ষুদ্র শিশুটি ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হইয়া পড়িলে এতক্ষণ এরূপ হাসিত না, কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার মা জীবিতাবস্থায় তাহাকে স্তন্য পান করাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মৃতদেহের এতটুকু বিকৃতি হয় নাই, শিশুর মা যেন এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আসন্ন মৃত্যু ও ঘনীভূত বিপদের সম্মুখে পড়িয়াও অবোধ শিশুর এই নিশ্চিন্ত হাসি ও ক্রীড়া দেখিয়া কর্ণপুরের মনে হইল, বাল্যকালে অজয়ের তীরের বনে তিনি এক প্রকার পতঙ্গকে লক্ষ্য করিতেন, সূর্যের আলোতে খেলা করিবার অধীর আনন্দে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে কোথা হইতে রাশি-রাশি আসিয়া জুটিত এবং খানিকক্ষণ রৌদ্রে উড়িয়া নাচিয়া খেলা করিবার পর রৌদ্র বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দ-নৃত্য শেষ করিয়া মাটি ছাইয়া মরিয়া থাকিত।···কর্ণপুরের মন মমতায় গলিয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন। ঘটিতে জল ছিল, বাহিরের ঘরে আসিয়া গণ্ডুষ করিয়া শিশুর মুখে ধরিতে পিপাসার তাড়নায় সে আগ্রহের সহিত উপরি-উপরি বহু গণ্ডুষ জল খাইয়া ফেলিল।

তৎপরে তিনি শিশুর মাতার মুখে শুষ্ক তৃণ জ্বালাইয়া অগ্নি প্রদান করিলেন, মস্তকের কাছে কর রাখিয়া বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলেন। এইরূপে সংক্ষিপ্ত সৎকার কার্য শেষ করিয়া তিনি শিশুকে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে সে-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

কর্ণপুর আবার পৈতৃক ভিটাতে ফিরিয়া আসিলেন। শুধু ফিরিয়া আসা নহে, তিনি এখন পুরামাত্রায় সংসারী। জ্ঞাতি রসরাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিবাদ করিয়া বিষয়সম্পত্তি ও ধান্য-রোপণের ভূমি কাড়িয়া লইয়াছেন, ব্রাহ্মণ অধমকর্ণকে দু'বেলা তাগাদা করেন। দুপুর-রৌদ্রে উত্তরীয় মাথায় জড়াইয়া নিজের ক্ষেত্রে-ক্ষেত্রে ধান্য বপনের তদারক করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান বৃক্ষবাটিকায় স্বহস্তে বহুদিন পরে ফল-ফুলের চারা রোপণ করেন।

কুড়াইয়া পাওয়া সেই শিশুটি এখন তাঁহার চক্ষের পুতুলি। তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারেন না। সমস্ত সকালটি যেই বহির্বাটীতে বসিয়া শিশুকে পথের লোকজন, গরু, শিবিকা-যাত্রী, নবিবাহিত দম্পতি—এই সব দেখাইয়া তাহাকে আমোদ দেন। লোকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া

বলে, কর্ণপুরের কাণ্ড দেখ, তীর্থের পথ হইতে এক বন্ধন জুটাইয়া আনিয়াছে। স্তুত সম্পত্তি রসরাজ পাড়ায়-পাড়ায় বলিয়া বেড়ায়, মর্কট-বৈরাগ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে চৈতন্য মহাপ্রভু যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা আর মিথ্যা হইবার? হাতের কাছে দেখিয়া লও প্রমাণ। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুলোকে কর্ণপুরের পুনরাগমনে আনন্দ প্রকাশ করেন।

কর্ণপুর এসব কথা শুনিয়াও শোনেন না। শিশু আজকাল ভাঙা-ভাঙা কথা বলিতে শিখিয়াছে—তাহার মুখে আধ-আধ বুলি শুনিয়া তিনি দ্বাদশ বৎসর পূর্বের অন্তর্হিত আনন্দ আবার ফিরিয়া পান। তারও আগের কথা মনে হয়, যখন তাঁহার নববিবাহিতা পত্নী প্রথম ঘর করিতে আসিয়াছিল। পিতামাতা বর্তমানে প্রথম যৌবনের সেই সুখের দিনগুলো কত প্রভাতের বিহঙ্গকাকলীর সঙ্গে, কত পরিশ্রম-ক্লান্ত মধ্যাহ্নে প্রিয়ার হাতের অন্ন-ব্যঞ্জনের সুঘ্রাণের সঙ্গে, অবসন্ন গ্রীষ্মদিনের শেষে উঠানের পুষ্পভারনত বাতাবী লেবু গাছটির সঙ্গে পুরাতন দিনের কত হাসি-আনন্দের স্মৃতি জড়ানো আছে। তার পরে তাঁহার পুত্রের জন্মোৎসব, স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া কোলের শিশুকে কেন্দ্র করিয়া কত সুখস্বর্গ গড়িয়া তোলা! আবার মনে হয়, জীবনটাকে বিশ বছর পিছু হটাইয়া দিয়া কে যেন পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করাইতেছে।

শিশুকে সামলাইয়া রাখা দায়। অনবরত হামগুড়ি দিয়া দাওয়ার ধারে আসিতেছে—হঠাৎ একবার অত্যন্ত ধারে আসিয়া হাত পিছলাইয়া মুখ থুবড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে বসিয়াছিল—তাড়াতাড়ি আসিয়া কর্ণপুর ধরিয়া ফেলিলেন। কি একটা বিপদ ঘটিবার অজানা ভয়ে পতনোন্মুখ শিশুর অবোধ চক্ষুদু'টি ডাগর হইয়া উঠিয়াছে।···এ নিজের ভালও বুঝে না, এই ভাবনায় তাঁহার মন এই ক্ষুদ্র পাগলের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়।

* * *

বন্ধন এইরূপ করিয়াই জড়ায়। ক্রমে-ক্রমে কয়েক বৎসর হইয়া গেল, শিশু এক্ষণে সাত-আট বৎসরের বালক। তাহার দুষ্টমির জ্বালায় কর্ণপুর দিনে-রাত্রে একদণ্ড শান্তি পান না। এখানকার দ্রব্য ওখানে লইয়া গিয়া ফেলে, কখন কি করিয়া বসে। নিষিদ্ধ কার্য করিতেই তাহার আগ্রহ

সর্বাপেক্ষা বেশী।

বর্ষার দিনে কর্ণপুর তাহাকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া পড়ান। পড়িতে-পড়িতে সে ছুটি লইয়া অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে যায়। অনেকক্ষণ আসে না দেখিয়া কর্ণপুর দাওয়ায় আসিয়া দেখেন—বালক অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে উঠোনের এ প্রান্ত হইতে ওপ্রান্তে মহা খুশির সহিত নাচিয়া বেড়াইতেছে। কর্ণপুর তিরস্কারের সুরে বলেন—ছিঃ বাবা নীলু, দুষ্টুমি ক'রো না। উঠে এসো।···আদর করিয়া বালকের নাম রাখিয়াছেন নীলমণি।

বালক বর্ষণ-ধৌত সুন্দর মুখখানি উঁচু করিয়া হাসিমুখে দাওয়ায় উঠিয়া আসে। শাসন করিতে কর্ণপুরের মন সয়ে না, মনে ভাবেন—কোথায় ছিল এর পাত্তা? সে সন্ধ্যাবেলা যদি উঠিয়ে না আনতাম, মুখে জলের গণ্ডুষ না দিতাম—তবে?···মমতায় তাঁহার মন আর্দ্র হইয়া পড়ে। মুখে তিরস্কার করিতে-করিতে বালকের সিক্তকেশ মুছাইয়া শুষ্কবস্ত্র পড়াইয়া পুনারায় পড়াইতে বসেন।

আবার অন্যমনস্ক হইলে কোন্ ফাঁকে সে বাহির হয়। কর্ণপুর পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন সে দুই হাত জোড় করিয়া মুখ উঁচু করিয়া খড়ের চাল হইতে পতনোন্মুখ এক বিন্দু জল ধরিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। হাত ধরিয়া আবার তাহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনেন।

বালক উত্তমরূপে বোঝে, বাবা তাহাকে কখনো মারিবেন না।

নিজ পুত্রের শোক কর্ণপুর ইহাকে পাইয়া ভুলিয়াছেন। কেবল এক-এক দিন নির্জন দ্বিপ্রহরে তাহার মুখের হাসি দূরাগত করুণ সঙ্গীতের মত মনে আসে। মনের ইতিহাসে এই বালকের সে অগ্রজ, রৌদ্রভরা দ্বিপ্রহরে সে-ই আসিয়া তাহার দাবী জানায়। কর্ণপুর উঠিয়া গিয়া নিদ্রিত বালকের চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাইয়া দেন। মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন।

শীঘ্রই কিন্তু বালককে লইয়া তাঁহার বড় বিপদ হইল। এত বেশী এবং এত বিনাকারণে সে মিথ্যা কথা বলে, যে কর্ণপুর রীতিমত বিপন্নবোধ করিতে লাগিলেন। নানা রকমে মিথ্যা-কথনের দোষ ও সত্য-ভাষণের পুরস্কার সম্বন্ধে বহু গল্প উপদেশ বলিয়াও তাহাকে সংশোধন করিতে পারিলেন না। তাঁহার কাছে সে অনেক কথা আজকাল লুকায়—আগে

তাহা করিত না। কর্ণপুর ইহাতে মনে-মনে কষ্ট পান। তাহা ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিবেশীদের নিকট হইতে আসে। এ-গাছের লেবু, ও-গাছের আম ছিঁড়িয়া আনিয়াছে, অমুকের ছেলেকে মারিয়াছে। কর্ণপুর বসিয়া-বসিয়া ভাবেন, কোন্ বংশের ছেলে, কি কুলগত স্বভাবচরিত্র লইয়া জন্মিয়াছে কে জানে! তাঁহার আপন ছেলের বেলায় এগারো বৎসরের কোন অভিযোগ তাঁহাকে শুনিতে হয় নাই—কিন্তু এ বালক তাঁহাকে এ কি মুস্কিলে ফেলিল?…ধর্মভীরু সরল-স্বভাব কর্ণপুর বালকের এসব ব্যাপারে মনে-মনে বড় ব্যথিত হন। তাহার ভবিষ্যৎ কি হইবে, ভাবিয়া সময়-সময় ভীত হইয়া পড়েন। বালকস্বভাবসুলভ চপলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াও মনে-মনে অস্বস্তি বোধ করেন; ভাবেন—উঠন্ত মূল পত্তনেই চেনা যায়—কোন্ বংশের ছেলে ঘরে আসিল! কি জানি গতিক কি দাঁড়াইবে?

অন্য সময় বসিয়া-বসিয়া ভাবেন, তাঁহার অবর্তমানে বালকের ভরণ-পোষণের কি হইবে? যদি মানুষ করিয়া দিয়াও মারা যান, তাহা হইলেও একটা এমন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে চাহেন, যাহাতে তাহার ভবিষ্যতে সাংসারিক কষ্ট না ঘটে। কোন্ জমির কি ব্যবস্থা করবেন, কুসীদ ব্যবসায় করিলে কিরূপ উপার্জন হইতে পারে, ইত্যাদি চিন্তায় কর্ণপুর ব্যস্ত থাকেন।

এক-এক সময় হঠাৎ যেন আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়া যায় বিষয় চিন্তা!

মনে-মনে ভাবেন এ সব কি আসিয়া জুটিল? সারাদিন একদণ্ড ইষ্ট-চিন্তা করিতে পাই না, প্রৌঢ় বয়সে এ দুর্দৈব মন্দ নয়!

প্রতিবেশী রঘুনাথ ভট্টাচার্য অভিযোগ করিলেন, কর্ণপুরের পালিতপুত্র তাঁহার বাড়ীর ময়না পাখীর খাঁচা খুলিয়া পাখী উড়াইয়া দিয়াছে!

বালক বাড়ী আসিলে কর্ণপুর জিজ্ঞাসা করিলেন—নীলু, শুনছি তুমি নাকি ওদেরপাখী উড়িয়ে দিয়ে এসেছ?

বালক বলিল—না বাবা—আমি না…

একে অপরাধ লঘু নহে, তাহার উপর তাঁহার মনে হইল এ মিথ্যা কথা বলিতেছে। কর্ণপুরের ধৈর্যচ্যুতি হইল। তাহাকে খুব প্রহার করিলেন।

তাহার বাবা তাহাকে মারিবেন, বালক ইহা ভাবে নাই—কারণ বাবার হাতে কখনো সে মার খায় নাই। তাহার চোখের সে বিস্ময় ও ভয়ের

দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া দরজার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—যাও, বাড়ী থেকে বেরোও—দূর হও—মিথ্যা কথা যে বলে তার স্থান নেই আমার বাড়ী…

বালকের ভরসা-হারা দৃষ্টি তাঁহাকে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধিল. কিন্তু তিনি দৃঢ়-হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

অর্ধদণ্ড পরে তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বহির্দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সেখানে বালক নাই। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। বাড়ীর এদিক-ওদিক খুঁজিলেন—কোথাও দেখিতে পাইলেন না। নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের বাড়ী খুঁজিলেন—কেহ তাহাকে দেখে নাই।

কর্ণপুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সন্ধ্যাকাল—বেশীদূর কোথায় গেল? তিনি নিজের হাতে রন্ধন করিতেন—বালক ভর্ৎসনা সহ্য করিয়াছে, তাহার জন্য দুই-একটা, সে যাহা খাইতে ভালবাসে, এমন ব্যঞ্জন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন—আজ রাত্রে মিষ্ট কথায় কি-কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। বালককে না পাইয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তন্ন তন্ন করিয়া পাড়ার সব বাড়ী খুঁজছিলেন; কেহ সন্ধান দিতে পারে না। রঘুনাথ ভট্টাচার্যের পুত্র শিবানন্দ তাঁহার কাছে বৈদ্যক-শাস্ত্র অধ্যায়ন করিত। সে তাঁহাকে বলিল—তিনি রন্ধন করুন, সে আর একবার ভাল করিয়া সকল স্থান খুঁজিতেছে। ইতিমধ্যে যদি বাড়ী ফিরিয়া থাকে দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কোথায়? সে বাড়ী আসে নাই।

কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন উঠানের পাশের গোশালার মধ্যে শিবানন্দ বার-বার বালকের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখেন, গোশালায় রক্ষিত তৃণরাশির উপর বালক কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি—শিবানন্দের ডাকাডাকিতে নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া ব্যাপার কি ঘুমের ঘোরে হঠাৎ না বুঝিতে পারিয়া, অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছে। কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া আনিলেন। পরে খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া ছিলেন। অভিমানে বালক তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিল না—বহু আদরের কথা বলিয়া ও কাটোয়ার

ফেণী বাতাসা কিনিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়া কর্ণপুর তাহাকে প্রসন্ন করিলেন।

সেদিন রাত্রে কর্ণপুর মনে-মনে ভাবিলেন—কাল হইতে ইহাকে একটু-একটু ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাই, তাহা হইলে ক্রমে-ক্রমে এ স্বভাবটা শোধরাইয়া যাইবে।

পরদিন হইতে তিনি তাহাকে অবসর মত নানা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাইতে আরম্ভ করিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা মুখস্থ করাইয়া দিলেন, প্রতি সকালে উঠিয়া বালককে তাঁহার সম্মুখে আবৃত্তি করিতে হয়। ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা পড়িয়া শোনান। সন্ধ্যার সময় বসিয়া বালককে ডাকিয়া বলেন—ঠাণ্ডা হয়ে বসো, একটা গল্প করি।

পরে মাধবেন্দ্রপুরী উপাখ্যান বর্ণনা করেন।

মহাভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গিয়া শৈল পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দ কুণ্ডের বৃক্ষতলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জনে বসিয়া আছেন, এক গোপাল বালক একভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া আসিয়া পুরীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, তুমি কাহারও কাছে কিছু চাও না কেন? বোধ হয় সারাদিন উপবাসী আছ—এই ধরো দুগ্ধ। পুরী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়া জানিলে আমি উপবাসে আছি? বালক মৃদু হাসিয়া বলিল, গ্রামের মেয়েরা জল লইতে আসিয়া তোমাকে দেখিয়া গিয়াছে, এখানে কেহ উপবাসী থাকে না; তাহারাই এই দুগ্ধভাণ্ড দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। ভাণ্ড রহিল, গরু দুহিয়া আসিয়া লইয়া যাইবে।

বালক চলিয়া গেল, কিন্তু ভাণ্ড লইতে আর ফিরিল না।···রাত্রে পুরী স্বপ্ন দেখিলেন, সেই বালক আসিয়া নিকটবর্তী এক বনে তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া বলিতেছে, দেখ পুরী, আমি বহুদিন হইতে এই বনের মধ্যে আছি। যবনের আক্রমণের ভয়ে আমার সেবক এইখানে আমায় ফেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া গিয়েছে, কেহ দেখে নাই; শীত-বৃষ্টি-দাবানলে বড় কষ্ট পাই, তুমি আমার একটা ব্যবস্থা ক'রো। অনেকদিন হইতে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছি—মাধব আসিয়া কবে আমার সেবা করিবে। মাধবপুরী মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে শ্রীগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিলেন।

পর বৎসর নীলাচল হইতে মলয়-চন্দন আনিয়া বিগ্রহের অঙ্গে লেপন করিয়া দিবেন ভাবিয়া ঝাড়খণ্ডের পথে পুরী নীলাচল যাত্রা করিলেন। যাইতে-যাইতে রেমুনাতে আসিয়া রাত্রিবাসের জন্য তথাকার গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, ঠাকুরের ভোগের সময় উপস্থিত। কথায়-কথায় পুরী মন্দিরের পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপীনাথের ভোগের কি ব্যবস্থা আছে? পূজারী বলিল গোপীনাথের ভোগের জন্য অমৃতকেলি নামক ক্ষীর দ্বাদশমুখপাত্র ভরিয়া সন্ধ্যার পর দেওয়া হয়, অমৃতসমান তাহার আস্বাদ—গোপীনাথের ক্ষীর বলিয়া তাহা প্রসিদ্ধ—অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। কথা বলিতে বলিতে ভোগের শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পুরী মনে-মনে ভাবিলেন, অযাচিতভাবে কিছু ক্ষীর প্রসাদ পাওয়া যায় না? তাহা হইলে কিরূপে আস্বাদ জানিয়া ঐরূপ ভোগ বৃন্দাবনের মঠে শ্রীগোপাল বিগ্রহের জন্য ব্যবস্থা করি। ভাবিতেই পুরীর মনে লজ্জা হইল—শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিয়া তিনি তথা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের হাটে আসিয়া বসিলেন।

অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত-উদাস
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস।

রাত্রে গোপীনাথের পূজারী স্বপ্ন পান—গোপীনাথ স্বয়ং তাহাকে বলিতেছেন, দেখ এই গ্রামের হাটে এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছে। তার নাম মাধবপুরী; তাঁহার জন্য একখণ্ড ভোগের ক্ষীর ধড়ার আঁচলে ঢাকা রাখিয়া দিয়াছি, আমার মায়ায় তোমরা তাহা টের পাও নাই। সে সারাদিন কিছু খায় নাই, শীঘ্র মন্দিরের দ্বার খুলিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে দিয়া এসো।···

পূজারী তখনই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, সত্যই বিগ্রহের ধড়ার অঞ্চলে এক পাত্র ক্ষীর চাপা আছে বটে। কে এমন মহা ভাগ্যবান পুরুষ, যাহার জন্য স্বয়ং ঠাকুর ক্ষীর চুরি করিয়াছেন?···ক্ষীর-পাত্র লইয়া পূজারী গ্রামের হাটে আসিয়া তাহাকে খোঁজ করিয়া বাহির করিলেন। মাধবপুরী একা অন্ধকার হাটচালাতে বসিয়া-বসিয়া নাম জপ করিতেছিলেন। পূজারী তাহার হাতে ক্ষীর-পাত্র তুলিয়া দিয়া পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, ত্রিভুবনে তোমার সমান ভাগ্যবান পুরুষ নাই; পায়ের ধুলা দাও, উদ্ধার হইয়া যাই। তোমার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন।

বালক একমনে শান্তভাবে শোনে।

বার-বার সে তাঁকে প্রশ্ন করে—বাবা, কৃষ্ণ থাকেন? বৃন্দাবনে?

প্রতিদিন এক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া কর্ণপুর বলেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ থাকেন।

ইহার পর সে সুর ধরে—বৃন্দাবন কোথায় বাবা, আমি বৃন্দাবনে যাবো!

কর্ণপুর ভাবিলেন, ইহার কিছুই হইতেছে না দেখিতেছি—আমার পরিশ্রম সবই পণ্ড হইতেছে, এ কিছুই বোঝে না, শুধু বাজে দুষ্টামির দিকে ঝোঁক।

বার-বার তাগাদায় বালক কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। কিছু দিন পরে গ্রামে তাঁহার এক ধান্য-ক্ষেত্রের কার্য ধরাইবার জন্য কর্ণপুরের সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হইল। পূর্ব হইতে ঠিক করিয়াছিলেন, বালক যেরূপ দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চোখে চোখ রাখাই ভালো, এক কাজে দুই কাজ হইবে। কর্ণপুর বলিলেন—চল নীলু, আমরা একদিন বৃন্দাবনে যাই।

উৎসাহে বালকের রাত্রে নিদ্রাবন্ধের উপক্রম হইল। প্রতি রাত্রে সে জিজ্ঞাসা করে, যাইবার আর কয়দিন বাকি। সেদিন রাত্রে শুইয়া সে কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল—আমি কৃষ্ণকে দেখতে যাবো বাবা! কৃষ্ণ কোথায় গরু চরান বাবা? কাল সকালে উঠে দেখতে যাব।

পরদিন স্বীয় ধান্যক্ষেত্র যাইবার সময় কর্ণপুর তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ও ক্ষেত্র হইতে কিছু দূরে পথের ধারে বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন—এখানে চুপ ক'রে ব'সে থাক, কৃষ্ণ এই পথে যাবেন। উঠে এদিক-ওদিক গেলে কিন্তু আর দেখতে পাবে না। চুপ ক'রে ব'সে থাক।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ক্ষেত্রের কার্য শেষ করিয়া কর্ণপুর বালককে লইতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে মহা উৎসাহে বলিল—দেখেছি বাবা, এই মাত্র কৃষ্ণ গরুর পাল চরিয়ে নিয়ে ফিরে গেলেন—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি দেখতে পেলে না!

কর্ণপুর বুঝিলেন, নির্বোধ বালক গ্রামের রাখালদিগকে গরুর পাল লইয়া ফিরিতে দেখিয়াছে। বলিলেন—চলো, বাড়ি চলো—আমি অনেক দেখেছি—তুমি দেখেছ তো, তাহ'লেই ভাল।

তার পরদিন হইতে বালক প্রায়ই বাবার সঙ্গে মাঠে যায় ও পথের

ধারে নির্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া থাকে। রোজই বাপকে অনুযোগ করে, কেন বাবা এখানে সন্ধ্যার সময় থাকো না, কেন দেখো না। কোন-কোন দিন বলে কাল আমার দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, আয় না গরু চরাবি। আমি তোমায় না জিজ্ঞেস ক'রে যেতে পারিনি। যাবো বাবা কাল?

প্রতিদিন এক কথা শুনিয়া কর্ণপুরের মনে ঘটকা লাগিল। বালক যে-ভাবে কথাগুলো বলে তাহাতে মিথ্যা কথা বলিতেছে বলিয়াও মনে হয় না। ব্যাপারটা কি? একদিন বালককে বলিলেন, এবার সে-সময় যেন তাঁহাকে সে ক্ষেত্র হইতে ডাকিয়া লয়, তিনিও দেখিবেন।

সন্ধ্যার পূর্বে বালক ছুটিয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—শীগ্‌গির এসো বাবা, কৃষ্ণ আসছেন।

কর্ণপুর বালকের পিছু-পিছু পথের ধারে দাঁড়াইলেন। কোথাও কেহ নাই, মাঠের ধারে নির্জন পথ···কিন্তু বালক দুই হাত তুলিয়া মহা উৎসাহে বলিল—ঐ দেখ বাবা—গরুর দল। ঐ যে—ঐ দেখ···আসছেন···

কর্ণপুর বলিলেন—কৈ-কৈ···কোন কিছুই তাঁহার চোখে পড়িল না।

বালক বলিল—এইবার দেখছ তো বাবা? দেখেছ কত গরু?···ঐ দেখ কৃষ্ণ কেমন পোশাক প'রে?···

কর্ণপুর বিস্মিত হইলেন। বালকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে উত্তেজিতভাবে জনশূন্য পথের দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিলেন, ইহা মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ নয় তো?

হঠাৎ কিন্তু সেই নির্জন পথে কর্ণপুরের কানে গেল, সত্য-সত্যই যেন একদল গরুর সম্মিলিত পদশব্দ হইতেছে, যেন অদৃশ্য বাঁশীর তান তাঁহার সম্মুখের পথ দিয়া একটানা বাজিতেছে···খুব মৃদু বটে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট।···

অপূর্ব মধুর তান। জীবনে সেরূপ কখনো তিনি শোনেন নাই.

কর্ণপুরের সর্বশরীর শিহরিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বাঁশীর সুর একটানা বাজিতে-বাজিতে দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে দূরে গিয়া আম্‌শিমূলের বনের প্রান্তে মিলাইয়া গেল।

*　　*　　*

বালক বলিল—দেখলে বাবা? আমি বুঝি মিথ্যা কথা বলি?

কর্ণপুর চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সন্ধ্যা হইবার দেরী নাই। রাস্তায় পুরানো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে, এখানে কি? চল-চল জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোন নি? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভাল জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি? যা বলে তা সত্যি হয়? আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু-টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ীর গায়ে টিনের সাইন বোর্ডে লেখা আছে—

তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়।
গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি। আসুন
ও দেখিয়া বিচার করুন। বড়-বড় রাজা-মহারাজার
প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ী।

হাসিয়া বলিলাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত, তার এই বাড়ী?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষীমশায় বাড়ী আছেন?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কি না দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে যাবে।

আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তাপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোর করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিতমশায় আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশি হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ বয়সেও গায়ের রঙের জৌলুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নিচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড়-বড় উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশী। আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এখন তাহার যেন অনেকখানিই হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্টমনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনেরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনেরই শ্রাবণ। ঠিক? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে তো হয় না, আপনার হ'ল কেমন ক'রে এরকম তো দেখি নি। কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিনটা মনে ছিল এইজন্য যে, আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু, কিশোরী সেনও জানে না—তবে তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু-বছরের, তাও এক

ব্রিজ খেলার আড্ডায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তার কোন অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্তমানে বড় খারাপ হচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল, বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ কাছে। আমি আশ্চর্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম! মাত্র দু-দিন আগে কলুটোলা ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটসুদ্ধ মানিব্যাগটা খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধ হয় থট্-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে, তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে? একটু বোধ হয় ধাপ্পা। যাই হোক, সাধারণ হাতদেখা গণকের মতো মন বুঝিয়া শুধু মিষ্টি-মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে-মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যাইতাম তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে-বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধন করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে শুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোড়দৌড়, ফট্‌কা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে বড় মাড়োয়ারীর মোটর গাড়ীর ভিড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ীর গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে শুরু করিল অজস্র। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সাও দাঁড়াই না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল—ঘোড়দৌড়, নারী ও

সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড়-বড় ধনীর দুলাল যথাসর্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ তো সামান্য গণৎকার ব্রাহ্মণ মাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে-করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে-সঙ্গে সত্যকার পসার নষ্ট হইল। তবুও ধূর্ততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারি প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনটিরই অভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে, সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু বর্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই?

আমার মতো গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে, তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য ক'রে রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না। লোক পাই নি এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিত হয়ে শুয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নিচে একটা গাছের তলায় দু'টি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই ব'লে দেবে। ভালো ক'রে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোনা তো যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তার তো কোনদিন

জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—'চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন, দেখা করে আসি। খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি।'

তারানাথের স্বভাবই ভালো সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি আবার তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব কর্ম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম, তিনি আমাকে যে-কোন একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন—পকেটে রুমাল আছে? বার করে দেখ।

রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর-ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা—সুতরাং হাত-সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌই নাই।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধু-বাবাজী তান্ত্রিক-শক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোন মূল্য দিই না। আতর তো বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলল—নাঃ, লোকটা নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেছে, তারই ফলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই বা পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও তো অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমাকে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনের তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে, contact at a distance-এর মোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার উপর যে হিপ্‌নটিজ্‌মের প্রভাব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে, সে

প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য হয়ে পড়লে, তবুও তো সত্যিকার তান্ত্রিক দেখ নি। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র এক ধরণের যাদু, যাকে তোমরা বলো ব্ল্যাক্‌ম্যাজিক। এক সময়ে আমি ও-জিনিসের চর্চা যে না করেছি, তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক-ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরনের লোক দেখেছ। সালফিউরিক্ এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধরণের তন্ত্রচর্চার শক্তি, ব্ল্যাক্‌-ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।'

কি হ'ল জান? ছেলে বলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নামকরা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন, আমাদের বাড়ী এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস্। মাস দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হ'ল। মনে ভাবলাম—চন্দ্রদর্শনের মতো নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ধরণের জ্যোতি?

ঠিক নীল বিদ্যুৎশিখার মতো। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ীর পিছনে পেয়ারাতলায় ব'সে সাধুর কথামত নাকের উপর দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম,—সব দিন ঘটে উঠ্‌ত না, হপ্তার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাস-তিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হ'ল নীল, লিক্‌লিকে একটা শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির, মিনিটখানেক ছিল প্রথম দিন।

এই ভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়ীতে আর মন টেকে না। ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয় নি, মন্দিরে-মন্দিরে আরতি চলছে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডলু হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না, সাধু তো কতই দেখি। চুপ ক'রে আছি, সাধুবাবাজী জল ভ'রে পৈঠা বেয়ে উঠতে-উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চোখ খাসা বাংলায় বললেন—বাবাজীর বাড়ী কোথায়?

আমি বললাম, বাঁকুড়া জেলায় মালিয়াড়া-রুদ্রপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রুদ্রপুর? তারপর কি যেন একটা ভাবলো, খুব অল্পক্ষণ, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—রুদ্রপুরে রামরূপ সান্যালের নাম শুনেছ? তাদের বংশে এখন কে আছে জানো?

আমাদের গ্রামে সান্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ী-ঘর, দরজায় হাতি বাঁধা থাকতো শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্যালের নাম তো কখনো শুনি নি। সন্ন্যাসীরে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু! তুমি জানবে কি ক'রে! খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে তো?

খেয়াঘাট! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েছে কোন্‌কালে, এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ-গরু হেঁটে চলে যায়। তবু পুরোনো নদীর খাদের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্যালদেরই কোন পূর্বপুরুষ ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি ক'রে জানলেন? বিস্ময়ের সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা অনেক জানেন দেখছি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধ-পিতামহের মুখে দেখা যায়, তার অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের কোন ছেলেমানুষী কথার জন্য। সত্যি বলছি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারি নি, খুব উঁচু মন না হ'লে অমন হাসি মানুষ হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ী থেকে বেরিয়েছিস্ কেন, ধর্মকর্ম করবি?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ী ফিরে যা, সংসারধর্ম করগে যা। এ পথ তোর নয়, আমার কথা শোন।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। তুই ছাড়িস্ নি, ছাড়তে পারবিও নে। তুই ছেলেমানুষ নির্বোধ। কিছু বোঝবার বয়সে হয় নি। যা মা-বাপের মনে কষ্ট দিস্ নে।

কথা শেষ ক'রে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি ক'রে জানলেন, বললেন না তো? দয়া ক'রে বলুন—

তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূর গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন আসছিস্?

—আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোন লাভ হবে না। তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি-একটা শক্তি আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে-পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোনদিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্যালের কোন হদিস মেলাতে পারলাম না। সান্যালদের বাড়ীর ছেলে-ছোকরার দল তো কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক শরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন, তিনি পেনসন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ী এলেন। কথায়-কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বলিলেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি, তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব শখ ছিল, অনেক কষ্ট ক'রে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি ক'রে বংশের কুলজী

জোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক-পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না, রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেন নি। এটা অন্ততঃ দেড়-শ বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্রোত ছিল। বড়-বড় কিস্তি চলত। কোন নৌকা একবার ওই মন্দিরের নিচের ঘাটে মারা পড়ে ব'লে ওর নাম লা-ভাঙার খেয়াঘাট।

প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম, খেয়াঘাট?

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, তা ছাড়া আমাদের পুরোনো কাগজ-পত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বল তো, এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হ'ল? বই-টই লিখছ না কি?

ওদের কাছে কোন কথা বলি নি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোন অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ী থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরুই। বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম, সেখানকর শ্মশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারে শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়-চোপড় পরনে, তেমনই মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে অতি কষ্টে চেপে বললাম—মা, আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নিন্, অনেক দূর থেকে এসেছি, দয়া করুন আমার ওপর।
পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বলল—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি!

আঙ্গুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শ্মশান, ভয় হ'ল ওর মূর্তি দেখে, কি জানি মারবে-টারবে নাকি …পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পরদিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি?

বললাম—মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ—দূর হ' বেরো এখান থেকে—

তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বললে—ফের যদি আসিস তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে ভাবলাম, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। কি এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি কোন্‌দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখে আমায় যেন বললে—লাথিটা খুব লেগেছে না রে? তা রাগ করিস্ নে, কাল যাস্ আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার গেলাম। ও মা, স্বপ্ন-টপ্ন সব মিথ্যে। পাগলী আমায় দেখে মারমূর্তি হয়ে শ্মশানের একখানা পোড়া-কাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরীয়া হয়ে বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে? তুমিই তো আসতে বললে, তাই এলাম!

পাগলী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল—তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে, না তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। হি—হি—হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেছে, আমি বুঝলাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক, আমার মনে হ'ল ভেতরে-ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে টানছে। হঠাৎ আবার সে বললে—বোস্ এখানে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুব রাজা-জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মতো—তার সে হুকুম পালন না ক'রে যে উপায় নেই।

কাজেই বসতে হ'ল।

সে বললে—কেন এখানে এসে বিরক্ত করিস্ বল্ ত? তোর দ্বারা কি হবে, কিছু হবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে।

আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা, কিছু খাবি? আমার এখানে এসেছিস, তার ওপর আবার বামুন, এখন তোকে কিছু খাওয়ান দরকার। বল্ কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতূহল হ'ল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেছি, যা চাওয়া যায়, সাধু-সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে। কলকাতায় গন্ধ-বাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য ব'লে মনে হয় নি, বললাম—খাব অমৃতি, জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর বর্তমান কলা। পাগলী এক আশ্চর্য ব্যাপার করলে। শ্মশানের কতকগুলো পোড়াকয়লা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমি ত অবাক্! ইতস্তত: করছি দেখে সে পাগলের মতো খিলখিল করে একরকম অসম্বদ্ধ হাসি হেসে বললে—খা—খা—ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ তো দেখছি পুরো পাগল, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায় মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ, ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ফেরবার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু-থু করে সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার ক'রে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

রাগে-দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কি বোকামি করেছি এখানে এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েছে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললে—খেলি রাবড়ি, মর্তমান কলা? পেটুক কোথাকার। পেটের জন্যে এসেছ শ্মশানে আমার কাছে?

দূর হ জানোয়ার—দূর হ।

আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না ব'লে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে বলছে—রাগ করিস্ নে। আসিস্ আজ, রাগ রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম।

যা হোক্, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় যাহু করলে না কি? গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্তিভারী প্রসন্ন! বললে—আবার এসেছিস্ দেখছি। আচ্ছা নাছোড়বান্দা তুই?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে? দিনে অপমান ক'রে বিদেয় ক'রে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এরকম হয়রান ক'রে তোমার লাভ কি?

পাগলী বললে—পারবি তুই? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তাই করবি? বললাম—আচ্ছ। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা ক'রে। সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল্। গলা টিপে মেরে ফেল্। তারপর আমার মৃতদেহের ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে। নিয়ম ব'লে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে-মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ ক'রে বিকট চিৎকার ক'রে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা দিবি। ভোর-রাত পর্যন্ত এমনি মড়ার ওপর ব'সে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে, তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় ক'রো না। ভয় পেলে সাধনা তো মিথ্যা হবেই, প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পারে। কেমন রাজী?

ও যে এমন কথা বলবে, তা বুঝতে পারি নি। কথা শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, সব পারব, কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না। আর তুমিই বা আমার জন্যে মরবে কেন?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো, দূর হ—

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগাল দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বললাম—রাগ করছ কেন? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত ক'রে বললে—ভদ্দর লোকের ছেলে। ভদ্দর লোকের ছেলে তবে এ পথে এসেছিস্ কেন রে, ও অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া? তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা ভদ্দরলোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর প'রে হৌসে চাকরি কর্ গিয়ে—বেরো—

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিসের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবছ না। আমি যখন ফাঁসি যাব, তখন ঠেকাবে কে?

মনে-মনে আবার সন্দেহ হ'ল, না এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে এসে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া আর কিছু না।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তন্ত্রের কথা শুনেছি। সময়ে-সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে, ওকে বিদুষী ব'লে সন্দেহ হয়।

সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হ'ল। বিকেলে যখন গেলাম, তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না, তোকে ওবেলা গালাগাল দিয়েছি, কিন্তু মনে করিস্ নে। ভালোই হয়েছে, তুই সাধনা করতে চাস্ নি। ও সব নিম্ন-তন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তি লাভ হয়। তা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয়? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে, তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ ম'রে দেহশূন্য হ'লে চোখে যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশি। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাঁখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ ম'রে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন্ বলে। এদের

মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায়, এরা তাই করে। করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ্ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েছ, তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক্ হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শুনিনি। এর মতো পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনেছি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম্য শ্মশান, একটা বড় তেঁতুলগাছ আর এক দিকে কতকগুলো শিমূল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে গা-টা যেন শিউরে উঠল।'

পাগলী তখনও ব'লে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরনের কথা।

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া-মায়া ব'লে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মতো মন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভাল্লুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশি হয় ব'লে যাদের বেশি দুঃসাহস, এমন তান্ত্রিকেরা হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হ'লে খুবই ভালো, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে-পদে। তাদের নিয়ে যখন-তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস্ নে, তাই রাগ করিস্।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে, জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তাহ'লে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোক আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না, অত ঘন-ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্বনাশ ক'রে দিতে পারে। ওকে নিয়ে বেশী ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের লোকে ওর কাছেও ঘেঁষে না। বিদেশী লোক মারা পড়বেন শেষে।

মনে ভাবলাম, কি আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল, তা বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যের পরে পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলি না টের পায়। পাগলীর সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপসা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই তো! এ আবার কে এল? যাই, কি না যাই?

দু-এক পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তিনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে, কে?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে বললে—আ মরণ, কে তার নামটাই বল্ না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলী তো! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গি। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে! সে এক অদ্ভুত আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢ'লে পড়ে আর কি। বললে—আয় না, ব'স না এসে পাশে—লজ্জা কি? আহা, অত লজ্জায় দরকার নেই। এস—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভালো ব'লে মনে হ'ল না—তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ পাগলীই, আমায় কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময় একটা পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে দেখি, বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায় নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী আবার বললে—আয়, ব'স।

বললাম—তুমি ও-রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কি?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া কি আবোল-তাবোল বক্‌ছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমায় কোন ভয় দেখিও না। যখন তোমায় মা ব'লে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন্, তবে। তুই সে রকম নস্। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক তুই তোকে, দু-একটা কিছু দেব, তাতেই তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগ্‌গির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর। কিন্তু যা ব'লে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস্? শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরীয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোন কালেই, তবুও কখনও মড়ার উপরে ব'সে সাধনা করব, এ-কল্পনাও করি নি। কিন্তু রাজী হ'লাম পাগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিশের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সবটাতেই রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন দেখলাম, পাগলীর ভাবটা যেন কেমন-কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি-চুপি আয়।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো-পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ের মড়া ভেসে আছে। কোন্ ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধ হয়।

ও বললে, তোল্ মড়টা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হালকা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করেছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে। আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না, অল্প চেষ্টাতে সেটা টেনে তুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবি নে তো? ভয় পেয়েছ কি মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়ছে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ সেই চোখ, কোন তফাত নেই।

পাগলী বললে, চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন, ও আপদ?

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অতন্ত ভয় হ'ল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গাঁয়ের লোক ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা-যা করতে বললে, সন্ধ্যে থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধ্যের পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন ক'রে বসলাম। পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয় নি যে, এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোন বিভীষিকা দেখ, তবে ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই মরবে। তখনও আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি-দুপুর হ'ল ক্রমে। নির্জন শ্মশান, কেউ কোন দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারে দিগবিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও তাও আমি আর দেখি নি।

হঠাৎ এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা ঝোপের আড়াল থেকে। শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে একটা টাটকা মড়ার ওপর ব'সে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-কর তোমার ইচ্ছে—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্য ব'লে কোন স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হ'ল শ্মশানের নিচে নদীজল

থেকে দলে-দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে-দলে —একটা, ছটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে!

একটু পরে ভালো ক'রে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নেই সব কর্‌বা পাখি, বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়। ছ'পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মতো।

এ মুহূর্তে মনটা হালকা হয়ে গেল—তাই বল! হরি-হরি! পাখি!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষও হয়নি—পরক্ষণে চারপাশে মেয়ে-গলায় কারা খলখল ক'রে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সবই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই এক-যোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে।...আর তাদের চারিদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে, নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে অন্ধকারের মধ্যে সাদা-সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরোনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে-জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনটার মাথার খুলি ফুটে, কোনটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধ'রে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া ক'রে রেখেছে, সে যেই ছেড়ে দেবে, অমনি কঙ্কালগুলো হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা, তোবড়ানো, নোনা-ধরা, হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শ্মশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে এক-যোগে সবাই যেন আমার গলা টিপবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেব ভাবছি, এমন সময় দেখছি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার

কে? যা হোক্, সব রকম ব্যাপারের জন্যে আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে করতে নামি নি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে-হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমাকে তোমার পছন্দ হয় না।

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের তো শুনেছি অনেক সাধনা ক'রেও মেলে না, আর এত সহজে ইনি-বললাম—আমার মহাসৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন, আমার জীবন ধন্য হল—

মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাডামরী সাধনা করছ কেন?

—আজ্ঞে, আমি তো জানি নে কোন্ সাধনা কি রকম। পাগলী আমায় যেমন ব'লে দিয়েছে তেমনি করছি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা তুমি ছাড়। ও মন্ত্র জপ ক'রো না। যখন দেখা দিয়েছি, তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহাডামরী ভৈরবীকে দেখ নি—অতি বিকট তার চেহারা···তুমি ভয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্র।

সাহসে ভর করে বললাম—সাধনা ক'রে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

আমার মনে হ'ল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানি নে, কে আপনারা।···যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাডামরীকে চেন না? আমাকেও চেন না? তা হ'লে আর চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস করছ? দিব্যৌঘ পথের নাম শোননি তন্ত্রে? পাষণ্ডদলের জন্যে ঐ পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার মন্ত্রে দিব্যৌঘ পথে সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না। ভয়ে-ভয়ে বললাম, তবে আমি

কি খুবই পাষণ্ড ?

বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে—তোমার বেলা এসেছি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে…অত ভয় কিসের। আমি না তোকে লাথি মেরেছি ? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি। তোকে পরীক্ষা না ক'রে কি সাধনার নিয়ম ব'লে দেয়েছি তোকে ?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, বলে কি ?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়, সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলি ?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল।

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোন তফাৎ নেই। একই মুখ, একই রং, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছিস্ কি ?

আমি কথার কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্রকাশ ক'রে বললাম—কে আপনি ? আপনি কি সেই শ্মশানের পাগলীও না কি ?

একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে-ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কাল হাড়ের হাতে তালি দিতে-দিতে এঁকে-বেঁকে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোন কঙ্কালের হাত খসে গেল, কোনটার মেরুদণ্ড, কোনটার কপালের হাড়, কোনটার বুকের পাঁজরগুলো—তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলেছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল, আর হাড়ে-হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক্ ঠক্ শব্দ।

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন জড়িয়ে-গুটিয়ে গেল কাগজের মতো, আর সেই ছিদ্রপথে যেন এক বিকটমূর্তি নারী উন্মাদিনীর মতো আলুথালু

বেগে নেমে আসছে দেখলাম। সঙ্গে-সঙ্গে চারপাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মড়া পচার দুর্গন্ধে চারদিক পূর্ণ হ'ল, পেছনের আকাশটা আগুনের মতো রাঙা-মেঘে ছেয়ে গেল, তার নিচে চিল, শকুনি উড়ছে সেই গভীর রাত্রে। শেয়ালের চিৎকার ও নরকঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম।

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসছে। তার আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত দু-চোখ ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মেশানো, সে কি ভীষণ ক্রুর দৃষ্টি। সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন-রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে—সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর ব'সে আছি—সে শবটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললে—আমায় উদ্ধার করো, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন ক'রে মেরে ফেলেছে ব'লে আমার গতি হয় নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি এই শ্মশানে। ছাপ্পান্ন বছর···কাকেই বা বলি? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশাহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পূবের আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী ব'সে মৃদু-মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে···সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না?

আমার শরীর তখনও ঝিমঝিম করছে। বললুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মনোবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্র-জপ ছেড়ে দিলি। দূর, ওসব হাঁকিনীদের মায়া। ওরা সাধনার বাধা। তুই ষোড়শীকে চিনিস্ না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

'এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।'

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা।

তুই তার জানিস্ কি? ওসব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধস্বরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আরও এক বিকটমূর্তি পিশাচীর মতো চেহারার নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না; তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল—কি সেটা?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভালো। শেষকালে যে বিকটমূর্তি মেয়ে দেখেছিস্, তিনি মহাডামরী, মহাভৈরবী—তুই তাঁর তেজ সহ্য করতে পারলি নে—আসন ছেড়ে ভাগলি কেন?

তারপরে সে হঠাৎ হি-হি ক'রে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার! উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের! আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কারবার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে ব'সে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই? সকাল কোথায়, এখন যে সারারাত সাধনা ক'রে আসন ছেড়ে এলি? এই তো সবে সন্ধ্যে!

—অ্যাঁ!

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়-হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল ছ-টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙায় তোলা, শবসাধনা, নরকঙ্কাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিল-শকুনির ঝাঁক,—সব ভ্রম।

হতভম্বের মতো বললাম—কেন এমন ভোলালে? আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে?

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর মধ্যে সে-জিনিস নেই, তোর কর্ম নয়, তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবি নে।

বললাম, একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি তো অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভেল্কি নিয়ে থাক কেন? উচ্চতন্ত্রের সাধনা কর না কেন?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা, এঁরা মহাবিদ্যা। ব্রহ্ম শক্তির নারীরূপ। এদের সাধনা এক জন্মে হয় না—আমার পূর্বজন্ম এমনি কেটেছে—এ-জন্মও

গেল। গুরুর দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এসব ব'কে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশিদিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাই নি, ভয়েই যাই নি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোনদিন।

তখন চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত—তুমি-আমি সামান্য মানুষে তার কি বুঝবো? যাক সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারি নি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও? এস চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে—

আমি দেখিলাম, তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাততঃ চন্দ্রদর্শন অপেক্ষাও গুরুতর কাজ বাকি। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনো জবাব দিব না।

পাড়ার মোট ছ'সাত ঘর ব্রাহ্মণের বাস। সকলের অবস্থাই খারাপ। পরস্পরকে ঠকিয়ে, পরস্পরের কাছে ধার-ধোর করে এরা দিন গুজরান করে। অবিশ্যি কেউ কাউকে খুব ঠকাতে পারে না, কারণ সবাই বেশ হুঁশিয়ার। গরীব বলেই এরা বেশী কুঁচুটে ও হিংসুক, কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, বা কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না।

পূর্বেই বলেছি, সকলের অবস্থা খারাপ এবং খানিকটা তার দরুণ, খানিকটা অন্য কারণে সকলের চেহারা খারাপ। কিশোরী মেয়েদেরও তেমন লালিত্য নেই মুখে, ছোট-ছোট ছেলেরা এমন অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকে, এবং এমন পাকা-পাকা কথা বলে, যে তাদের আর শিশু বা বালক বলে মনে হয় না। কাব্যে বা উপন্যাসে যে শৈশবকালের কতই প্রশস্তি পাঠ করা যায়, মনে হয় সে সব এদের জন্যে নয়, এরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে একেবারে প্রবীণত্বে পা দিয়েছে।

পাড়ায় একঘর গৃহস্থ আছে, তারা এখানে থাকে না, তাদের কোঠা-বাড়িটা চাবি দেওয়া পড়ে আছে আজ দশ-বারো বছর। এদের মস্ত বড় সংসার ছিল, এখন প্রায় সবাই মরে-হেজে গিয়ে প্রায় পাঁচটি প্রাণীতে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির বড় ছেলে পশ্চিমে চাকরি করে, মেজ ছেলে কলেজে পড়ে কলকাতায়, ছোট ছেলেটি জন্মাবধি কালা ও বোবা—পিসিমার কাছে থেকে মূক্-বধির বিদ্যালয়ে পড়ে। বড় ছেলে বিবাহ করেনি, যদিও তার ত্রিশ-বত্রিশ হয়েছে, সে নাকি বিবাহের বিরোধী, শোনা যাচ্ছে যে এমনি ভাবেই জীবন কাটাবে।

পাড়ার মধ্যে এরাই শিক্ষিত, সচ্ছল অবস্থার মানুষ। সেজন্যে এদের কেউ ভাল চোখে দেখে না, মনে-মনে সকলেই এদের হিংসে করে, এবং বড় ছেলে যে বিয়ে করবে না বলছে, সে সংবাদে পাড়ার সবাই পরম সন্তুষ্ট। যখন সবাই ছোট ও গরীব, তখন একঘর লোক কেন এত বাড় বাড়বে? বড় ছেলে বিয়ে করলেই ছেলেমেয়ে হয়ে জাজ্বল্যমান সংসার হবে দু'দিন পরে, সে কেউ সহ্য করতে পারবে না। মেজ ছেলে মোটে কলেজে পড়ছে, এখন সাপ হয় কি ব্যাঙ হয়, তার কিছু ঠিক নেই, তার বিষয়ে

দুশ্চিন্তার এখনও কারণ ঘটেনি, তার বয়েসও বেশী নয়।

মজুমদার-বাড়িতে ভাঙা রোয়াকে দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়েগজালি হয়। তাতে রায়-গিন্নী, মুখুয্যে-গিন্নী প্রভৃতি তো থাকেনই, পাড়ার অল্প-বয়সী বৌয়েরা ও মেয়েরাও থাকে। সাধারণতঃ যে সব ধরনের চর্চা ও মজলিসে হয়ে থাকে, তা শুনলে নারীজাতি সম্বন্ধে লিখিত নানা সরল প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনার সত্যতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ যাঁর উপস্থিত না হবে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন খুব বড় ধরনের অপ্‌টিমিস্ট্‌।

আজ দুপুরে যে বৈঠক বসছে, তাতে আলোচিত বিষয়গুলি থেকে মোটামুটি প্রতিদিনের আলোচনা ও বিতর্কের প্রকৃতি অনুমান করা যায়।

বোস-গিন্নী বলছিলেন—আর বাপু দিচ্ছি তো রোজই, আমার গাছের কাঁঠাল খেয়েই তো মানুষ, আমাদের যখন কাঁঠাল পাড়ানো হয়, ছেলে-মেয়েগুলো হ্যাংলার মত তলায় দাঁড়িয়ে থাকে—ঘেয়ো কি ভুয়ো এক-আধখানা যদি থাকে তো বলি, যা নিয়ে যা। তোদের নেই, যা খেগে যা। তা কি পোড়ার মুখে কোনদিন সুবাক্য আছে? ওমা, আজ আমার মেয়ে দুটো নেবু তুলতে গিয়েছে ডোবার ধারের গাছে, তো বলে কিনা রোজ-রোজ নেবু তুলতে আসে, যেন সরকারী গাছ পড়ে রয়েছে আর কি —চব্বিশ ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে মণ্টুর মা। আচ্ছা বলো তো তোমরাই—

মণ্টুর মা—যাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হচ্ছিল, তিনি এঁদের মজলিসে কেবল আজই অনুপস্থিত আছেন, নইলে রোজই এসে থাকেন। তাঁর অনুপস্থিত সুযোগ গ্রহণ করে সবাই তাঁর চালচলন, ধরণ-ধারণ রীতি-নীতির নানারূপ সমালোচনা করলো।

প্রিয় মুখুয্যের মেয়ে শান্তি—ষোল-সতেরো বছরের কুমারী—তার মায়ের বয়সী মণ্টুর মা'র সম্বন্ধে অমনি বলে বসলো—ওঃ, সে কথা আর বোলো না খুড়ীমা, কি ব্যাপক মেয়েমানুষ ঐ মণ্টুর মা! ঢের-ঢের মেয়েমানুষ দেখিচি, অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথায় দেখে থাকি, ক্ষুরে নমস্কার, বাবা-বাবা!

ছোট মেয়ের ঐ জ্যাঠামি কথার জন্যে তাকে কেউ বকলে না, বা শাসন করলে না, বরং কথাটা সকলেই উপভোগ করলে।

তারপর কথাটার স্রোত আরও কতদূর গড়াতো বলা যায় না, এমন সময় রায়-বাড়ির বড়বৌ হঠাৎ মনে-পড়ার ভঙ্গীতে বল্লেন—হ্যাঁ, একটা মজার কথা শোনোনি বুঝি। শ্রীপতি যে বিয়ে করেছে, বটঠাকুরের কাছে চিঠি এসেচে, শ্রীপতির মামা লিখেছে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—শ্রীপতি বিয়ে করেচে!

তারপর সকলেই এক সঙ্গে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলো।

—কোথায়-কোথায়?

—কবে চিঠি এল?

—তবে যে শুনলাম শ্রীপতি বিয়ে করবে না বলেচে!

শ্রীপতির বিয়ের খবরে অনেকেই যেন একটু দমে গেল। খবরটা তেমন শুভ নয়। কারো উন্নতির সংবাদ এদের পক্ষে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব। তাদের যখন উন্নতি হ'লো না, তখন অপরের উন্নতি হবে কেন? কিন্তু এর পরেই যখন রায়-বৌ মুখ টিপে হেসে আস্তে-আস্তে বল্লেন—বৌটি নাকি বামুনের মেয়ে নয়—তখন সকলে খাড়া হয়ে সটান উঠে বসলো, তাদের মরা-মরা ভাবটা এক মুহূর্তে গেল কেটে। একটা বেশ সরস ও মুখরোচক পরনিন্দা আর ঘোঁটের আভাস ওরা পেলে, রায়-বৌয়ের চাপা ঠোঁটের হাসি থেকে।

শান্তি উৎসুক চোখে-চেয়ে চেয়ে হাসিমুখে বল্লে—ভেতরে তাহলে অনেকখানি কথা আছে!

বোস-গিন্নী বল্লেন তাই বল! নইলে এম্‌নি কোথাও কিছু নয় শ্রীপতি বিয়ে করলে, এ কি কখনো হয়! কি জাত মেয়েটার? হিন্দু তো?

অর্থাৎ, তাহ'লে রগড়টা আরও জমে।

রায়বৌ বল্লেন—হিন্দুই, মেয়েটা বদ্দি বামুন।

এদেশে বৈদ্যকে বলে থাকে 'বদ্দি বামুন'—এ অঞ্চলের ত্রিসীমানায় বৈদ্যের বাস না থাকায় বৈদ্যজাতির সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কারো বিশ্বাস ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যের সামাজিক স্থান, তারা এক প্রকারের নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ, তার চেয়ে নীচু নয়—আবার কারো বিশ্বাস, তাদের স্থান সমাজের নিম্নতর ধাপের দিকে।

শান্তি বল্লে—বৌয়ের বয়েস কত?

—ওঃ তা অনেক। শুনচি চব্বিশ-পঁচিশ—

সকলে সমস্বরে আবার একটা বিস্ময়ের রোল তুল্লে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত মেয়ে আইবুড়ো থাকে ঘরে! এ আবার কোথাকার ছোট জাত, রামোঃ! ছিঃ—

শান্তির মা বল্লেন—তাহ'লে মেয়ে আর নয়, মাগী বল! পাঁড়া চসা—বাপ-মা বুঝি ঘরে বীজ রেখেছিল!

কে একজন মুখ টিপে হেসে বল্লেন—বিধবা না তো?

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—আগের পক্ষের ছেলেমেয়ে কিছু আছে নাকি মাগীর!

এ কথায় শান্তিই আগে মুখে আঁচল দিয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো, তারপরে বাকি সকলে তার সঙ্গে যোগ দিলে। হ্যাঁ, এটা একটা নতুন ও ভারী মজার খবর বটে, মেয়েগজালির কিছুদিনের মত খোরাক সংগ্রহ হ'ল। আমচুরি, কাঁঠালচুরির গল্প একটু একঘেঁয়ে হয়ে পড়েছিল।

ঠিক পরের দিনই এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটলো। শ্রীপতির মেজ ভাই উমাপতি গাঁয়ে এসে বাড়ির চাবি খুলে লোক লাগিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগলো। তার দাদা-বৌদিকে নিয়ে শীগ্‌গির আসবে এবং কিছুদিন নাকি গাঁয়েই বাস করবে। বৌদিদি পাড়াগাঁ কখনো দেখেননি—গ্রামে আসবার তাঁর খুব আগ্রহ। তার দাদাও কলকাতায় বদলি হবার চেষ্টা করছে।

মেয়ে-মজলিসে সবাই তো অবাক। শ্রীপতি কোন্ মুখে অজাতের বউ নিয়ে গাঁয়ে এসে উঠবে! মানুষের একটা লজ্জা-সরমও তো থাকে, করেই ফেলেছিস্ না-হয় একটা অকাজ! এ সব কি খিরিস্টানি কাণ্ড-কারখানা, কালে-কালে হ'ল কি! আর সে ধিঙ্গি মাগীটারই বা কি ভরসা, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পাড়ায় বিয়ের বউ সেজে সে-ই বা কোন্ সাহসে আসবে!

শ্রীপতি অবিশ্যি বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়িতে আসার বিষয়ে এঁদের মত জিজ্ঞাসা করেনি। একদিন একখানা নৌকো এসে গ্রামের ঘাটে দুপুরের সময় লাগলো এবং নৌকো থেকে নামল শ্রীপতি, তার নববিবাহিতা বধূ, একটি ছোক্‌রা চাকর ও দুটি ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বিছানার মোট, একটা

ঝুড়ি-বোঝাই টুকিটাকি জিনিস। ঘাটে দু-একজন যারা অত বেলায় স্নান করছিল, তারা তখুনি পাড়ার মধ্যে গিয়ে খবরটা সবাইকে বললে। তখন কিন্তু কেউ এল না, অত বেলায় এখন শ্রীপতিদের বাড়ি গেলে তাদের খেতে বলতে হয়। অসময়ে এখন এসে তারা রান্নাবান্না চড়িয়ে খাবে, সেটা প্রতিবেশী হয়ে হতে দেওয়া কর্তব্য নয়, সুতরাং সে ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করবার চেয়ে এখন না যাওয়াই বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু রামু চক্কত্তি আর প্রিয় মুখুয্যের বাড়ির মেয়েরা অত সহজে রেহাই পেলেন না। শ্রীপতি নিজে গিয়ে একেবারে অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে বল্লে—ও পিসিমা, ও বৌদিদি, আপনারা আপনাদের বৌকে হাত ধরে ঘরে না তুললে কে আর তুলবে? আসুন সবাই।

বাধ্য হয়ে কাছাকাছির দু-তিন বাড়ির মেয়েরা শাঁক হাতে, জলের ঘটি হাতে নতুন বৌকে ঘরে তুলতে এলেন—খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, খানিকটা কৌতূহলে। মজা দেখবার প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে। ছোট-বড় ছেলেমেয়েও এল অনেক, শান্তি এল, কমলা এল, সারদা এল।

শ্রীপতিদের বাড়ি উঠোনে লিচুতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূর থেকে মেয়েটির ধপ্‌ধপে্ ফর্সা গায়ের রং ও পরনের দামী সিল্কের শাড়ি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। সামনে এসে আরও বিস্মিত হবার কারণ ওদের ঘটলো—মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে। কি ডাগর-ডাগর চোখ! কি সুকুমার লাবণ্য সারা অঙ্গে! সর্বোপরি মুখশ্রী—অমন ধরণের সুন্দর মুখ এসব পাড়াগাঁয়ে কেউ কখনো দেখেনি।

সকলে আশা করেছিল গিয়ে দেখবে কালো-কালো একটা মোটামত মাগী আধা-ঘোমটা দিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যাট্‌-প্যাট্‌ করে চেয়ে রয়েছে ওদের দিকে। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখলে, এক নম্রমুখী সুন্দরী তরুণী মূর্তি। মুখখানি এত সুকুমার, যে মনে হয় ষোল-সতেরো বছরের বালিকা।

বিকেলে ওপাড়ার নিতাই মুখুয্যের বৌ ঘাটের পথে চক্কত্তি-গিন্নীকে জিজ্ঞেস করলেন—কি দিদি, শ্রীপতির বৌ দেখলে নাকি? কেমন দেখতে?

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—না, দেখতে বেশ ভালই—

চক্কত্তি-গিন্নীর সঙ্গে শান্তি ছিল, সে হাজার হোক ছেলেমানুষ, ভালো

লাগলে পরের প্রশংসার বেলায় সে এখনও কার্পণ্য করতে শেখেনি, সে উচ্ছ্বসিত সুরে বলে উঠলো চমৎকার খুড়ীমা, একবার গিয়ে দেখে আসবে, সত্যিই অদ্ভুত ধরনের ভাল—

নিতাই মুখুয্যের বৌ পরের এতখানি প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন না—বুঝতে পারলেন না শান্তি কথাটা ব্যঙ্গের সুরে বলছে, না সত্যিই বলছে।

বললেন—কি রকম ভাল?

এবার চক্কত্তি-গিন্নী নিজেই বল্লেন—না, বৌ যা ভেবেছিলাম, তা নয়। বৌটি সত্যিই দেখতে ভাল। আর কেনই বা হবে না বলো, শহরের মেয়ে দিনরাত সাবান ঘষছে, পাউডার ঘষছে, তোমার-আমার মত রাঁধতে হ'ত, বাসন মাজতে হ'ত তো দেখতাম, চেহারার কত জৌলুস বজায় রাখে।

এই বয়সে তো দূরের কথা, তাঁর বিগত যৌবন দিনেও অজস্র পাউডার, সাবান ঘষলেও যে কখনো তিনি শ্রীপতির বৌয়ের পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারতেন না—চক্কত্তি-গিন্নীর সম্বন্ধে শান্তির একথাই মনে হ'ল, কিন্তু চুপ করে রইল সে।

বিকেলে এ-পাড়ার, ও-পাড়ার মেয়েরা দলে-দলে বৌ দেখতে এল। অনেকেই বল্লে, এমন রূপসী মেয়ে তারা কখনো দেখেনি। কেবল হরিচরণ রায়ের স্ত্রী বল্লেন—আর বছর তারকেশ্বরে যাবার সময় ব্যাণ্ডেল স্টেশনে তিনি একটি বৌ দেখেছিলেন, সেটি এর চেয়েও রূপসী

মেয়ে-মজলিসে পরদিন আলোচনায় একমাত্র বিষয় দাঁড়ালো শ্রীপতির বৌ। দেখা গেল তার রূপ সম্বন্ধে দু-মত নেই সভ্যাদের মধ্যে, কিন্তু তার চরিত্র সম্বন্ধে নানারকম মন্তব্য অবাধে চলেছে।

—ধরন-ধারণ যেন কেমন—অত সাজগোজ কেন রে বাপু?

—ভাল ঘরের মেয়ে নয়। দেখলেই বোঝা যায়—

—বাসন মাজতে হ'লে ও-হাত বেশীদিন অত সাদাও থাকবে না, নরমও থাকবে না—ঠ্যালা বুঝবে পাড়াগাঁয়ের। গলায় নেক্‌লেস্ ঝুলুতে আমরাও জানি—

—বেশ একটু ঠ্যাকারে। পাড়াগাঁয়ের মাটিতে যেন গুমরে পা পড়ছে না, এমনি ভাব। বামুনের ঘরে বিয়ে হয়ে ভাবছে যেন কি—

—তা-তো হবেই, বদ্দি বামুনের মেয়ে, বামুনের ঘরে এসেছে, ওর

সাত-পুরুষের সৌভাগ্যি না?

নববধূর স্বপক্ষে বল্লে কেবল শান্তি-কমলা। শান্তি ঝাঁজের সঙ্গে বললে —তোমার কারো ভালো দেখতে পার না বাপু। কেন ওসব বলবে একজন ভদ্দরঘরের মেয়ের সম্বন্ধে? কাল বিকেলে আমি কতক্ষণ ছিলাম নতুন বৌয়ের কাছে। কোন ঠ্যাকার নেই, অহংকার নেই, চমৎকার মেয়ে!

কমলা বল্লে—আমাদের উঠতে দেন না কিছুতেই—কত গল্প করলে, খাবার খেতে দিলে, চা করলে—আর খুব সাজগোজ কি করে? সাদাসিধে শাড়ি-সেমিজ পরে তো ছিল। খুব ফর্সা কাপড়চোপড়—ময়লা একেবারে দু'চোখে দেখতে পারে না—

শান্তি বল্লে—ঘরগুলো এরই মধ্যে কি চমৎকার সাজিয়েছে! আয়না, পিক্‌চার, দোপাটি ফুলের তোড়া বেঁধে ফুলদানীতে রেখে দিয়েছে—শ্রীপতিদা বাপের জন্মে কখনো অমন সাজানো ঘরদোরে বাস করেনি—ভারী ফিট্‌ফাট্‌ গোছালো বৌটি—

দিন দুই ডোবার ঘাটে নববধূকে একরাশ বাসন নিয়ে নামতে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। চারিদিকে বনে ঘেরা ঝুপসি আধ-অন্ধকার ডোবাটা যেন মেয়েটির স্নিগ্ধ রূপের প্রভায় এক মুহূর্তে আলো হয়ে উঠল, একথা যারা তখন ডোবার অন্যান্য ঘাটে ছিল, সবাই মনে-মনে স্বীকার করলে। দৃশ্যটাও যেন অভিনব ঠেক্‌লো সবার কাছে, এমন একটা পচা-এঁদো জঙ্গলে ভরা পাড়াগেঁয়ে ডোবার ঘাটে সাধারণতঃ কালোকালো, আধ-ময়লা শাড়িপড়া শ্রীহীনা ঝি-বৌ বা ত্রিকালোত্তীর্ণা প্রৌঢ়া বিধবাদের গামছা পরিহিতা মূর্তিই দেখা যায়, বা দেখার আশা করা যায়—সেখানে এমন একটি আধুনিক ছাঁচে খোঁপা বাঁধা, ফর্সা শাড়ি ব্লাউজ-পরা, রূপকথার রাজকুমারীর মত রূপসী, নব-যৌবনা বধূ সজনেতলার ঘাটে বসে ছাই দিয়ে নিটোল সুগৌর হাতে বাসন মাজছে, এ দৃশ্যটা খাপ খায় না। সকলের কাছেই এটা খাপছাড়া বলে মনে হ'ল। প্রৌঢ়ারাও ভেবে দেখেলেন গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি এই ক্ষুদ্র ডোবার ইতিহাসে।

রায়পাড়া একটি প্রৌঢ়া বল্লেন—আ-হা, বৌ তো নয়, যেন পিরতিমে—কিন্তু অতরূপ নিয়ে কি এই ডোবায় নামে বাসন মাজতে! না ও-হাতে

কখনো ছাই দিয়ে বাসন মাজার অভ্যেস আছে! হাত দেখেই বুঝেচি।

তারপর থেকে দেখা গেল ঘরসংসারের যা কাজ শ্রীপতির বৌ সব নিজের হাতে করচে। ইতিমধ্যে শ্রীপতির কল্‌কাতায় বদ্‌লি হবার খবর আসতে সে চলে গেল বাড়ি থেকে।

পাড়ার মেয়েদের মধ্যে শান্তি ও কমলা শ্রীপতির বৌয়ের বড় ন্যাওটা হয়ে পড়লো। সকাল নেই, বিকেল নেই, সব সময়েই দেখা যায় শান্তি ও কমলা বসে আছে ওখানে। পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ে, অমন আদর করে কেউ কখনো রোজ-রোজ ওদের লুচি-হালুয়া খেতে দেয়নি।

একদিন কমলা বল্লে—বৌদিদি, তোমার ঘরে কাপড়-মোড়া ওটা কি?

শ্রীপতির বৌ বল্লে—ওটা এসরাজ—

—বাজাতে জানো নাকি বৌদি?

—একটু-আধটু অমনি জানি ভাই, কিন্তু এ্যাদ্দিন ওকে বার পর্যন্ত করিনি কেন জানো, গাঁয়ে-ঘরে কে-কি হয়তো মনে করবে।

শান্তি বল্লে—নিজের বাড়ি বসে বাজাবে, কে কি মনে করবে? একটু বাজিয়ে শোনাও না বৌদি!

একটু পরে রায়-গিন্নী ঘাটে যাবার পথে শুনতে পেলেন শ্রীপতির বাড়ির মধ্যে কে বেহালা না কি বাজাচ্ছে, চমৎকার মিষ্টি! কোনো ভিখিরী গান গাইছে বুঝি? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুনে তিনি ঘাটে চলে গেলেন।

ঘাটে গিয়ে তিনি মজুমদার-বৌকে বল্লেন কথাটা।

ওই শ্রীপতির বাড়ি কে একজন বোষ্টম বেহালা বাজাচ্ছে শুনে এলাম। কি চমৎকার বাজাচ্ছে দিদি, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

দুপুরের মেয়ে-মজলিসে শান্তির মা বল্লেন—শ্রীপতি বৌ চমৎকার বাজাতে পারে এসরাজ না কি বলে, একরকম বেহালার মত। শান্তিদের ওবেলা শুনিয়েছিল—

রায়-বৌ বল্লেন—ও! তাই ওবেলা নাইতে যাবার সময় শুনলাম বটে! সে যে ভারী চমৎকার বাজনা গো, আমি মনে করলাম কোন ফকির বোষ্টম ভিক্ষে করতে এসে বাজাচ্ছে!

এমন সময় শাস্তি আসতেই তার মা বল্লেন—ওই জিজ্ঞেস করো না শাস্তিকে।

শাস্তি বল্লে—উঃ, সে আর তোমার কি বলব খুড়িমা, বৌদিদি যা বাজালে অমন কখনো শুনিনি। শুনবে তোমরা? তাহ'লে এখনই বলি বাজাতে—বল্লেই বাজাবে।

শাস্তি শ্রীপতিদের বাড়ী চলে যাবার অল্প পরেই শোনা গেল শ্রীপতির বৌয়ের এস্‌রাজ বাজনা। অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা রইল না।

চক্কত্তি-গিন্নী বল্লেন—আহা, বড় চমৎকার বাজায় তো!

সকলেই স্বীকার করলে শ্রীপতির বৌকে আগে যা ভাবা গিয়েছিল, সে-রকম নয়, বেশ মেয়েটি।

এস্‌রাজ বাজনার মধ্যে দিয়ে পাড়ায় সকলের সঙ্গে শ্রীপতির বৌয়ের সহজ ভাবে আলাপ-পরিচয় জমে উঠলো। সন্ধ্যায় প্রায়ই সবাই যায় শ্রীপতিদের বাড়ি বাজনা শুনতে।

তারপর গান শুনলো সবাই। একদিন পূর্ণিমার রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা ভেতর-বাড়ির রোয়াকে বসে বৌ এস্‌রাজ বাজাচ্ছিল, পাড়ার সব মেয়েই এসে জুটেচে। শ্রীপতি বাড়ি নেই। কমলা বল্লে—আজ বৌদি একটা-গান গাইতেই হবে—তুমি গাইতেও জানো ঠিক—শোনাও আজকে—

বৌটি হেসে বল্লে—কে বলচে ঠাকুরঝি যে আমি গাইতে জানি?

—না, ওসব রাখো—গাও একটা—

সকলেই অনুরোধ করলে। বল্লে—গাও বৌমা, এ পাড়ায় মানুষ নেই, আস্তে-আস্তে গাও, কেউ শুনবে না—

শ্রীপতির বৌ একখানা মীরার ভজন গাইলে—

রাণাজি, ম্যায় গিরধর কে ঘর যাঁছ
গিরধর ম্হারা সাচো প্রিতম্ দেখত রূপ লুভ'াউ।

গায়িকার চোখে-মুখে কি ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠলো গানখানা গাইতে-গাইতে—শাস্তি একটা গন্ধরাজ আর টগরের মালা গেঁথে এনেছিল বৌদিকেই পরাবে বলে···গান গাইবার সময়ে সে আবার সেটা বৌয়ের গলায় আলগোছে পরিয়ে দিলে—সেই জ্যোৎস্নায় সাদা সুগন্ধি ফুলের মালা গলায় রূপসী বৌয়ের মুখে ভজন শুনতে-শুনতে মণ্টুর মা'র

মনে হলো এই মেয়েটিই সেই মীরাবাঈ, অনেককাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে, আবার সবাইকে ভক্তির গান গাইয়ে শোনাচ্ছে।

মণ্টুর মা একটু-একটু বাইরের খবর রাখতেন, যাত্রায় একবার মীরাবাঈ পালা দেখেছিলেন তাঁর বাপের বাড়ির দেশে।

তারপর আর একখানা হিন্দীগান গাইলে বৌ, এঁরা অবশ্যি কিছু বুঝলেন না। তবে তন্ময় হয়ে শুনলেন বটে।

তারপর একখানা বেহাগ ; বাংলা গান এবার। সকলে শুয়ে পড়লো, শান্তির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। অনেক দেখলে বৌয়েরও চোখ দিয়ে জল পড়ছে গান গাইতে-গাইতে—রূপসী গায়িকা একেবারে যেন বাহ্যজ্ঞান ভুলে গিয়েছে গানে তন্ময় হয়ে।

সেদিন থেকেই সকলে শ্রীপতির বৌকে অন্য চোখে দেখতে লাগলো।

ওর সম্বন্ধে ক্রমে উচ্চধারণা করতে সকলে বাধ্য হ'ল, আরও নানা ঘটনায়। পাড়াগাঁয়ে সকলেই বেশ হুঁশিয়ার, একথা আগেই বলেছি। ধার দিয়ে—সে যদি এক খুঁচি চাল কি ছু' পলা তেলও হয়—তার জন্যে দশবার তাগাদা করতে এদের বাঁধে না। কিন্তু দেখা গেল শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনও না বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিসটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্ত-হস্ত সে বিষয়ে—কিন্তু আদায় করতে জানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই,হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনো দেখেনি।

শ্রীপতির বৌয়ের আপন-পর জ্ঞান নেই, এটাও সবাই দেখলে। পাশের বাড়িতে চক্কত্তি-গিন্নী বিধবা, একাদশীর দিন-ছুপুরে তিনি নিজের ঘরে মাছুর পেতে শুয়ে আছেন, শ্রীপতির বৌ একবাটি তেল নিয়ে এসে তাঁর পায়ে মালিশ করতে বসে গেল। যেন ও তাঁর নিজের ছেলের বৌ!

চক্কত্তি-গিন্নী একটু অবাক হলেন প্রথমটা। পাড়াগাঁয়ে এরকম কেউ করে না, নিজের ছেলের বৌয়েই করে না তো অপরের বৌ!

—এসো-এসো, মা আমার এসো। থাক্-থাক্ তেল মালিশ আবার কেন মা? তোমায় ওসব করতে হবে না, পাগলী মেয়ে—

এই পাগলী মেয়েটি কিন্তু শুনলে না। সে জোর করেই বসে গেল তেল মালিশ করতে। মাথায় চুল এসে অগোছালো ভাবে উড়ে পড়েছে মুখে,

সুগৌর মুখে অতিরিক্ত গরমে ও শ্রমে কিছু-কিছু ঘাম দেখা দিয়েছে—চক্কত্তি-গিন্নী এই সুন্দরী বৌটির মুখ থেকে চোখ যেন অন্যদিকে ফেরাতে পারলেন না। বড় স্নেহ হ'ল এই আপন-পর জ্ঞান-হারা মেয়েটার ওপর।

ইতিমধ্যে কমলার বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে সে শ্রীপতির বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লে—বৌদিদি, তোমায় কি করে ছেড়ে থাকবো ভাই? মাকে ছেড়ে যেতে যত কষ্ট না হচ্ছে, তত হচ্ছে তোমায় ছেড়ে যেতে! ··এই একটা ব্যাপার থেকেই বোঝা যাবে শ্রীপতির বৌ এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে গ্রামের তরুণী-মনের ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পূজার সময় এসে পড়েছে। আশ্বিনের প্রথম, শরতের নীল আকাশে অনেকদিন পরে সোনালী রোদের মেলা, বনসিমের ফুল ফুটেছে ঝোপে-ঝোপে, নদীর চরে কাশ ফুলের শোভা। পাশের গ্রাম সত্রাজিৎপুরে বাঁড়ুজ্যে-বাড়ি পুজো হয় প্রতি বৎসর, এবারও শোনা যাচ্ছে মহানবমীর দিন তাদের বাড়ি আর বছরের মত যাত্রা হবে কাঁচড়াপাড়ার দলের।

শ্রীপতির বৌ গান-পাগলা মেয়ে, এ কথাটা এতদিনে এ গাঁয়ের সবাই জেনেছে। তার দিন নেই, রাত নেই, গান লেগে আছে, দুপুরে-রাত্রে রোজ এসরাজ বাজায়। গান সম্বন্ধে কথা সর্বদা তার মুখে। শান্তির এখনও বিয়ে হয়নি, যদিও সে কমলার বয়সী। শ্রীপতির বৌয়ের কাছে আজকাল দিনরাত্ত লেগে থাকে গান শেখবার জন্যে।

একদিন শ্রীপতির বৌ তাকে বল্লে—ভাই শান্তি, এক কাজ করবি, সত্রাজিৎপুরে তো যাত্রা হবে বলে সবাই নেচেছে। আমাদের পাড়ার মেয়েরা তো আর দেখতে পাবে না? তারা কি আর অপর গাঁয়ে যাবে শুনতে? অথচ এরা কখনো কিছু শোনে না—আহা! এদের জন্যে যদি আমরা আমাদের পাড়াতেই থিয়েটার করি?

শান্তি তো অবাক। থিয়েটার! তাদের এই গাঁয়ে? থিয়েটার জিনিসটার নাম শুনেছে বটে সে, কিন্তু কখনো দেখেনি। বটে—কি করে করবে বৌদি, কি যে তুমি বলো! তুমি একটা পাগল।

শ্রীপতির বৌ হেসে বলে—সে'সব বন্দোবস্ত আমি করবো এখন। তোকে ভেবে মরতে হবে না—দ্যাখ্ না কি করি।

সপ্তাহখানেক পরে শ্রীপতি যেমন শনিবারের দিন বাড়ি আসে তেমনি এল। সঙ্গে তিনটি বড় মেয়ে ও তুটি ছোট মেয়ে ও চার পাঁচটি ছেলে। বড় মেয়ে তিনটির ষোল-সতেরো এমনি বয়সের, সকলেই ভারী সুন্দরী, ছোট মেয়ে তু'টির মধ্যে যেটির বয়েস তেরো, সেটি তত সুবিধে নয়, কিন্তু যেটির বয়েস আন্দাজ দশ—তাকে দেখে রক্তমাংসের জীব বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন মোমের পুতুল। ছেলের বয়েস পনেরোর বেশী নয় কারো। সকলেই সুবেশ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন।

শান্তি, শান্তির মা এবং চক্কত্তি-গিন্নী তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপতির বৌ ওদের দেখে ছুটে গেল রোয়াক থেকে উঠোনে নেমে। উচ্ছ্বসিত আনন্দের সুরে বলে—এই রমা, পিণ্টু, তারা, এই যে শিবু আয় আয় সব, কেমন আছিস্? ওঃ কতদিন দেখিনি তোদের—

রমা বলে ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী, ওর গলা জড়িয়ে ধরলে, সকলেই ওকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলো।

সবাই বললে, দিদি কেমন আছিস্ ভাই—

—একটু রোগা হয়ে গেছিস্ দিদি—

—ওঃ, কতদিন যে তোকে দেখিনি—

—দাদাবাবু যখন বলেন তোর এখানে আসতে হবে আমরা তো—

—আহিরীটোলাতে মিউজিক কম্পিটিশন ছিল—নাম দিয়েছিলাম—ছেড়ে চলে এলাম—

মেয়েগুলির মুখ রং, গড়ন শ্রীপতির বৌয়ের মত। রমা তো একেবারে হুবহু ওর মত দেখতে, কেবল যা কিছু বয়সের তফাত। জানা গেল মেয়ে তুটির মধ্যে রমা ও তার ছোট সতী, এবং ছেলেদের মধ্যে বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে শিবু শ্রীপতির বৌয়ের আপন ভাইবোন, বাকী সবাই কেউ খুড়তুতো, কেউ জ্যাঠতুতো ভাই-বোন। ক্রমে আরও জানা গেল শ্রীপতির বৌ এদের চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছে থিয়েটার করানোর জন্যে।

পাড়ার সবাই এদের রূপ দেখে অবাক্। এসব পাড়াগাঁয়ে অমন চেহারার ছেলে-মেয়ে কেউ কল্পনাই করতে পারে না। দশ বছরের সেই ছেলেটার নাম পিণ্টু, সে শান্তির বড় ন্যাওটা হয়ে গেল। সে আবার একটা সাঁতার দেবার নীল রঙের পোষাক এনেছে, সিল্ক নীল পোশাকে

সুগৌর দেহে যখন সে নদীর ঘাটে স্নান করে দাঁড়ায়—তখন ঘাটসুদ্ধ মেয়েরা —বোস-গিন্নী, মন্টুর মা, শান্তির মা, মজুমদার-গিন্নী ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। রূপ আছে বটে ছেলেটির! শান্তি দস্তুরমত গর্ব অনুভব করে, যখন পিন্টু অনুযোগ করে বলে—আঃ শান্তিদি আসুন না উঠে, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? আসুন বাড়ি যাই।

পুজো এসে পড়লো। এ-গাঁয়ে কোনো উৎসব নেই পুজোয়, গরীব-দের গাঁয়ে পুজো কে করবে? দূর থেকে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুজ্যে-বাড়ির ঢাক শুনেই গাঁয়ের মেয়েরা সন্তুষ্ট হয়। ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে মেয়েদের পুজো দেখবার রীতি না থাকায় অনেকে দশ-পনেরো কি বিশ বছর দুর্গা প্রতিমা পর্যন্ত দেখেনি। মেয়েদের জীবনে কোনো উৎসব-আমোদ নেই এ গাঁয়ে!

শ্রীপতির বৌ তাই একদিন শান্তিকে বলেছিল—সত্যি কি করে যে তোরা থাকিস্, ঠাকুরঝি—একটু গান নেই, বাজনা নেই, বই পড়া নেই, মানুষে যে কেমন করে থাকে এমন করে! বোধ হয় সেই জন্যেই এত উৎসাহের সঙ্গে ও লেগেছিল থিয়েটারের ব্যাপারে।

শ্রীপতিদের বাড়ির লম্বা বারান্দার একধারে তক্তপোষ পেতে দড়ি টাঙিয়ে হলদে শাড়ি ঝুলিয়ে স্টেজ করা হয়ে।

শান্তি বলে—তুমি এতো জানলে কি করে বৌদি?

রমা বলে—তুমি জানো না দিদিকে শান্তি। দিদি অল্ বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে—

শ্রীপতির বৌ ধমক দিয়ে বোনকে থামিয়ে দিয়ে বলে—নে-নে—যা, অনেক কাজ বাকী, এমন তোর অত বক্তৃতা করতে হবে না দাঁড়িয়ে—

রমা না থেমে বলে—আর খুব ভাল পার্ট করার জন্যেও সোনার মেডেল পেয়েছে—যতবার পয়লা বোশেখের দিন আমাদের বাড়ীতে থিয়েটার হয়, দিদিই তো তার পাণ্ডা—জানো আমাদের কি নাম দিয়েছেন জ্যাঠামশায়?

শ্রীপতির বৌ বলে—আবার?

রমা হেসে থেমে গেল।

* * *

মহাষ্টমীর দিন আজ। শুধু মেয়েদের আর ছোট-ছোট ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার। দেখবে শুধু মেয়েরাই—সমস্ত পাড়া কুড়িয়ে সব মেয়ে এসেছে থিয়েটার দেখতে।

ছোট্ট নাটকটি। শ্রীপতির বৌয়ের জ্যাঠামশায়ের নাকি লেখা। রাজকুমারকে ভালবেসেছিল তাঁরই প্রাসাদের একজন পরিচারিকার মেয়ে। ছেলেবেলায় দু'জনে খেলা করেছে। বড় হয়ে দিগ্বিজয়ে বেরুলেন রাজপুত্র, অন্য দেশের রাজকুমারী ভদ্রকে বিবাহ করে ফিরলেন। পরিচারিকার মেয়ে অনুরাধা তখন নব-যৌবনা কিশোরী, বিকশিত মল্লিকা-পুষ্পের মত শুভ্র, পবিত্র। খুব ভাল নাচতে-গাইতে শিখেছিল সে ইতিমধ্যে। রাজধানীর সবাই তাকে চেনে-জানে—নৃত্যের অমন রূপ দিতে কেউ পারা না। এদিক ভদ্রাকে রাজ্যে এনে রাজকুমার এক উৎসব করলেন। সে সভায় অনুরাধাকে নাচতে গাইতে হ'ল রাজপুত্রের সামনে ভাড়া করা নর্তকী হিসাবে। তার বুক ফেটে যাচ্ছে, অথচ সে একটা কথাও বলে না, নৃত্যের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জীবনের ব্যর্থ প্রেমের বেদনা সে নিবেদন করলে প্রিয়ের উদ্দেশ্যে। তারপরে কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে পরদিন একা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শ্রীপতির বৌ অনুরাধা; রমা ভদ্রা। ওর অন্য সব ভাই-বোনরাও অভিনয় করলে। শ্রীপতির বৌ বেশভূষায়, রূপে, গলে দোদুল্যমান জুঁইফুলের মালায় যেন প্রাচীন যুগের রূপকথার রাজকুমারী, রমাও তাই, গানে-গানে অনুরাধা তো স্টেজ্ ভরিয়ে দিলে, আর কি অপূর্ব নৃত্যভঙ্গি। সতী, রমা, পিন্টুও কি চমৎকার অভিনয় করলে, আর কি চমৎকার মানিয়েছে ওদের!

তারপরে বহুকাল পরে পথের ধারে মুমূর্ষু অনুরাধার সঙ্গে রাজপুত্রের দেখা। সে বড় মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য! অনুরাধার গানের করুণ সুরপুঞ্জে ঘরের বাতাস ভরে গেল। চারিদিকে শুধু শোনা যাচ্ছিল কান্নার শব্দ, শান্তি'তো ফুলে-ফুলে কেঁদে সারা।

* * *

অভিনয় শেষ হলো, তখন রাত প্রায় এগারোটা। গ্রামের মেয়েরা কেউ বাড়ি চলে গেল না। তারা শ্রীপতির বৌকে ও রমাকে অভিনয়ের পর আবার দেখতে চায়। শ্রীপতির বৌ ও তার ভাইবোনদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে চক্কত্তি-গিন্নী ও শান্তির মা ও মন্টুর মা খেতে বসিয়ে দিলেন আর ওদের চারিধারে পাড়ার যত মেয়ে।

ও পাড়ার রাম গাঙ্গুলির বৌ বল্লেন—বৌমা যে আমাদের এমন তা তো জানিনে! ওমা এমন জীবনে তো কখনো দেখিনি—

মণ্টুর মা বল্লেন—আর ভাইবোনগুলিও কি সব হীরের টুকরো! যেমন সব চেহারা তেমনি গান—

শান্তি তো তার বৌদির পিছু-পিছু ঘুরছে, তার চোখ থেকে অভিনয়ের ঘোর এখনও কাটেনি, সেই জুঁইফুলের মালাটি বৌদির গলা থেকে সে এখনও খুলতে দেয় নি। ওর দিক থেকে অন্যদিকে সে চোখ ফেরাতে পারছে না যেন।

চক্কত্তি-গিন্নী বলেন—আর কি গলা আমাদের বৌমার আর রমার, পিণ্টু অতটুকু ছেলে, কি চমৎকার করলে!...

শান্তির মা বলেন—পিণ্টু খাচ্ছে না, ছাখ সেজো বৌ। আর একটু দুধ ঘি, ভাত ক'টা মেখে নাও বাবা, চেঁচিয়ে তো ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে।... কি চমৎকার মানিয়েছিল পিণ্টুকে, না সেজ বৌ? একে ফুটফুটে সুন্দর ছেলে...

শ্রীপতির বৌ হাজার হোক্ ছেলেমানুষ, সকলের প্রশংসায় সে এমন খুশী হয়ে উঠলো যে খাওয়াই হলো না তার। সলজ্জ হেসে বলে—জ্যাঠামশায় আমাদের বলেন—কিন্নর দল—এখন ওই নামে আমাদের—

রমা হেসে ঘাড় দুলিয়ে বলে—নিজে যে বললে দিদি, আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমায় তবে ধমক দিলে কেন তখন?

তারা বলে—নামটি বেশ, কিন্নর দল, না? আমাদের শ্যামবাজারের পাড়ায় কিন্নর দল বলতে সবাই চেনে।

রমা বলে, কৃত্রিম গর্বের সঙ্গে—প্রায় এক ডাকে চেনে—হুঁ-হুঁ—

তারপর এই রূপবান বালক-বালিকার দল, সকলে এক যোগে হঠাৎ খিল্‌খিল্ করে মিষ্টি হাসি হেসে উঠলো।

সতী হাসতে-হাসতে বলে—বেশ নামটি কিন্নর দল, না?

এমন একদল সুশ্রী চেহারার ছেলেমেয়ে, তার ওপর তাদের এমন অভিনয় করার ক্ষমতা, এমন গানের গলা, এমনি হাসিখুশী মিষ্টি স্বভাব, সকলেরই মনোহরণ করবে তার আশ্চর্য কি?

মণ্টুর মা ভাবলেন, কিন্নর দলই বটে!...

ওদের খেতে-খেতে হাসি গল্প করতে মহাষ্টমীর নিশি ভোর হয়ে এল।

শ্রীপতির বৌ বল্লে—আসুন, বাকী রাতটুকু আর সব বাড়ি যাবেন কেন? গল্প করেই কাটানো যাক্।

শ্রীপতি বাড়ি নেই. সে সত্রাজিৎপুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ির নিমন্ত্রণে গিয়েছে, আজ রাত্রের যাত্রা দেখে সকালে ফিরবে। সেইজন্যে সকলে বলে, তা ভাল, কিন্তু বৌমা তোমাকে গান গাইতে হবে!

শান্তি বলে—বৌদি, অনুরাধার সেই গানটা গাও আর একবার, আহা, চোখে জল রাখা যায় না শুনলে।

শ্রীপতির বৌ গাইলে. রমা এসরাজ বাজালে। তারপর রমা ও তারা এক সঙ্গে গাইলে।

একটিমাত্র তেড়ো-পাখী বাঁশ গাছের মগ্‌ডালে কোথায় ডাক্ আরম্ভ করেছে। রাত ফরসা হলো। সে মহাষ্টমীর রাত্রির থেকে গ্রামের সবাই জানালে শ্রীপতির বৌ কি ধরণের মেয়ে।

কেবল তারা জানলে না যে শ্রীপতির বৌ প্রতিভাশালিনী গায়িকা, সত্যিকার আর্টিস্ট। সে ভালবেসে শ্রীপতিকে বিয়ে করে এই পাড়াগাঁয়ের বনবাস মাথায় করে নিয়ে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়েছে। যশের আশা, অর্থের আশা, আর্টের চর্চা পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। তবু গানের ঝোঁক ওকে ছাড়ে না—ভূতে পাওয়ার মত পেয়ে বসে—দিনরাত তাই ওর মুখে গান লেগেই আছে, তাই আজ মহাষ্টমীর দিন সেই নেশার টানেই এই অভিনয়ের আয়োজন করেছে।

শান্তি কিছুতেই ছাড়তে চায় না ওকে। বলে, তুমি কোথাও যেও না বৌদিদি, আমি মরে যাবো, এখানে তিষ্ঠতে পারবো না। শান্তি আজকাল শ্রীপতির বৌয়ের কাছে গান শেখে, গলা মন্দ নয় এবং এদিকে খানিকটা গুণ থাকায় সে এরই মধ্যে বেশ শিখে ফেলেচে। কিছু-কিছু বাজাতেও শিখেচে। গান-বাজনায় আজকাল তার ভারী উৎসাহ। শ্রীপতির বৌ তো গান-বাজনা যদি পেয়েছে, আর বড় একটা কিছু চায় না, শান্তির সঙ্গীত শিক্ষা নিয়েই সে সব সময় মহাব্যস্ত।

অগ্রহায়ণ মাসের দিকে বৌয়ের বাড়ি থেকে চিঠি এল রমা কি হয়ে হঠাৎ মারা গিয়েচে। শ্রীপতি কলকাতা থেকে সংবাদটা নিয়ে এল। শ্রীপতির বৌ খুব কান্নাকাটি করলে। পাড়াশুদ্ধ সবাই চোখের জল ফেললে ওকে

সান্ত্বনা দিতে এসে।

শান্তি সব সময় বৌদির কাছে-কাছে থাকে আজকাল। তাকে একদিন শ্রীপতির বৌ বল্লে জানিস্ শান্তি, আমাদের কিন্নর দল ভাঙতে শুরু করেছে, রমাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, আমার মন যেন বলছে···

শান্তির বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, ধমক দিয়ে বলে, থাক কি যে বল বৌদি!

কিন্তু শ্রীপতির বৌয়ের কথাই খাটলো।

সে ঠিকই বলেছে, শান্তি ঠাকুরঝি কিন্নর দলে ভাঙন ধরেছে।

রমার পরে ফাল্গুন মাসের দিকে গেল পিণ্টু বসন্ত রোগে। তার আগেই শ্রীপতির বৌ মাঘ মাসে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রসব করতে গিয়ে সেও গেল।

এ সংবাদ গ্রামে যখন এল, শান্তি তখন সেখানে ছিল না, সেই বোশেখ মাসে তার বিবাহ হওয়াতে সে তখন ছিল মেটিরি বাণপুর, ওর শ্বশুর-বাড়িতে। গ্রামের অন্য সবাই শুনলে, অনাত্মীয়ের মৃত্যুতে খাঁটি অকৃত্রিম শোক এ রকম এর আগে কখনো এ গাঁয়ে করতে দেখা যায় নি। রায়-গিন্নী, চক্কত্তি-গিন্নী, শান্তির মা, মণ্টুর মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটি কোথা থেকে দু'দিনের জন্যে এসে তার গানের সুরের প্রভাবে সকলের অকরুণ কুটিল ভাবে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, সে পরিবর্তন যে কতখানি, ওই সময়ে গাঁয়ের মেয়েদের দেখলে বোঝা যেতো। ওদের চক্কিত-বাড়ির দুপুর বেলায় আড্ডায়, স্নানের ঘাটে শ্রীপতির বৌয়ের কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না।

চক্কত্তি-গিন্নী শোক পেয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশী। শ্রীপতির বৌয়ের কথা উঠলেই তিনি চোখের জল সামলাতে পারতেন না। বলতেন, দু'দিনের জন্যে এসে মা আমার কি মায়াই দেখিয়ে গেল! আমার পেটের মেয়ে অমন কক্খনো করেনি···আহা! আমার পোড়া কপাল, সে কখনো এ কপালে টেঁকে!

মণ্টুর মা বলতেন, সে কি আর মানুষ! দেবী অংশে ওসব মেয়ে জন্মায়। নিজের মুখেই বলতো হেসে-হেসে, 'আমার কিন্নর দল খুড়ীমা', শাপভ্রষ্ট কিন্নরীই তো ছিল।···যেমন রূপ, তেমনি স্বভাব, তেমনি গান···

ওকি আর মানুষ, মা!

কথা বলতে-বলতে মন্টুর মা'র চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তো।

এসবের মধ্যে কেবল কথা বলতো না শান্তি। তার বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয় নি, ভেবেছিল বাপের বাড়ি এসে বৌদিদির সঙ্গে অনেকখানি জ্বালা জুড়োবে। পূজোর পরে কার্তিক মাসের প্রথমে বাপের বাড়ি এসে সে সব শুনেছিল। বৌদিদি যে তার জীবন থেকে কতখানি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, তারা এরা কেউ জানে না। মুখে সে-সব পাঁচজনের সামনে ভ্যাজ্-ভ্যাজ্ করে বলে লাভ কি? কি বুঝবে লোকে?

বছর দুই পরে একদিনের কথা। গাঁয়ের মধ্যে শ্রীপতির বৌয়ের কথা অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছে। শ্রীপতিও অনেকদিন পরে আবার গ্রামের বাড়িতে যাওয়া-আসা করছে শনিবারে কিংবা ছুটিছাটাতে।

শ্রীপতিদের বাড়ি থেকে শান্তিদের বাড়ি বেশী দূর নয়, দু'খানা বাড়ির পরেই। শান্তি তখন এখানেই ছিল। অনেক রাত্রে সে শুনলে শ্রীপতিদাদাদের বাড়িতে কে গান গাইছে। ঘুমের মধ্যে গানের সুর কানে যেতেই সে ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলে।

বিরহিনী মীরা জাগে তব অনুরাগে, গিরিধর নাগর—

এ কার গলা? ওর গা শিউরে উঠলো। ঘুমের ঘোর এক মুহূর্তে ছুটে গেল। কখনো সে ভুলবে জীবনে এ গান এ গলা! সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে ওদের রোয়াকে জ্যোৎস্না রাত্রে বসে এই গানখানাই বৌদিদি প্রথম গেয়েছিল! সেই অপূর্ব করুণ সুর গানের সুরের প্রতি মোচড়ে যেন একটি বিষণ্ণ আকাঙ্খার প্রাণঢালা আত্মনিবেদন! এ কি আর কারো গলার—ওর কুমারী জীবনের আনন্দভরা দিনগুলির কত অবসর প্রহর যে এ কণ্ঠের সুরে মধুময়!

ও পাগলের মত ছুটে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

রাত অনেক। কৃষ্ণাতৃতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর পৌঁছেচে। ফুটফুটে শরতের জোৎস্নায় বাঁশবনে তলা পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে।

ঠিক যেন তিন বছর আগেকার সেই মহাষ্টমীর রাত্রির মত।

শান্তির মা ইতিমধ্যে জেগে উঠে বল্লেন, ও কে গান করছে রে শান্তি? তারপর তিনিও তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন। শ্রীপতিদের বাড়ি তো কেউ

থাকে না, গাইবে কে? ওদিকে মণ্টুর মা মণি, বাদল সবাই জেগেছে দেখা গেল।

প্রথমেই এরা সবাই ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। শ্রীপতি কখন রাতের ট্রেনে বাড়ি এসেছিল, কেউ লক্ষ্য করেনি। সে কলের গান বাজাচ্ছে। ওদের সাড়া পেয়ে সে বাইরে এসে বলে—আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে আজ চেয়ে আনলুম ওর গানখানা। মরবার ক'মাসে আগে রেকর্ডে গেয়েছিল।

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শান্তি প্রথমে সে নীরবতা ভঙ্গ করে আস্তে-আস্তে বলে—ছিরুদা, রেকর্ডখানা আর একবার দেবে!

পরক্ষণেই একটি অতি সুপরিচিত, পরমপ্রিয়, সুললিত কণ্ঠের দরদভরা সুরপুঞ্জে পাড়ার আকাশ-বাতাস, স্তব্ধ জোৎস্না রাত্রিটা ছেয়ে গেল। মানুষে মনের কি ভুলই যে হয় অল্পক্ষণের জন্যে শান্তির মনে হলো তার কুমারী জীবনের সুখের দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে, যেন বৌদিদি মরেনি, কিন্নরের দল ভেঙে যায়নি, সব বজায় আছে। এই তো সামনে আসছে পুজো, আবার মহাষ্টমীতে তাদের থিয়েটার হবে, বৌদিদি গান গাইবে। গান থামিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে বলবে—কেমন শান্তি ঠাকুরঝি, কেমন লাগলো!

———

মূলো-র‍্যাডিশ-হর্স-র‍্যাডিশ

নবীনবাবু ঘুম হইতে উঠিয়া কয়লা চাকরকে ডাকাডাকি করিতেছেন। শুনিতে পাইয়াও আবার চাদর মুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া এবং তার একটু পরে বোধ হয় ঘুমাইয়াছি। জানালার ফাঁক দিয়া পাশের আতা-গাছের ডাল যখন দেওয়ালের গায়ে অনেকখানি রোদের মধ্যে ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে, তখন কয়লার ডাকে তন্দ্রা ভাঙিলা।

বাবুজি, চা তৈয়ার!

— চা? এখানে নিয়ে আয়, বিছানায়।

নবীনবাবু বোধ হয় প্রাতঃভ্রমণ সারিয়া আমার ঘরের পাশের সরু করিডোর দিয়া গট্‌গট্‌ করিয়া চলিয়া গেলেন, আমার আলস্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই বেশ জোরে-জোরে পা ফেলিয়া গেলেন। চা-পান বিছানায় বসিয়াই শেষ করিয়া উঠিব-উঠিব ভাবিতেছি, এমন সময় নবীনবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার বিছানার পাশের দিকের জানালার পাশের দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—উঠুন মশাই, যোধপুরী মূলো এসেছে, র‍্যাডিশ।

আমি চটি পায়ে দিতে-দিতে বলিলাম—হর্স র‍্যাডিশ। একা, না মিস সোরাবজিকে নিয়ে?

নবীনবাবু রাগ করিয়া বলিলেন—আসুন না, উঠেই আসুন না। মিস সোরাবজির বাবা-মার দায় পড়েছে ওর সঙ্গে মেয়েকে পাঠাতে সকাল বেলা। একাই এসেছে।

পরে পিছন ফিরিয়া বলিলেন—আচ্ছা রোজ কেন সকালে এসে জোটে বলুন তোর? বিরক্ত করলে! আর আপনিও আটটার আগে বিছানা উঠবেন না একদিনও—

বললাম—আপনার উক্তি দু'টির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধটা কি ভাল বুঝলাম না নবীনদা—

—বুঝবেন-বুঝবেন—শীগগিরই বুঝবেন। যদি সকালে বেরিয়ে

যাই, তা'হলে আর এ হাঙ্গামা এসে জোটে না সকালবেলা। এখন চা করো রে, ভ্যাজ-ভ্যাজ করে বকো রে—

—নবীনবাবু, শিওরলি ইউ ডোণ্ট গ্রাজ ইওর গেস্ট এ কাপ অব টি।

—থাক-থাক, হয়েছে—ভারী আমার গেস্ট রে!

যাহার অভ্যর্থনার আয়োজন এত হৃদ্যতাপূর্ণ, সে বেচারী নির্বিকার ভাবে হাসিমুখে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। আমায় দেখিয়াই হাত বাড়াইয়া পরম বন্ধুত্বের সুরে বলিল—গুডমর্নিং মিষ্টার রায়!

আমি হাত ঝাঁকাইতে-ঝাঁকাইতে পরিপূর্ণ অমায়িকতার সঙ্গে বলিলাম—গ্ল্যাড ইউ হ্যাভ কাম মিঃ শুকরাম—গুডমর্নিং।

নবীনবাবু উদাসীনভাবে অতিথির করমর্দন করিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, বসুন মিঃ শুকরাম। আমি একবার জেনারেল পোস্টাপিস থেকে একটা তার করে আসি, আপনি ততক্ষণ চা খান।

আমার দিয়ে চাহিয়া বাংলায় বলিলেন—মূলোকে শীগ্‌গির ভাগাবার চেষ্টা করুন। আজ এখুনি আমাদের বেরুতে হবে, কাজ আছে অনেক।

মূলো যাহাকে বলা হইয়াছে, সে বাংলার একবর্ণও বোঝে না, তাই রক্ষা। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা ইংরেজিতেই হয়।

মূলো জাঁকিয়া বসিয়া আমায় বলিল—বাঙালীদের মত লুচি করে খাওয়াচ্ছেন মিঃ রায়? ও আমার বড় ভাল লাগে। আমি বাঙালীদের সঙ্গে একবার মিশেছিলাম—লুচি খাইয়েছিল। সে এখনও ভুলিনি।

শুনিয়া মনে-মনে বলিলাম—নবীনদার পিত্তি জ্বলে যেত · যদি কথাটা শুনত। ভ্যাগিস নেই এখানে। যে অভ্যর্থনার ঘটা তাঁর! কয়লা চাকরকে ডাকিয়া খানকতক লুচি ভাজিতে বলিতে গিয়া শুনিলাম ঘি ও ময়দা বাজার হইতে না আনিলে চলিবে না, ফুরাইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম অতিথির অদৃষ্টে লুচি নাই। নবীনবাবু হয়তো ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িতে পারেন। দরকার নাই সেসব হাঙ্গামায়। চা ও টোস্ট খাওয়াইয়া দিলাম মূলোকে। মূলো তাহার স্বভাব-সিদ্ধভাবে বকিতে শুরু করিয়া দিল। বকুনি আর থামায় না, বেলা ন'টা বাজিয়া গেল, তবুও তাহার হুঁশ নাই। ইতিমধ্যে নবীনবাবু আসিয়া পড়িলেন, মূলোকে তখনও বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্তির সহিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—মূলোটা

এখনও যায়নি ? হর্স র‍্যাডিশটা ?

—না গেলে তো তাড়িয়ে দিতে পারি নে। ও বলছে আমাদের সঙ্গে খিনসি লেক দেখতে যাবে।

—মাটি করেছে। সারলে দেখছি।

মূলো আমাদের কথাবার্তা বুঝিতে না পারিয়া বলিল—মিঃ রায় খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে কি বলছেন ?

নবীনবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া, অবশ্য ইংরেজিতে বলিল—খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করছি ওর সঙ্গে। আপনি আসবেন নাকি আমাদের সঙ্গে ?

—নিশ্চয় মিঃ বোস, খুব খুশীর সঙ্গে।

—বেশ-বেশ। বড় আনন্দ হলো। বড় খুশী হলাম।

আমি বলিলাম—মিঃ শুকরামের মত সঙ্গী পেলে তো খিন্‌সি তো খিন্‌সি, উত্তর মেরুতে গিয়েও সুখ আছে।

নবীনবাবু ইংরেজিতে সায়সূচক কথা বলিয়া আমায় বাংলাতে বলিলেন—স্বর্গেও যদি যায় মূলোকে নিয়ে স্বর্গের হাওয়া পর্যন্ত নোনতা হয়ে উঠবে, ওকে ভাগাবার চেষ্টা করো।

মূলো বলিল—তাহ'লে কখন রওনা হবো আমার মিঃ বোস ?

—রওনা ? সে তো এখনও ঠিক হয়নি দেখি—

—যদি বলেন আমার এক জানাশোনা গাড়ী আছে—পেট্রোলের খরচটা দিলেই রাজী হয়ে যাবে। বলব তাকে ?

—বলুন না, বেশ-বেশ।

আমরা সবাই বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

পরদিন মূলোর চেষ্টাতে গাড়ীর যোগাড় হইয়া গেল। আহারাদি সারিয়া আমার তিনজনে শহর হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী খিনসি হ্রদ দেখিতে রওনা হইলাম। নাগপুর, জব্বলপুর রোডের যে স্থানটি হইতে খিনসি হ্রদের রাস্তা বাহির হইল, ঠিক সেই জায়গাটিতে পড়ে মান্‌সারের ম্যাঙ্গানিজ খনি।

মূলো আমাদের সঙ্গে আসিতে পাইয়া বড়ই খুশী হইয়া উঠিয়াছে, এবং ভীষণ বকুনি শুরু করিয়াছে। নবীনবাবু বাংলায় বলিলেন—মূলোটা তো এই

বড্ড জ্বালাচ্ছে হে! ওকে ম্যাঙ্গানিজের মাইন্‌-এ রেখে গেলে কেমন হয়?

মূলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মিঃ বোস?

তাহার সব বাংলা কথার মানে জানা চাই।

নবীনবাবু উত্তর দিলেন—এই ম্যাঙ্গানিজ খনিটা ইণ্ডিয়ার মধ্যে একটা বড় খনি, তাই বলছি।

নাগপুরে আমরা দু'জনে আসিয়াছি বেড়াইতেও বটে, কিছু ইন্সিওরের আসামী জোগাড় করিতেও বটে। সিভিল লাইনে কোতোয়াল সাহেবের বাংলো ভাড়া লইয়া যেদিনটা বারান্দায় ক্যানভাসের আরাম-কেদারা পাতিয়া বসিয়া একটি সিগারেট ধরিয়াছে—সেদিন এবং সেই মূহূর্তে এই লোকটি আসিয়া আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিয়াছে। একটি তরুণ যুবককে বাড়ীর হাতায় ঢুকিতে দেখিয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আগাইয়া গেলাম এবং ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—কাকে চান?

যুবকটির চেহারা একহারা দাঁত উঁচু, শ্যামবর্ণ, দুই একটা বসন্তের ছোট-ছোট চোখ, পরনে নিখুঁত সাহেবী পোশাক। সে একগাল হাসিয়া বলিল—আপনারা এই বাসাভাড়া নিয়েছেন? বাঙালী? সে আমি দেখেই বুঝেছি। সেইজন্যই এলাম—বাঙালীর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আমার অনেক দিন থেকে আছে।

বলিলাম—আসুন-বসুন। এইখানেই বাড়ী বুঝি?

যুবক পাশের চেয়ারে বসিয়া বলিল—দেশ আমার যোধপুর। এখানে কলেজে পড়ি—ফোর্থ ইয়ারে।

—বেশ-বেশ। একটু চা খান—

সেই হইতে ইহার যাতায়াত শুরু। এমন একটি দিন যায় নাই, যেদিন ছোকরা দু'বেলা আসে নাই এবং নানাপ্রকার আলোচনার অবতারণা করে নাই। দিন কয়েক পরেই নবীনবাবু এবং আমি আবিস্কার করিলাম যে ছোকরা কিছু স্থুলবুদ্ধি, ঠিক সকালে ও বিকেলে চা পানের আগে আসিয়া জুটিবে এবং দুপুর পর্যন্ত বসিয়া-বসিয়া শুধু বকিবে—উঠিবার নামটি করিবে না। বাধ্য হইয়া প্রায়ই দুপুর-রাত্রে—কোন-কোন দিন দু'বেলাই তাহাকে খাইতে বলিতে হইয়াছে। সে খাইয়াছেও। এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও সে বুঝিতে পারে না।

হয়তো নবীনবাবু বলিলেন—মিঃ শুকরাম (তাহার নাম রত্নাকর শুকরাম জৈন), ওবেলা আমরা একটু হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে বেড়াতে যাব, বিকেলটাতে থাকব না।

—বেশ-বেশ, আমি সন্ধ্যের পর আসব।

—ও, তা বেশ। তবে বোধ হয় ফিরতে একটু দেরীই হবে।

—না হয় আমি একটু রাত করেই আসব এখন। আপনারা অনেক উঁচু বিষয়ে কথাবার্তা বলেন—আমার শুনতে বড় ভাল লাগে। এই জন্যেই আমি বাঙালীদের সঙ্গে মিশতে বড় ভালবাসি। তা এখানে বাঙালী বেশি নেই—যাঁরা আছেন, তাঁরা বড় মেশেন না।

এই ধরনের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়ার দরুণ আমরা তাহাকে 'মূলো' আখ্যা দিলাম এবং তাহার সাক্ষাতে পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বাংলায় তাহাকে 'মূলো' বলিয়া উল্লেখ করিতাম। কখনও কখনও 'মূলো'র ইংরেজি অনুবাদ করিয়া তাহার সামনেই তাহাকে 'র‍্যাডিশ', কখনও 'হর্স র‍্যাডিশ' বলিতাম বেচারা আমাদের বাংলা কথার অর্থ একবর্ণও বুঝিত না। 'মূলো' কথার ইডিয়ামগত অর্থই বা বুঝিবে কিরূপে। মাঝে-মাঝে আমাদের মুখে 'র‍্যাডিশ', 'হর্স র‍্যাডিশ' শুনিয়াও কিছু না বুঝিয়া হয়তো ভাবিত—ইহারা এ তিনটা কথা এত ব্যবহার করে কেন?

আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র বটে, কিন্তু 'মূলো'র বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বিশেষ নয়, একজন ভাল বাঙালী ম্যাট্রিক ছাত্র তাহার অপেক্ষা অনেক কিছু জানে। বলা বাহুল্য, অবাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধে ধারণা স্বভাবত খুব উচ্চশ্রেণীর নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়? রামোঃ, এখানে মানুষ আছে কে?

আমাদের এই মনোভাবের পটভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মূলোর ন্যায় একজন স্থূলবুদ্ধি ছাত্রের যে দুর্দশা এরূপ দাঁড়াইবে, আমাদের বিচারের মাপকাঠিতে ইহা আর বেশি কথা কি!

মজার ব্যাপার এই, যাহাকে লইয়া এই ব্যাপার সে কিছুই বুঝিত না। বরং ভাবিত, আমাদের মত অমায়িক বাঙালী ভদ্রলোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সে লাভবান হইয়াছে। এজন্য সে মাঝে-মাঝে গর্বও করিত।

মূলোর মুখে শুনিয়াছিলাম ম্যাঙ্গানিজ খনির ম্যানেজারের সঙ্গে তার আলাপ আছে। গাড়ী জব্বলপুর রোডের উপর খনির সামনে দাঁড়াতেই সে দোর খুলিয়া গেল ম্যানেজারকে খবর দিতে। যেন আমরা লাট সাহেব আসিয়াছি মান্‌সারের ম্যাঙ্গানিজ খনি দর্শন করিতে এমনভাবে সে হন্তদন্ত অবস্থায় আমাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। ইনি মিঃ বোস, ইনি মিঃ রায়—বাঙালী, খুব পণ্ডিত লোক এঁরা দুজনেই। আমার বিশেষ বন্ধু।

—কি মুশকিল। পাণ্ডিত্যের মধ্যে তো আমরা করি ইন্‌সিরেন্সের দালালি! অবশ্য আমাদের প্রাচীন কীর্তি ও পুরাতত্ত্বের ওপর ঝোঁক আছে —কিন্তু সে ফটোগ্রাফির দিক হইতে, বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের দিক হইতে নয়।

মুলোর কাণ্ড দেখিয়া অমারা মনে-মনে কৌতুক অনুভব করিলাম।

ম্যানেজার নাগপুরের লোক, ছিন্দাওয়ারা জেলার অধিবাসী, বেশ ইংরেজি বলে। জব্বলপুর রোড়ে গাড়ী দাঁড় করাইয়া আমরা প্রায় দু' শ ফুট চড়াই ভাঙিয়া খনির মুখে গিয়া পৌঁছিলাম। একটা ক্ষুদ্র ডন্‌কি এঞ্জিনে খাদের জল তুলিয়া লম্বা রবার ও তারের নল দিয়া পাহাড়ের পাশ দিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে ছোটখাটো একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে— সেটা দেখিয়া আমরা সকলে খুশী হইলাম।

ম্যানেজার আমাদের চা পান করিতে বলিলে আমরা অস্বীকার করিয়া আবার নীচে নামিয়া মোটরে উঠিলাম। ম্যানেজারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলাম, কষ্ট করিয়া আমাদের সব দেখাইবার জন্য। গাড়ী পুনরায় চলিল।

নবীনদা কহিলেন—মূলো বড্ড গণ্ডগোল করে। আমাদের নিয়ে এমন করছিল!

মূলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মিঃ বোস?

তাহার আবার সকল কথারই মানে জানা চাই।

নবীনদা বলিলেন,—চমৎকার খনিটা, তাই বলছিলাম।

—ও, তা র‍্যাডিশের কথা কি বলছিলেন? এখানে তো র‍্যাডিশ পাওয়া যায় না!

আমরা দু'জনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। নবীনদা বলিলেন,

ওটা একটা বাংলা ইডিয়ম মিঃ শুকরাম। ভাল জিনিসকে বাংলায় আমরা 'মূলো' বলি।

—তাই নাকি? হাউ ইন্টারেস্টিং।

আমি বাংলায় বলিলাম—তোমার মুণ্ডু—বোকারাম কোথাকার!

নবীনদা বলিলেন—মূলো আর সাধে বলে! একেবারে হর্স র‍্যাডিশ।

রামটেকের পাহাড় বাঁদিকে রাখিয়া কিছু দূর গিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের নিবিড় ছায়াভরা বীথিপথে চড়াই-উৎরাই ভাঙিয়া মোটর অপেক্ষাকৃত ধিরে চলিতেছে। শরৎ-অপরাহ্নের অপূর্ব শোভা বনতলে। কোথায় যেন পাকা আতর গন্ধ, দু একটা বনফুলের সুবাসের সঙ্গে যেন শেফালির পরিচিত সুবাস ভাসিয়া আসিতেছে বাতাসের ঝাপটায়। এমন শোভার মধ্যে বসিয়া আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ইনসিওরেন্সের দালালি বিস্মৃত হইয়া গেলাম।

খিন্‌সি হ্রদে উঠিবার সময় পাহাড়ের পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ। অনেক দূর উঠিয়া গেলে শৈলবেষ্টিত হ্রদের শান্ত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হয়। চতুর্দিকের শৈলসানু ঘন বনে সমাকীর্ণ, স্থানটি নিতান্ত নির্জন। একদিকে অপরাহ্নের ছায়া, অপর পারের পাহাড়ের গায়ে হলুদ রঙের রোদ। হ্রদের এপারের ডাকবাংলোয় গিয়া আমার চৌকিদারকে ডাকিয়া চেয়ার বাহির করাইয়া বসিলাম। চৌকিদার আমাদের নির্দেশমত চায়ের জল চড়াইতে বসিল।

নবীনদা ও আমি হ্রদের জলে স্নান করিবার জন্য নামিলাম। বনের মধ্যকার সরু পথ ধরিয়া কতদূর নামিয়া গেলাম দু'জনে। মূলো এসব ভালবাসে না, সে ডাকবাংলোর বারান্দাতে বসিয়াই রহিল। জলের উপরে বুনো শিউলি ফুলের রাশি সকালের রোদে ঝরিয়া পড়িয়াছে—দু'তিন দিনের জমানো ফুলের রাশ। আমার জলের ঢেউ দিয়া একপাশে সরাইয়া স্নান করিলাম। নবীনদা বলিলেন—নেই তো? বড্ড জঙ্গল চারিধারে—

—আশ্চর্য নয় কিছু।

—মূলোটাকে বাঘে না নিয়ে যায়। একা বসে আছে—

—কেন, ড্রাইভার?

—ও চৌকিদারের সঙ্গে গিয়েছে। বলে গেল ফিরতে আধঘণ্টা

দেরি হবে, দুধ আনতে গেল। ভয়ে উপরে উঠিয়া দেখি মূলো নির্বিকারচিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছে। নাগপুর হইতে আমার বম্বে ক্রনিকল্, আগের তারিখের। আমাদের দেখিয়া বলিল—আমেদাবাদের দুটো মিলে স্ট্রাইক হয়েছে বড় জোর—

নবীনদা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—মূলোর কাণ্ড শোন—এমন একটা জায়গায় এসে ওর এখন আমেদাবাদের মিলের কথা বড্ড দরকারী হলো!

কিছুক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ড্রাইভার তাড়াতাড়ি করিতে বলিল। পাহাড়ের পথ, তাহার গাড়ীর আলোটা ভাল নাই—আমরা দেরি করিলে শেষে মুশকিলে পড়িতে হইবে। মূলো বলিল—চলুন মিঃ বোস, আজ যাওয়া যাক, আর কি দেখবেন, দেখা তো হয়ে গেল—

নবীনদা বলিলেন, তোর মুণ্ডু হোল—হতভাগ্য হর্স র‍্যাডিশ।

মূলো বলিল—কি?

—মানে, আমাদের এখন যাওয়ার দরকার তাই বলছি।

—হোয়াট হ্যাজ্ হর্স র‍্যাডিশ টু ডু উইথ ইট?

—বাংলা ইডিয়ম—ওর মানে মূলো খেতে যেমন ঝাল, অথচ দেখতে রাঙা, তেমনি এ জায়গা যতই ভাল হোক—মানে—এই গিয়ে—

আমি নবীনদার সাহায্যে অগ্রসর হইয়া বলিলাম—ঠাণ্ডা লাগতে পারে তাই তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত—বাংলা ইডিয়ম।

মূলো হাসিতে লাগিল। বলিল—হাউফানি, দ্যাট র‍্যাডিশ ইজ অলওয়েজ মিক্সড্ উইথ ইওর ইডিয়ম্‌স্।

খিন্‌সি হ্রদের পাহাড় হইতে নামিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের কুসুমাস্তৃত পথে আমরা রামটেক পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছিলাম। নবীনদার আদেশে ড্রাইভার নাগপুরের রাস্তা ছাড়িয়া বন্য আতাবৃক্ষ শোভিত রামটেক পাহাড়ের ঘোরানো পথ ধরিল। মূলোর এ জিনিসটা মনঃপূত হইল না। সে দু-একবার মৃদু প্রতিবাদও করিল, বিশেষ কোন ফল হইল না। আসল কথাটা আমরা জানিতাম। মিস সোরাবজি নামে একটি পার্শী তরুণীর সঙ্গে মূলো ভাব জমাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে আজ মাস ছ-সাত ধরিয়া। মেয়েটির বাবা নাগপুরের ডাক্তার, তাহাদের বাড়ী সন্ধ্যাবেলাটা কাটানো মূলোর অনেক দিনের অভ্যাস, যদিও মেয়ের বাপ-মা তাহা যে খুব পছন্দ

করে, তাহা নয়। মূলোর মুখে শুনিয়াই বুঝিয়াছি তাঁহাদের বাড়ী না আসে। কিন্তু মূলোর বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির স্থূল আবরণ তাঁহার ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই।

পাহাড়ের নীচে গাড়ী রাখিয়া আমরা সিঁড়ি বাহিয়া উপরিস্থিত রাম-সীতার মন্দিরে উঠিতেছি। মূলো বলিল—মিঃ রায় একদিন মিস সোরাবজি বলেছিল রামটেকের মন্দির দেখবে, বড় ভাল হতো যদি আজ আনতাম।

নবীনদা আমার গা টিপিলেন। আমার হাসি পাইতেছি, অতি কষ্টে চাপিলাম।

পাথরে বাঁধানো অনেকগুলি সিঁড়ির দু'ধারে অসংখ্য বন্য আতা, পড়াশি ও তিন্দুক গাছের নিবিড় বন। ডান দিকে অনাবৃত পর্বতগাত্র হেলিয়া থাকিয়া দৈত্যপুরীর মাইলস্টোনের মত দেখাইতেছে। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া-মাখা নিস্তব্ধতার মধ্যে পেশোয়াদের নির্মিত এই শৈলমন্দির দুর্গটি ভারতের অতীত গৌরবের বার্তা বহন করিয়া আনিয়া দিতেছিল আমাদের কানে-কানে। শুধু সে গাম্ভীর্যময় নিস্তব্ধতার তপোভঙ্গ হইতেছিল মূলোর অসম্ভব বকুনি দ্বারা। উপরে উঠিয়া আমরা বিগ্রহ দর্শন করিলাম। সামান্য কিছু প্রসাদ ও চরণামৃত পাইলাম। উঁচু পাহাড়ের উপর মন্দির, অনেক নীচে একদিকে রামটেকের বাজার।

মূলোর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হইত, যদি সে এখানে আসিয়া মিস সোরাবজি সম্বন্ধে কিছু বলিত—আমার ভাবিতাম লোকটার প্রাণে তবুও কবিত্ব আছে। কিন্তু মন্দির-দুর্গের চওড়া প্রাচীরের উপর বসিয়া আমরা যখন দূরের জ্যোৎস্নালোকিত খিন্‌সি হ্রদের দিকে চাহিয়া আছি, মন্দিরে প্রাচীন মারাঠী পুরোহিত রামসীতার আরতি করিতেছেন, পেশোয়ারদের আমলের প্রথানুযায়ী আরতির সময় গম্ভীর নির্ঘোষে রণবাদ্য দামামা ও ডগর বাজিতেছে, ঐদিকে বহুদূরে কাম্‌টি ক্যান্টনমেণ্টের ক্ষীণ সারি, তখন যদি সে তাহার প্রণয়িনীর কথা তুলিত—আমরা ভাবিতাম এই রামগিরি আশ্রমে জনকতনয়ার স্থান হেতু পুণ্যোদয়ের স্পর্শে হর্স-র‍্যাডিশ বুঝি কালিদাসের বিরহী যক্ষের দশা পাইয়া বসিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়, সে মহাড়ম্বরে গল্প জুড়িয়া দিল—দেশের এক মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে সে কি করিয়া ভোট যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে নামিল,

তাহাদের দেশে কি করিয়া 'ফুটেরি' তৈরী করে। আমরা কহিলাম—ফুটেরি কি?

মূলো হাত দিয়া গোলাকার জিনিস দেখাইবার ইঙ্গিতে বলিল—এই এত বড়-বড়, আটার তৈরী, ভেতরে ছাতু, ঘুঁটের আগুনে সেঁকে ঘি দিয়ে খায়, আলুর চোখা আর বেগুনের ভর্তার সঙ্গে।

নবীনদা বলিলেন—মূলোর সঙ্গে নয়?

—নো, র‍্যাডিশ ইজ নট ইটন্—

—আশ্চর্য!

—হোয়াই আশ্চর্য? র‍্যাডিশ ইজ মাচ রেলিশ্ড ইন বেঙ্গল ইট সিম্স্—ব্যাট নট সো ইন আওয়ার ক্যান্ট্রি।

—বুঝলাম।

—আচ্ছা, এই দুর্গের পাঁচিলটা এত চওড়া কেন?

মূলোর স্থূল বুদ্ধিতে আর কতটুকু বোঝা সম্ভব? তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, পেশোয়াদের সময়ে এই মন্দিরটি দুর্গের মত করিয়াই তৈরী হয়—আসিবার পথে অতগুলি ফটক দেখিয়া তাহা সে নিশ্চয়ই কিছু আন্দাজ করিয়াছে। পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথ এই মন্দির-দুর্গ নির্মাণ করিয়া এখানে একটি গুপ্ত ধনাগার স্থাপন করেন। আকস্মিক রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে নাগপুর হইতে বিশ-বাইশ ক্রোশ দূরবর্তী এই অরণ্যাবৃত পাহাড়ের চূড়ায় রামসীতার মন্দিরে তাঁহার ধনভাণ্ডার অনেকটা নিরাপদ থাকিবার ভরসাতেই এটি নির্মিত হয়। বিশেষতঃ তখনকার যুগে না ছিল রেল, না ছিল এখানকার দিনের মত চওড়া মোটর রোড। রামটেকের পাহাড় ছিল দুর্গম অরণ্যভূমির অন্তরালে—শত্রু সন্দেহ করিবে না যে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় কোন্ পাহাড়ে রামসীতার মন্দির—সেখানে আবার ধনভাণ্ডার থাকিতে পারে। তবুও সাবধানের মার নাই ভাবিয়া বালাজি বিশ্বনাথ মন্দিরটিকে দুর্গের মত করিয়াই নির্মাণ করেন—মন্দিরকে মন্দির, দুর্গকে দুর্গ। আবশ্যক হইলে কিছুকাল ধরিয়া এখানে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করাও চলিতে পারিত। জলের অভাব দূর করিবার জন্য পাহাড়ের নীচে একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়—আসিবার সময় যে পুকুরটা ডান দিকে পড়িয়াছিল। মূলো আরাম মুখে রামটেকের মন্দিরের ইতিহাস শুনিয়া

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—আপনি এসব নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করেছেন দেখছি, বহুৎ পড়াশুনো করেছেন। এইজন্যেই তো বাঙালীদের আমি বড় ভালবাসি—বাঙালীর সঙ্গে আলাপ করলে আমার মন বড় খুশী হয়।

মন্দিরের আরতি থামিতে বলিলাম—এখানে একটা অস্ত্রাগার আছে, বইয়ে পড়েছি—চলুন সেটা দেখে আসি সবাই, এখনও আছে বলে জানি।

মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ রংড়ে ব্রাহ্মণ, পূর্বেই পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি প্রথমে মৃদু আপত্তি তুলিলেন, রাত্রে অস্ত্রাগার দেখানোর নিয়ম নাই—অবশেষে আমাদের নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেখিয়া বিগ্রহ যেখানে থাকেন, তাহার পাশের একটা কুঠুরি খুলিয়া দিলেন। আমরা টর্চের আলোয় সেখানে মারাঠী যোদ্ধাদের প্রকাণ্ড চওড়া দুর্বার তলোয়ার, সাতহাত লম্বা বন্দুক, বিশাল ঢাল, লোহার জালে টুপি ও বর্ম, নানা রকমের তীর, আরও কত কি অস্ত্রশস্ত্র দেখিলাম। যোদ্ধজাতির যুদ্ধের উপকরণ পাঁচরকম থাকিবে—ইহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই প্রশংসার ভাব মনে জাগিত হয়তো, যদি বর্গির হাঙ্গামার কথা মনে না উঠিত।

মূলো বলিল—এ আর কি, যোধপুর ওল্ড ফোর্টে একটা মিউজিয়াম আছে, সেটা এর চেয়ে অনেক বড়।

কোন কিছু দেখিয়া আশ্চর্য হইবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা—এ ক্ষমতা সকলের থাকে না, মূলোর মধ্যে তাহা থাকিবার আশা করি নাই; সুতরাং বিস্মিত হইলাম না।

নবীনদা বলিলেন—আপনাদের দেশে যোধপুরে একবার নিয়ে যাবেন আমাদের? অস্ত্রাগার দেখে আসব।

—নিশ্চয়ই। ইন ফ্যাক্ট, আমাদের নিজ বাড়ীতেই একটি অস্ত্রাগার আছে, আমার পূর্বপুরুষের আমলের।

—বলেন কি মিঃ শুকরাম!

—হ্যাঁ আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন আওরঙজেবের আমলের লোক। তাঁর নাম—আচ্ছা নোবুক দেখে বলব। আমরা হলাম ডোগরা রাজপুত—ওয়ারিয়ার ক্ল্যান ডোগরা রাজপুর জানেন তো? আমাদের সেই

পূর্বপুরুষ, তিনি লড়েছিলেন জয়সিংহের সৈন্যদলে। এখনও অস্ত্রাগারের পূজো হয় আমাদের বাড়ী। ধূপধুনো জ্বালাতে হয়, সিঁদুর মাখাতে হয়—

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—সাবাস মূলো! ডোগরা রাজপুত হয়ে মরতে এসেছ কেন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিতে? ও কি তোমার হবে?

আমিও বাংলায় জবাব দিলাম—বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া, মূলোর দু'কূলই গিয়েছে। অস্ত্র ধরবার ক্ষমতা নেই, লেখাপড়ারও বুদ্ধি নেই—একে বলে হর্স র‍্যাডিশ।

মূলো বলিল—কি?

নবীনদা বলিলেন—কি রকম বড় বংশে জন্ম আপনার তাই বলছি—ডোগরা রাজপুত যোদ্ধা জাত কিনা!

মূলো বলিল—যাক, মিঃ বোস, একটু চা খাওয়ার যোগাড় হয় না? চা না খেলে আর তো চলে না।

মন্দির হইতে নামিয়া রামটেকের বাজারে চায়ের দোকানে চা পান করিয়া নাগপুরে ফিরিলাম। এত ভাল ভাল জিনিস যে সারাদিন ধরিয়া দেখিলাম মূলো সেসব সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না। তাহার যতসব বাজে গল্প আর অনবরত বকুনির জন্যে আমরা নিজেদের মধ্যেও কিছু আলোচনা করিবার অবকাশ পাইলাম না।

পরদিন সকালবেলা মূলো আসিয়া হাসিমুখে বলিল—আপনাদের ওবেলা আমার সঙ্গে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায়?

—মিস সোরাবজির বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ।

—আমরা কেন?

—আপনাদের নিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন ওঁর বাবা।

আমরা বিকালে সাজগোজ করিয়া বসিয়া আছি, মূলো আর কিছুতেই আসে না। নবীনবাবু বলিলেন—ওহে, মূলোটার মতলব শুনে আমাদের হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল দেখছি। ও এল না।

এমন সময় মূলো আসিয়া হাজির হইল—সে নিখুঁত সাজপোশাক

করিয়া কোর্টের বোতামে গোলাপ ফুল গুঁজিয়া রুমালে এসেন্স ঢালিয়া আসিয়াছে এবং বোঝা গেল যে সে কিছু পূর্বে নাপিতের দোকান হইতে চুলও কাটিয়া আসিয়াছে।

মিস সোরাবজির পিতা এখানকার ডাক্তার। পূর্ব হইতেই তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল—বৃদ্ধ অতি অমায়িক লোক। দেখিলাম, তিনি শুধু আমাদের তিনজনকে চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাহা নহে, শহরের আরও আট-দশটি ভদ্রলোককে বলিয়াছেন—তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি উৎসব চা-পার্টির আসল কারণ।

মিস সোরাবজি আঠার-উনিশ বছরের একহারা মেয়ে, আমরা তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। খাঁড়ার মত উঁচু সূচাল নাকের জন্য কোনদিনই মিস সোরাবজিকে বিশেষ সুন্দরী বলিয়া আমার মনে হয় নাই—যদিও রং বেশ ফরসা ও গলার স্বর কষ্টকৃত মেমসাহেবিয়ানার দোষমুক্ত না হইলেও মন্দ নয়। মেয়েটি নাকি লেখাপড়াতে ভাল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম আমার দু'জনেই। মিস সোরাবজি মূলোর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট—অন্ততঃ হাবভাবে আমাদের তাহাই মনে হইল। বাহিরের বারান্দায় দু'জনে নির্জনে মাঝে-মাঝে যাইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। মূলোর এতটুকু ইচ্ছাও যেন মিস্ সোরাবজি যখনই পূর্ণ করিতে ব্যগ্র। অতিথির প্রতি যতটুকু কর্তব্য করা উচিত শেষ করিয়া মেয়েটি মূলোকে লইয়া সব সময় ব্যস্ত রহিল।

চা পার্টি হইতে ফিরিবার পথে মূলো কি আমাদের ছাড়ে—সঙ্গে-সঙ্গে আসিল।

কিন্তু তাহার যা স্বভাব—মিস সোরাবজির সম্বন্ধে একবারও একটি কথাও বলিল না। চা-পার্টির কথাই যেন তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে একটু সময়ের মধ্যে।

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—বাঁদরের গলায় মুক্ত মালা! কলেজের বেশ ভাল মেয়ে বলে শুনেছি—র‍্যাডিশটার মধ্যে কি পেলে গুঁজে!

* * *

দু'দিন মূলো কি জানি আমাদের বাংলোতে আসিল না তৃতীয় দিন সকালবেলা একখানা মোটরগাড়ী বাসার সামনে দাঁড়াইতেই আমি

আগাইয়া গেলাম—নবীনদা তখন বাসায় নাই। মোটর হইতে নামিলেন ডাঃ সোরাবজি। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—শুকরাম কি এখানে এসেছিল? একটা জরুরী কথা আছে। আপনার ওকে কতদিন জানেন?

—খুব বেশি দিন নয়। কেন বলুন তো?

—ও আমার কাছে কিছু বলে না। কিন্তু আমার মেয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছে। আমি ওকে বাড়ী ঢুকতে দেব না ওকে। আপনারা বারণ করে দেবেন।

মূলোর হইয়া ওকালতি করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম—শুকরামকে কি উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করেন না?

ডাক্তার সোরাবজি রাগের সঙ্গে বলিলেন, ও একটা লোফার—ওর সঙ্গে আমাদের মেয়ের বিয়ে হবে কেন? ওরা হল ডোগার—আমি আর্মিতে ছিলাম, ওরা সেখানে সাধারণ সেপাই-এর কাজ করে। সুবাদার হতে কাউকে দেখিনি। কেন জানেন?

বলিলাম—কি?

—খুব সাহস আছে, যা বলবেন তাই করবে—কিন্তু—

বলিয়া ডাক্তার সোরাবজি আঙুল দিয়া নিজের মাথায় দু-তিন বার টোকা দিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

—তা'হলে বলে দেবেন দয়া করে।

—আজ্ঞে, ওটা বলা আমাদের পক্ষে একটু শক্ত, বুঝতেই পারেন।

—আমি বললে একটু রূঢ় হয়ে যাবে।

কিন্তু একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন—মিস সোরাবজির মনোভাব কেমন মিঃ শুকরামের ওপর, সেটা একবার—

—সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন। ওর মত একটা বাজে অপদার্থ লোকের হাতে মেয়ে দেব? ও কোনওকালে বি-এ পাশ করতে পারবে? কোনদিন নয়। আমার মেয়ে অনার্স'ক্লাসের ছাত্রী, সকলের চেয়ে ভাল ছাত্রী—ওর সঙ্গে তার বিয়ে! হাসির কথা।

পরদিন সকালে মূলো আমার কাছে আসিয়া গোপনে বলিল, মিঃ রায়, সব ঠিক হয়ে গেল।

—কি ঠিক হয়ে গেল মিঃ শুকরাম?

—জালুর সঙ্গে বিয়ের। অবিশ্যি ওর সঙ্গেই কথা হলো—ওর বাবা এখনও জানেন না।

—খুব খুশী হলাম শুনে। তবে ডাক্তার সোরাবজিকে একবার বলুন।

—সে হয়ে যাবে। তা—বললেও হয়।

নবীনদা শুনিয়া বলিলেন—বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার—মূলোর সঙ্গে অমন একটি চমৎকার মেয়ের বিয়ে।

ইতিমধ্যে মূলোর পরীক্ষা পড়িল—সে বি-এ পরীক্ষা দিয়া কিছুদিনের জন্য দেশে গেল। আমাদের বার-বার অনুরোধ করিয়া গেল, আমরা যেন তাহাকে না ভুলি—চিঠি দিলে যেন উত্তর দিই।

* * *

দুই মাস কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য করিয়া দিয়া ডাক্তার সোরাবজি তাঁহার কন্যার বিবাহে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। শুনিলাম পাত্র পুণার মেডিকেল অফিসার, আই এম এস পদবীর লোক। মোটা বেতন পান।

আমার বন্ধুর প্রতি কর্তব্য স্মরণ করিয়া জানতাম মিঃ শুকরাম—

বৃদ্ধ ডাক্তার রাগত-ভাবে বলিলেন, সে একটা লোফার, আগেই বলেছি। গেজেটটা দেখেছেন! তার নাম খুঁজে দেখবেন কোথাও নেই। আর আমার মেয়ে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে।

এত কথার পর বিকালে যখন মূলো আসিয়া জানাইল মিস সোরাবজি ও আমাদের লইয়া সে পরদিন পিকনিকে যাইবে, তখন একটু আশ্চর্য হইয়া গেলাম। নবীনদা হাঙ্গামায় পড়ার ভয়ে প্রথমটা যাইতে চাহিলেন না —কিন্তু শেষে যখন মূলোর মুখে শুনিলাম, মিস সোরাবজির ভাইও এই সঙ্গে যোগ দিবে, তখন আমাদের যাইতে কোন আপত্তি রহিল না।

গোরেওয়াড়া হ্রদের ধারে পিকনিক ঠিক হইয়াছিল। পরদিন সকালে দল বাঁধিয়া দু'খানা মোটরে হ্রদের ধারে গিয়া পৌঁছিলাম। নাগপুরের পাহাড়ের মধ্যে যতগুলি হ্রদ আছে, এটি সর্বাপেক্ষা বড়, দৃশ্যও চমৎকার। আমার উত্তর পার ধরিয়া হ্রদের ওপারে অনুচ্চ পাহাড়ের তলায় বড়-বড় তিন্দুক গাছের ছায়াতে আমাদের বনভোজনের স্থান নির্দেশ করিলাম। মিস সোরাবজির ভাইটির বয়স চোদ্দ-পনেরর বেশি নয়, বালক মাত্র—

তাহার মনে দেখিলাম খুব ফুর্তি, হ্রদের জলে সাঁতার কাটিবার জন্য সে স্নানের পোশাক পর্যন্ত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

মিস সোরাবজি মেয়েটিকে ঠিক বোঝা কঠিন। এদিনও দেখিলাম মূলোর প্রতি তাহার যথেষ্ট আকর্ষণ, তাহার এতটুকু সুখ-সুবিধার জন্য মেয়েটির কি উদ্বেগ। অবশ্য আমাদের দু'জনেরও সঙ্গে সে ভাল ভাবেই মিশিল। এতটুকু অহংকার নাই, বাঙালী মেয়ের মতনই সরলতা, পরের সুখ-সুবিধা দেখার অভ্যাস, নিজের হাতে সেবা করিবার ঝোঁক। সে যে বি-এ ক্লাসের ভাল ছাত্রী, তাহার কথাবার্তা হইতে এতটুকু তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

আমাকে বলিল—মিঃ রায়, একটা বাংলা গান করুন না?

আমি গান গাহিতে ভালই পারিতাম। এখন চর্চার অভাবে গলায় সুর নাই—সে আপত্তি বলা বাহুল্য টিকিল না, পর-পর তিনটি রবীন্দ্রনাথের গান গাহিতে হইল। বাঙালী-সমাজ নয়, বিশেষতঃ কলিকাতা হইতে বহুদূরে, কাজেই ভুল ধরিবার কেহ নাই—বেপরোয়া হইয়া গাহিলাম। প্রশংসাও অর্জন করিলাম মূলো ও মিস সোরাবজির কাছে।

মূলো বলিল—ওয়াণ্ডারফুল। এমন গান যে আপনি গাইতে পারেন, তা জানতাম না বাস্তবিক।

মিস সোরাবজি বলিল—টাগোরের কবিতা মুখস্থ আছে?

—দু-একটা—

—আবৃত্তি করুণ না! আমাদের কলেজে মিঃ সেনের মেয়ে একবার করেছিল, বড় ভাল লেগেছিল আমার।

'জীবনদেবতা' কবিতাটি মুখস্থ ছিল ভাল, আমার মুখে শুনিয়া মিস সোরাবজি উচ্ছ্বসিত সুরে বলিল—ভারি সুন্দর!

তাহার পর সে তাহার শুভ্র গ্রীবাটি দুলাইয়া আবদারের সুরে বলিল —মিঃ রায়, আর একটা আবৃত্তি করবেন দয়া করে?

—আগে আপনি একটা ইংরেজি আবৃত্তি করুন!

—করবেন তাহলে?

মিস সোরাবজির খড়্গের মত সুক্ষ্ম ও উগ্র নাসিকাকে ক্ষমা করিলাম, মেয়েটি অত্যন্ত চালবিহীন ও অমায়িক, তখনই সে ব্রাউনিঙের 'বৈয়াকরণের

শবযাত্রা' বিখ্যাত কবিতাটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিয়া আমাদের মুগ্ধ করিল।

পুনরায় আমাকে একটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতে হইল। এবার হাত-মুখ নাড়িয়া শিশির ভাতুড়ীর অনুকরণে 'বন্দীবীর' আবৃত্তি করিয়া ইংরেজিতে ভাবার্থ বুঝাইয়া দিলাম। পূর্বের কবিতাটি অপেক্ষা এইটিই মিস সোরাবজির বেশি ভাল লাগিয়াছে, তাহা তাহার কথার সুরে ও চোখ-মুখের ভাবে আমার বুঝিতে দেরি হইল না। আমায় বলিল—দেখুন রায়, টাগোরের কবিতার ইংরিজি অনুবাদ পড়েছি, কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্বনি আর ঝংকারের মধ্য দিয়ে যে ওসব কবিতা এমন চমৎকার শোনায়, তা আমি আজ এই প্রথম জানলাম। এর আগে একবার বাংলা আবৃত্তি শুনেছিলাম কলেজে, সে তেমন কিছু নয়। আমার বাংলা শেখার বড় ইচ্ছে, কি করে শেখা যায় বলতে পারেন?

মূলো দেখিলাম খুব খুশী হইয়াছে—কবিতা শুনিয়া নয়, কারণ সে সূক্ষ্ম রসবোধ তাহার ছিল না—বাংলা কবিতা ও প্রকারান্তরে বাঙালীর প্রশংসা করা হইতেছে, এইজন্য। লোকটা অন্ধ বাঙালীভক্ত।

বলিল—জালু, তুমি মিঃ রায়ের কাছে কেন বাংলা শেখ না? বেশ ভাল হবে—

মিস সোরাবজি পুনরায় আবদারের ভঙ্গিতে তাহার সুঠাম শুভ্র গ্রীবাটি দুলাইয়া বলিল—শেখাবেন আমাকে মিঃ রায়? আমি রোজ আপনার বাসায় আসব এক ঘণ্টা করে?

মূলো পরম উৎসাহের সুরে বলিল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেশ-বেশ!

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—ওর তাহ'লে বড় সুবিধে হয়, ত্ব'বেলা দেখা হয় কিনা। মূলোর কাণ্ড দেখ—সাধে কি বলে হর্স র‍্যাডিশ!

মূলো মিস সোরাবজির সঙ্গে কথা কহিতে অন্যমনস্ক ছিল, নবীনদার বাংলা কথা শুনিতে পাইল না—নতুবা বলিত, হোয়াট? কি বললে বাংলাতে?

আমি ভদ্রতা বজায় রাখিয়া বলিলাম—শেখালে তো বেশ হতো—কিন্তু আমাদের সময় নেই কিনা! ত্ব'জনকে টো-টো করে সারাদিন নিজের কাজে বেড়াতে হয়, নইলে এ তো বড় আনন্দের কথা।

আমার গোরেওয়াড়ার জলে নামিয়া সবাই স্নান করিলাম, মিস সোরাবজি পর্যন্ত। দুপুর ঘুরিয়া গিয়া একদিকে ছায়া পড়িয়াছে—এখনও সেদিকার সেই দিনটি চোখের সামনে যেন ভাসিতেছে—একদিকে অনুচ্চ কালো পাথরের পাহাড়, অন্যদিকে শিউলি ও তিন্দুক গাছের সারি, দু-দশটা বড়-বড় শালও আছে। আকাশে খর রৌদ্র, দুপুরের রোদে ঝক-ঝক করা চোখ-ঠিকরানো ছোট-ছোট ঢেউ-এর সারি হ্রদের বুকে, অথচ এপারে অনেকখানি ছায়াসিক্ত—আঁটসাট স্নানের পোশাক শুভ্রদেহ কৃশাঙ্গী ভেনাসের মত পার্শী তরুণী জালু শৈলবেষ্টিত হ্রদের নীল জল হইতে উঠিতেছে—দূরে ওপারে গোরেওয়াড়ার উঁচু পাড়ের উপর একটা বাংলা ধরনের বাড়ী, বোধহয় কোনো ডাকবাংলা।

আমরা রান্না করিয়া রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলাম, মিস সোরাবজির নিজের হাতের রান্না ভাত ও ডাল, কিছু মাংস, দু একটা ভাজা। পার্শী ধরনের নুন দিয়া রান্না ভাত ও মশলাবিহীন সাদা রঙের মাংসের স্টু ও বেশনে টোমাটো ভাজা—সবগুলির আমার মুখে সমান অখাদ্য। ভাগ্যে বুদ্ধি করিয়া নবীনদা কিছু আচার আনিয়াছিলেন—তাই দিয়া গ্রাস-কয়েক ভাত খাওয়া গেল। মূলো পোষা কুকুরটির মত মিস সোরাবজির পিছনে-পিছনে ঘুরিতে লাগিল এবং তাহার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার মত বটে—দেখলাম তাহার বাঙালী-প্রীতি তাহার প্রণয়িনীর প্রতি ভালবাসা অপেক্ষা কম নয়। বাঙালীর সব-কিছুর সে আজ ভক্ত, আমাদের কত কি ব্যাপারের প্রশংসা সে শতমুখে যদি বলিতে পারিত তাহার প্রণয়িনীর নিকট—তবে যেন তাহার তৃপ্তি হইত। বলিল, জান জালু, ওঁরা বাংলাতে মূলো কথাটা বড্ড ব্যবহার করেন, প্রায়ই ওঁরা বলে র‍্যাডিশ—আমি শিখে নিয়েছি, একটা বাংলা ইডিয়ম, মানে 'খুব ভাল'।

নবীনদা অনুচ্চ স্বরে বলিলেন—মরেছে হতভাগা!

মিস সোরাবজি আমাদের দিকে চাহিয়া কৌতুহলের সুরে বলিল—ও, হাউ ইন্টারেস্টিং। সত্যি মিঃ রায়—আপনারা বুঝি—ইত্যাদি।

মেয়েটিকে যা তা বুঝাইয়া ও অন্য কথা পাড়িয়া চাপা দিলাম জিনিসটা।

বেলা তিনটার সময় আমাদের মোটর নাগপুর হইতে ফিরিয়া

গোরেওয়াড়ার ওপরে আসিয়া ভেঁপু দিল। সকালে পৌছাইয়া দিয়া গাড়ী দু'খানা চলিয়া গিয়াছিল। আমরা যাওয়ার উদ্যোগ করিতে মিস সোরাবজি বলিলাম—সূর্যাস্তটা দেখে যাবেন না ?

—ওদিকে দেরি হয়ে যাবে ফিরতে—আপনার বাবা কি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না ?

—কিছু না মিঃ রায়, ভাববেন না। আমি বলে এসেছি—আমি ওই পাথরের ওপার থেকে দেখব সূর্যাস্তটা। তুমি এস না শুকরাম।

—যেমন ইচ্ছে আপনার। শীগগির আসবেন।

অদ্ভুত সূর্যাস্ত। এখানে আসিয়া অবধি হাইল্যাণ্ড ড্রাইভ হইতে সাতপুরা শৈলমালার দিকে প্রায়ই দেখিতেছি। সন্ধ্যার ছায়া নামে, আমি সামান্য শৈত্যের জন্য গরম আলোয়ান ভাল করিয়া গায়ে টানিয়া দিই, হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে সাহেব-মেমদের মোটরের ভিড় বাড়ে, আম্বাসিরি লেকে পার্কে দলে-দলে সুসজ্জিত নর-নারীরা বেড়াইতে আসিতে আরম্ভ করে, আমি বড় একটা শাল গাছের তলায় নির্জন প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া দেখি ধীরে-ধীরে সাতপুরা শৈলশ্রেণীর আড়ালে লাল সূর্যটা নামিয়া পড়িতেছে। আজও দেখিলাম। গোরেওয়াড়া হ্রদের বিস্তীর্ণ জলরাশি যেন আবীর-গোলা টকটকে লাল। যেমন সূর্য অস্ত গেল, অমনি চারিধারে ঘনছায়া নামিল, মোটর দু'খানা অধীর ভাবে ভেঁপু বাজাইতে লাগিল, বাদুড়ের দল পাহাড়ের দিকে ফিরিতে লাগিল, ক্রমে ছায়া ঘন হইয়া অন্ধকার নামিল। নবীনদা বলিলেন—কই, মিস সোরাবজি কোথায় ?

—এই তো ছিল, সূর্যাস্তটা ভাল দেখা যাবে বলে পাথরটার ওপারে গিয়েছে বোধ হয়।

এমন সময় মুলোর সঙ্গে মিস সোরাবজি পাথরের ওপাশের ঘাট থেকে উঠিয়া আসিল। উভয়েই স্নান করিয়া আসিল এই অবেলায়, দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম।

মূলো কৈফিয়তের সুরে বলিল—বড় গরম, তাই জালু বললে, বেশ স্নান করা গেল।

নবীনদা বাংলায় বলেলন—তারপর তোমার জালুর নিউমোনিয়া হলে তার বাবা দেখে নেবে তোমাকে—মূলোগিরি খাটবে না তখন—

মুলো বললে— কি ?

আমি উত্তর দিলাম, জালু নামটা বড় চমৎকার মিঃ বোসের মতে। অবশ্য আমারও সেই মত।

মিস সোরাবজি সলজ্জ হাসিয়া মেমসাহেবী স্বরে বলিল—ও, ইউ হরিড ক্রিচার্স্!

আমরা গাড়ীতে উঠিয়া চলিলাম।

সাউথ টাইগার গ্যাস রোডের কিছু পূর্বে পাহাড়ী ঢালুতে অনেক বন-শিউলি ফুল ফুটিয়া আছে দেখিয়া মেয়েটি বলিল—ও মিঃ রায়, কি চমৎকার ফুল ফুটেছে! শেফালি না ?

মোটর থামাইয়া মুলো গোটাকয়েক ডাল ভাঙিয়া আনিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, জ্যোৎস্নার ক্ষীণ লেশ মাটির বুকে। সাউথ টাইগার গ্যাস রোডের এদিকটা নির্জন এ সময় খুব বেশি লোকজন নাই। হঠাৎ মেয়েটি বলিল—চলুন, আম্বাসিরি লেক দেখে আসি। এ জ্যোৎস্নায় বেশ লাগবে।

আমরা সকলেই হতবুদ্ধি। আম্বাসিরির দিকে যাইতে হইলে আবার পাহাড়ে উঠিতে হইবে। বিপদে ফেলিল দেখিতেছি খেয়ালী পার্শী মেয়েটা। কি করা যায়, সুন্দরী তরুণীর আবদার উপেক্ষা করিবার সাধ্য নাই আমাদের—মোটর ঘুরাইয়া আবার সবাই পাহাড়ে উঠিয়া আম্বাসিরির দিকে ছুটিলাম। সেখানে লেকের ধারে পার্কে বিভিন্ন বেঞ্চিতে তখনও কেহ-কেহ বসিয়া আছে। ক্রমে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়া হ্রদের জলে পড়িয়া সেদিনকার খিনসি লেকের স্মৃতি মনের মধ্যে আনিয়া দিল। পাহাড়ের উপর হু-হু ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি ধরিল। জনবিরল হ্রদ-তীরের পার্কটিতে দূরে-দূরে দু-একটি নরনারী বেড়াইতেছে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সবাই নামিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই আরও চমৎকার লাগিতেছিল, নতুবা সাধারণত আম্বাসিরিতে বিকালের দিকে বড় ভিড় থাকে।

মিস সোরাবজিকে বলিলাম—কেমন লাগছে ?

সে মেমসাহেবী স্বরে মিষ্টি গলায় টানিয়া বলিল—ও, ইট্'জ ফা-ই-ন।

'ফা' হইতে 'ন' পর্যন্ত টানিয়া স্বরের নামা ওঠা করিয়া উচ্চারণ করিতে প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড সময় লইয়া মধুর ধরনে গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু হাসির সঙ্গে

কথাটা বলিল। এই তো কলেজের ছাত্রী, কতই না বয়স, কুড়ি-একুশের বেশি নয়—এ সব শিখিল কোথা হইতে, কে জানে। নবীনদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাংলায় বলিল—মেয়েটার আবার ভাবুক, দেখছ?

আমিও বাংলায় বলিলাম—আমেরিকান ফিল্ম থেকে হলিউডের অ্যাক্ট্রেদের সুর নকল করেছে কষ্ট করে। গলা মিষ্টি বলে মানিয়েছে।

মূলোর মনে কোনও কবিত্ব নাই। সে দেখিলাম মেয়েটির সহিত সুতা ও চরকা-কাট্টা সম্পর্কে কি কথা বলিতেছে। মিস সোরাবজি আমার কাছে আসিয়া বলিল—একটা কবিতা বলতে হবে—বলুন। এমন জায়গায় একটি টাগোরের কবিতা শুনব!

আবৃত্তি করিলাম—কি আর করি। মেয়েটির প্রাণে দেখিলাম সত্যই কবিত্ব আছে। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল প্রশংসায়। কিছু না বুঝিলেও ভাষার ধ্বনিতে ও ঝংকারে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় শেলির একটি কবিতা আবৃত্তি করিল। বলিলাম গান করুণ না একটা!

মিস সোরাবজি হাসিয়া বলিল—ইংরিজি গান জানি, আপনাদের পছন্দ হবে না।

—ভারতীয় মেয়ে দিশি গান শেখেননি কেন?

আমাদের কমিউনিটির সাহেবিয়ানা এজন্যে দায়ী মিঃ রায়। বাবা গভর্নেস রেখে ছেলেবেলায় পড়িয়েছেন, গান শিখিয়েছেন—তারা যে পথে নিয়ে গিয়েছে, সেই পথে যেতে হয়েছে আমায়। এখন জ্ঞান হয়ে সব বুঝতে পারি। এখন আমি গান্ধীবাদী, তা জানেন? খদ্দর পরি অনেক সময়, মা পরতে দেন না—এই হলো কথা। ইচ্ছে হয় আমি শিখি ভারতীয় গান—খুব ভাল লাগে আমার।

নবীনদা হাসিয়া মনের আনন্দে একটা ভাটিয়ালি গান বেসুরে গাহিয়া ফেলিলেন। মিস সোরাবজিকে ইংরাজিতে তাহার অর্থও বুঝাইয়া দেওয়া হইল। গানে, গল্পে, কবিতা-আবৃত্তিতে, হাসিখুশিতে সারাদিনটা কাটাইয়া রাত্রে যখন বাড়ী আসিয়া শুইয়া পড়িলাম, তখন যেন মাথার মধ্যে উগ্র মদের নেশা। নবীনদারও তাই, কারণ—তিনি আসিয়া পর্যন্ত গুন-গুন করিয়া গান করিতেছিলেন।

* * *

মিস সোরাবজির বিবাহের অল্পদিন পরেই আমরা দুই বন্ধু নাগপুর হইতে চলিয়া গেলাম। বছরখানেক পরে আবার একবার বিশেষ কাজে নাগপুরে আসি।

সংবাদ লইয়া শুনিলাম বৃদ্ধ ডাক্তার সোরাবজি ইতিমধ্যে মারা গিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ কেহই এখানে নাই—বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে তাহারা বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে।

মূলোর খবর জানিবার বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমারা কাহাকে তার কথা জিজ্ঞাসা করিব, বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার সোরাবজি শহরের বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে সকলের নিকটই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মূলো জনৈক বিদেশী তরুণ ছাত্র—অমন ছাত্র নাগপুরে বহু আছে—কে কাহার খবর রাখে। আমরা ছাড়া আর সে কাহার সঙ্গে মিশিত জানি না, সুতরাং মূলোর খোঁজ লইবার থাকা সত্ত্বেও উপায় হইল না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সপ্তাহখানেকর মধ্যে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে গোরেওয়াড়া হ্রদে বেড়াইতে গিয়া মূলোর দেখা পাইলাম। নবীনদা তাহাকে প্রথম দেখেন। একখানা পাথরে ঠেস দিয়া কে একজন নির্জনে বসিয়া আছে দেখিয়া নবীনদাই বলিলেন—ওখানে কে দেখ তো হে।

গোরেওয়াড়া শহর হইতে বহুদূরে, এত কেহ বেড়াইতে আসে না সাধারণত—স্থানটাও নির্জন পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে। আমি একটু কাছে গিয়ে দেখি—মূলো! নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরা সেই রকমই, তবে দাড়ি কামায় নাই, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা।

ভাল করিয়া দেখিলাম—মূলো একখানা খাতাতে কি লিখিতেছে। এত নিবিষ্টমনে লিখিতেছে, যে আমার পদশব্দ সে শুনিতে পাইল না। কবি হইয়া গেল নাকি ছোকরা?

তাহার পর আমাদের সঙ্গে সে নাগপুরে ফিরিল। শুনিলাম সে এবারও পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই। আমাদের পাইয়া মূলো ছেলেমানুষের মত খুশী। চাপেবার দুগ্ধমন্দিরে লইয়া গিয়া আমাদের মিষ্টান্ন শরবত খাওয়াইয়া দিল। শুনিলাম তাহার মা মারা গিয়াছেন এই বৎসরেই।

বলিল—বড্ড একলা একলা বোধ করি এখানে। মিশব কার সঙ্গে?

এখানে মেশবার লোক নেই। বাঙালীদের সঙ্গে মিশে আরাম। গোরেওয়াড়া লেকে মাঝে-মাঝে গিয়ে বসে থাকি। বেশ লাগে। একদিন ওখানে বেশ কেটেছিল। মনে আছে সেই আমাদের পিকনিক? ওরা কোথায় যে তা-তো জানি নে।

দেখিলাম, মৃন্ময়ের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল একটা ছবি—কয়েক শত বৎসর পূর্বের রাজপুতানায় বিশাল মরুভূমির মধ্যে উটের পিঠে চড়িয়া ইহার সেই বীর পূর্বপুরুষ চলিয়াছে জয়সিংহের সৈন্যদলের সহিত দেওয়ার যুদ্ধে, সেলিমগড়ের যুদ্ধে—চওড়া গালপাট্টাওয়ালা রুক্ষ-দর্শন মুখাবয়ব, দীর্ঘ দেহ পাশে খোলা দীর্ঘ দুধারে তলোয়ার, হাতে সাত হাত লম্বা বন্দুক—মৃদুতা নাই, ভয় নাই—কপাটের মত বিশাল বক্ষে জ্বলন্ত দুঃসাহস—কাহার সাধ্য ছিল তাহার মনোনীত কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ছিনাইয়া আনিত তাহার প্রণয়িনীকে যে কোন লোকের হাত হইতে। লড়িত, খুন করিত।

আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় জয়সিংহের সৈন্যদলের সেই বীর নায়কের বংশধর এই সাহেবী পোশাক-পরা, নিখুঁত টাই বাঁধা, ঘাড়চাঁচা ক্লিন শেভ্‌ড, হাতে রিষ্টওয়াচ বাঁধা ছোকরা নিতান্ত নিরুপায়। কবিতা লেখা বা চোখের জল ফেলা ছাড়া সে হারানো প্রণয়িনীর জন্য কি করিতে পারে? বিশেষত যখন দুইবার ইউভিার্সিটির ডিগ্রী না পাইয়া সে আরও দমিয়া গিয়াছে। ছোকরার জন্য এই সর্বপ্রথম দুঃখ হইল।

———

পথে যেতে-যেতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়।

সে বোধহয় বাংলা দুই কি তিন সালের কথা। নতুন কলেজ থেকে বার হয়েছি, এমন সময় বাবা মারা গেলেন। সংসারের অবস্থা ভাল ছিল না, স্কুল-মাস্টারী নিয়ে গেলুম হুগলী জেলার একটা পাড়াগাঁয়ে। …গ্রামটির অবস্থা এক সময়ে খুব ভালো থাকলেও আমি যখন গেলুম, তখন তার অবস্থা খুব শোচনীয়। খুব বড় গ্রাম, অনেকগুলি পাড়া, গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত বোধ হয় এক ক্রোশেরও ওপর। প্রাচীন আম-কাঁটালের বনে সমস্ত গ্রামটি অন্ধকার।

আমি ও-গ্রামের থাকতুম না। গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে সে গ্রামের রেলস্টেশন। স্টেশনমাস্টারের একটি ছেলে পড়ানোর ভার নিয়ে সেই রেলের P.W.D.-এর একটা পরিত্যক্ত বাংলোয় থাকতুম। চারিদিকে নির্জন মাঠে, মাঝে-মাঝে তাল-বাগান। স্কুলটি ছিল গ্রামের ও-প্রান্তে। মাঠের মধ্যে নেমে হেঁটে যেতুম প্রায় এক ক্রোশ।

একদিন বর্ষাকাল, বেলা দশটা প্রায় বাজে, স্কুলে যাচ্ছি। সোজা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে একটু শীঘ্র যাবার জন্য পাড়ার ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা নেমে গিয়েছে সেইটে দিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত পথটা বড়-বড় আম-কাঁঠালের ছায়ায় ভরা। একটু আগে খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ছিল। গাছের ডাল থেকে টুপ্‌টুপ্‌ করে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ছিল। একটা জীর্ণ ভাঙ্গা ঘাটওয়ালা প্রাচীন পুকুরের ধার দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তা বেয়ে যাচ্ছি, সেই সময় কে একটি স্ত্রীলোক, খুব টকটকে রংটা, হাতে বালা অনন্ত, পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ী, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে, পাশের একটা সরু রাস্তা দিয়ে ঘড়া নিয়ে উঠলেন আমার সামনের রাস্তায়। বোধহয় পুকুরে যাচ্ছিলেন জল আনবার জন্যে। আমায় দেখে ঘোমটা টেনে পথের পাশে দাঁড়ালেন।

আমি পাশ কাটিয়ে জোরে চলে গেলুম। আমার এখন স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু তখন আমি ইউনিভার্সিটির সদ্যপ্রসূত গ্রাজুয়েট, বয়স সবে

কুড়ি, অবিবাহিত। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের পাতায়-পাতায় যে সব তরলিকা, মঞ্জুলিকা, বাসন্তী—উজ্জয়িনীবাসিনী, অগুরুবাস-মোদিত-কেশা-তরুণী অভিসারিকার দল, তারা—আর তাদের সঙ্গে ইংরেজী কাব্যের কত Althea, কত Genevieve, Theosebia তাদের নীল নয়ন আর তুষার-ধবল কোমল বাহুবল্লী নিয়ে আমার তরুণ মনের মধ্যে রাতদিন সুমিষ্ট কল্পলোকের সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাই সেদিন সেই সুশ্রী তরুণী রূপ, তাঁর বালা-অনন্ত-পরা অনাবৃত হাত দুটির সুঠাম সৌন্দর্য আর সকলের ওপর তাঁর পরনের শাড়ী দ্বারা নির্দিষ্ট তাঁর সমস্ত দেহের একটা মহিমান্বিত সীমারেখা আমাকে মুগ্ধ এবং অভিভূত ক'রে ফেললে। আমার মনের ভিতর এক প্রকারের নূতন অনুভূতি আমার বুকের রক্তের তালে-তালে সেদিন একটা নূতন স্পন্দন আমার কাছে বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বিকালবেলা রেল লাইনের ধারে মাঠে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলুম। তাল-বাগানের মাথার ওপর সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। বেগুনী রং-এর মেঘগুলো দেখতে-দেখতে ক্রমে ধূসর, পরেই আবার কালো হয়ে উঠতে লাগল ... আকাশের অনেকটা জুড়ে মেঘগুলো দেখতে হয়েছিল যেন একটা আদিম যুগের জগতের উপরিভাগের বিস্তীর্ণ মহাসাগর।...বেশ কল্পনা ক'রে নেওয়া যাচ্ছিল, সেই সমুদ্রের চারিপাশে একটা গূঢ় রহস্যভরা অজ্ঞাত মহাদেশ, যার অন্ধকারময় বিশাল অরণ্যানীর মধ্যে প্রাচীন যুগের লুপ্ত অতিকায় প্রাণীরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দিন কেটে গিয়ে রাত হল। বাসায় এসে Keats পড়তে সুরু করলুম। পড়তে-পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। মাটির প্রদীপের বুক পুড়ে উঠে প্রদীপ কখন নিভে গিয়েছে। অনেক রাত্রে উঠে দেখলুম বাইরে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে ...আকাশ মেঘে অন্ধকার।...

তার পরদিনও পাড়ার ভেতর দিয়ে গেলুম। সেদিন কিন্তু তাঁকে দেখলুম না। আসবার সময়ও সেখান দিয়েই এলুম, কাউকে দেখলুম না। পরদিন ছিল রবিবার। সোমবার দিন আবার সেই পথ দিয়েই গেলুম। পুকুরটার কাছাকাছি গিয়েই দেখি যে তিনি জল নিয়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন, আমায় দেখে ঘোমটা টেনে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।... আমার বুকের রক্তটা যেন দুলে উঠল, খুব জোরে হেঁটে বেরিয়ে গেলুম।...

রাস্তার বাঁকের কাছে গিয়েই ইচ্ছা আর দমন করতে না পেরে একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখি, তিনি ঘাটের ওপর ঘোমটা খুলে কৌতূহল নেত্রে আমার দিকেই চেয়ে রয়েছেন, আমি চাইতেই ঘোমটা আবার টেনে দিলেন।

ওপারের পথটা ছেড়েই দিলুম একেবারে। পুকুরের পথ দিয়েই রোজ যাই। দু'একদিন পরে আবার একদিন তাঁকে দেখতে পেলুম। আমায় একটু আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন। এইভাবে পনেরো-কুড়ি দিন কেটে গেল। কোনদিন তাঁকে দেখতে পাই, কোনদিন পাই না। আমার কিন্তু কিন্তু বেশ মনে হতে লাগল, তিনি আমার প্রতি দিন-দিন আগ্রহান্বিতা হয়ে উঠছেন। আজকাল ততটা ত্রস্তভাবে ঘোমটা দেন না। আমারও কি হ'ল—তাঁর গতিভঙ্গীর একটা মধুর শ্রী, তাঁর দেহের একটা শান্ত কামনীয়তা, আমায় দিন-দিন যেন অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ফেলতে লাগল।

একদিন তখন আশ্বিন মাসের প্রথম শরৎ পড়ে গিয়েছে…নীল আকাশের সাদা-সাদা লঘু মেঘখণ্ড উড়ে যাচ্ছে…চারিদিকে খুব রৌদ্র ফুটে উঠেছে… রাস্তার পাশের বনকচু, ভাঁট শেওড়া, কুঁচলতার ঝোপ থেকে একটা কটুতিক্ত গন্ধ উঠছে।…শনিবার সকাল-সকাল স্কুল থেকে ফিরছি। রাস্তা নির্জন, কেউ কোন দিকে নেই। পুকুরটার পথ ধরেছি, একদল ছাতারে পাখী পুকুরের ওপারের ঝোপের মাথায় কিচ্‌কিচ করছিল, পুকুরের জলের নীল ফুলের দলাগুলো রৌদ্র-তাপে পুড়ছিল। আমি আশা করিনি এমন সময় তিনি পুকুরের ঘাটে আসবেন; কিন্তু দেখলুম তিনি জল ভ'রে উঠে আসছেন! এর আগে চার-পাঁচদিন তাকে দেখিনি, হঠাৎ কি মনে হ'ল, একটা বড় দুঃসাহসের কাজ ক'রে বসলুম। তাঁর কাছে গিয়ে বললুম—দেখুন, কিছু মনে করবেন না আপনি। আমি এখানকার স্কুলে কাজ করি, রোজ এই পথে যেতে-যেতে আপনাকে দেখতে পাই, আমার বড় ইচ্ছে করে আপনি আমার বোন হন। আমি আপনাকে বৌদিদি বলব, আমি আপনার ছোট ভাই। কেমন তো? তিনি আমার কথার প্রথম অংশটায় হঠাৎ চমকে উঠে কেমন জড়সড় হয়ে উঠেছিলেন, দ্বিতীয় অংশটায় তাঁর সে চমকানো ভাবটা একটু দূর হল! ঘড়া-কাঁধে নীচু চোখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি যুক্ত হয়ে প্রণাম ক'রে বললুম—বৌদিদি, আমার

এ ইচ্ছা আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। আমাকে ছোট ভাইয়ের অধিকার দিতেই হবে আপনাকে।

তিনি ঘোমটা অর্ধেকটা খুলে একটা স্থির শান্ত-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। সুশ্রী মুখ যে আমি কখনো দেখিনি তা নয়, তবুও মনে হ'ল তাঁর ডাগর কালো চোখ দুটির শান্ত ভাব, আর তাঁর ঠোঁটের নীচের একটা বিশেষ ভাঁজ, এই দুটিতে মিলে তাঁর সুন্দর মুখের গড়নে এমন এক বৈচিত্র্য এনেছে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে রইলুম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন —তোমার বাড়ী কোথায়?

আনন্দে সারা গা কেমন শিউরে উঠল। বললুম—কলকাতার কাছে, চব্বিশ পরগণা জেলায়।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি?

নাম বললাম। তিনি বললেন—তোমার বাড়ীতে কে-কে আছেন?

বললুম—এখন বাড়ীতে শুধু মা আর দুটি ছোট-ছোট ভাই আছে। বাবা এই দু'বৎসর মারা গিয়েছেন।

তিনি একটু যেন আগ্রহের স্বরে বললেন—তোমার কোন বোন নেই?

আমি বললুম—না। আমার দু'জন বড় বোন ছিলেন, তাঁরা অনেক দিন মারা গিয়েছেন। বড়দি যখন মারা যান তখন আমি খুব ছোট, মেজদি আজ পাঁচ ছ'বৎসর মারা গিয়েছেন। আমি এই মেজদিকেই জানতুম, তিনি আমায় বড় ভালবাসতেন। তিনি আমার চেয়েও ছয় বছরের বড় ছিলেন।

তাঁর দৃষ্টি একটু ব্যথা-কাতর হয়ে এল, জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মেজদি থাকলে এখন তাঁর বয়স হ'ত কত?

বললুম—এই ছাব্বিশ বছর।

তিনি একটু মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন—তাই বুঝি ভাইটির আমার একজন বোন খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে, না?

কি মিষ্টি হাসি! কি মধুর শান্ত ভাব! মাথা নীচু ক'রে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললুম—তা হবে ভাইয়ের অধিকার দিলেন তো আপনি?

তিনি শান্ত হাসিমাখা মুখে চুপ ক'রে রইলেন।

আমি বললুম—বৌদি, আমি পাব। আগ্রহের সঙ্গে খুঁজলে ভগবানও নাকি ধরা দেন, আমি একজন বোন অনায়াসেই পাব। আচ্ছা এখন আসি। আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না বৌদি, আপনার যেন দেখা পাই। রবিবার বাদে আমি দু'বেলাই এ রাস্তা দিয়ে যাব।

আমার মাঠের ধারের তাল-বাগানটার পাখীগুলো রোজই সকালে বিকালে ডাকে। একটা কি পাখী তার সুর খাদ থেকে ধাপে ধাপে তুলে একেবারে পঞ্চমে চড়িয়ে আসে। মন যেদিন ভারী থাকে সেদিন সে সুরের উদাস মাধুর্য প্রাণের মধ্যে কোন সাড়া দেয় না। আজ দেখলুম পাখীটার গানে সুরের স্তরে-স্তরে হৃদয়টা কেমন লঘু থেকে লঘুতর হয়ে উঠেছে। মনে হ'তে লাগল জীবনটা কেমন কতকগুলো স্নিগ্ধ ছায়াশীতল পাখীর গানে ভরা অপরাহ্ণের সমষ্টি, আর পৃথিবীটা শুধু নীল আকাশের তলায় এতস্তত বর্ধিত অযত্ন-সম্ভূত তাল-নারিকেল গাছের বন দিয়ে তৈরী—যাদের ঈষৎ কম্পমান দীর্ঘ শ্যামল পত্রশীর্ষ অপরাহ্ণের অবসন্ন রৌদ্রে চিক্‌চিক্ করছে।

তার পরদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা হ'ল ছুটির পর বিকাল বেলা। বৌদিদির যেন চাপা হাসির সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে, বিমলের বুঝি আজ খুব সকাল সকাল স্কুলে যাওয়া হয়েছিল?

আমি উত্তর দিলুম—বেশ বৌদি, আমি ওবেলা তো ঠিক সময়েই গেলুম—আপনিই ছিলেন না, এখন দোষটা বুঝি আমার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে, না? আর বৌদি, ঘাটে ওবেলা আরও সব মেয়েরা ছিলেন।

বৌদিদি হেসে ফেললেন, বললেন—তাই তো! ভাইটির আমার ওবেলা তো বড় বিপদ গিয়েছে তা হ'লে।

আমার একটু লজ্জা হ'ল, ভাল করে জবাব দিতে না পেরে বললুম—তা নয় বৌদি, আমি ওখানে অপরিচিত, পাড়ার মধ্যে দিয়ে পথ—পাছে কেউ কিছু মনে করে।

বৌদিদির চোখের কৌতুক দৃষ্টি তখনও যায়নি, তিনি বললেন—আমি

ওবেলা ঘাটের জলেই ছিলাম বিমল। তুমি ওই চট্‌কা গাছটার তলায় গিয়ে একেবার ঘাটের দিকে চেয়ে দেখলে, আমায় তুমি দেখতে পাওনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, আপনার বাপের বাড়ী কোথায়?

বৌদিদি উত্তর দিলেন, খোলাপোতা চেন? সেই খোলাপোতায়।

আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে আমায় আর একটু বিশদ সংবাদ দিয়ে বললেন, ওই যে খোলাপোতার রাস! বৌদিদির হাসিভরা দৃষ্টি যেন একটু গর্বমিশ্রিত হয়ে উঠল! কিন্তু বলা আবশ্যক যে, খোলাপোতা ব'লে কোনো গ্রামের নাম এই আমি প্রথম শুনলুম। অথচ বৌদির বাপের বাড়ী, যেখানে এমন রাস হয়, সেই বিশ্ববিশ্রুত খোলাপোতার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা পাছে তাঁর মনে ব্যথা দেয়, এই ভয়ে বলে ফেললুম—ও! সেই খোলাপোতায়। ওটা কোন্ জেলায় যেন…

বৌদিদির কাছ থেকে সাহায্য পাবার প্রত্যাশা করেছিলুম, কিন্তু দেখলুম তিনি সে বিষয়ে নির্বিকার। তাঁর হাসিভরা সরল মুখখানির দিকে চেয়ে আমার করুণা হ'ল, এ-সমস্ত জটিল ভৌগোলিক তত্ত্বের মীমাংসা নিয়ে তাঁকে পীড়িত করতে আমার মন সরল না।

বললুম—আচ্ছা বৌদি, আসি তা হ'লে।

বৌদিদি তাড়াতাড়ি ঘড়ার মুখ থেকে কলার পাতে মোড়া কি বার করলেন। সেইটে আমার হাতে দিয়ে বললেন—কাল চাপ্‌ড়া ষষ্ঠীর জন্যে ক্ষীরের পুতুল তৈরী করেছিলাম, আর গোটাকতক কলার বড়া আছে, বাসায় গিয়ে খেও।

* * *

চার-পাঁচ দিন জ্বরে ভোগার পর একদিন পথ্য পেয়ে স্কুলে যাচ্ছি, বৌদিদির সঙ্গে দেখা। আমায় আসতে দেখে বৌদিদি উৎসুক দৃষ্টিতে অনেকদূর থেকে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। নিকটে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি বিমল, এমন মুখ শুকনো কেন?

বললুম—জ্বর হয়েছিল বৌদিদ।

বৌদিদি উদ্বেগের সুরে বললেন—ও, তাই তুমি চার-পাঁচ দিন আসনি বটে। আমি ভাবলাম, বোধ হয় কিসের ছুটি আছে। আহা তাই তো, বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ যে বিমল।

তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা সত্যিকারের ব্যথা মিশ্রিত স্নেহের আত্মপ্রকাশ বেশ বুঝতে পেরে মনের মধ্যে একটা নিবিড় আনন্দ পেলুম। হেসে বললুম—যে দেশ আপনাদের বৌদি, একবার অতিথি হলে আপ্যায়নের চোটে একেবারে অস্থির ক'রে তুলবেন।

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বিমল, ওখানে তোমায় রেঁধে দেয় কে?

আমি বললুম—কে আর রাঁধবে, আমি নিজেই।

বৌদিদি একটু চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা বিমল এক কাজ করো না কেন!

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি বৌদি?

তিনি বললেন—মাকে এই পূজোর ছুটির পর নিয়ে এস। এরকমভাবে কি ক'রে বিদেশে কাটাবে বিমল? লক্ষ্মীটি, ছুটির পর মাকে অবিশ্যি ক'রে নিয়ে এস। এই গাঁয়ের ভেতর অনেক বাড়ী পাওয়া যাবে। আমাদের পাড়াতেই আছে। না হ'লে অসুখ হ'লে কে একটু জল দেয়? আচ্ছা হ্যাঁ বিমল, আজ যে পথ্য করলে, কে রেঁধে দিলে?

আমার হাসি পেল, বললুম—কে আবার দেবে বৌদি? নিজেই করলুম।

তিনি আমার দিকে যেন কেমন ভাবে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তাঁর সেদিনকার সেই সহানুভূতি-বিগলিত স্নেহ-মাখানো মাতৃমুখের জলভরা কালো চোখদুটি পরবর্তী জীবনে আমার অনেকদিন পর্যন্ত মনে ছিল।

সেদিন স্কুল থেকে আসবার সময় দেখি বৌদিদি যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। আমায় দেখে কলার পাতে মোড়া কি একটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—শরীরটা একটু না সারলে, রাত্রে গিয়ে রান্না, সে পেরে উঠবে না বিমল। এই খাবার দিলাম, রাত্রে খেও।··

বোধহয় একটু আগেই তৈরী ক'রে এনেছিলেন, আমি হাতে বেশ গরম পেলুম। বাসায় এসে কলার পাতটা খুলে দেখি, খানকতক রুটি, মোহনভোগ, আর মাছের একটা ডালনা মত। তার পরদিন ছুটির পর আসবার সময়ও দেখি বৌদি খাবার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমার হাতে দিয়ে বললেন—বিমল, তুমি তোমার ওখানে দুধ নাও?

আমি বললুম—কেন, তা হ'লে দুধও খানিকটা ক'রে দেন বুঝি? সত্যি বলছি বৌদি, আপনি আমার জন্য অনর্থক এ কষ্ট করবেন না, তা হ'লে এ রাস্তায় আমি আর আসছি না।

বৌদির গলা ভারী হয়ে এল, আমার ডান হাতটা আস্তে-আস্তে এসে ধ'রে ফেললেন, বললেন—লক্ষ্মী ভাই, ছিঃ ও-কথা ব'লো না। আচ্ছা, আমি যদি তোমার মেজদিই হতাম, তা হ'লে এ কথা কি আজ আমায় বলতে পারতে? আমার মাথার দিব্যি রইল, এ পথে রোজ যেতেই হবে।

সেই দিন থেকে বৌদিদি রোজ রাত্রের খাবার দেওয়া শুরু করলেন। সাত-আট দিন পরে রুটির বদলে কোনদিন লুচি, কোনদিন পরোটা দেখা দিতে লাগল। তাঁর সে আগ্রহভরা মুখের দিকে চেয়ে আমি তাঁর সেসব স্নেহের দান ঠিক অস্বীকারও করতে পারতুম না, অথচ এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করতুম যে আমার এই নিত্য খাবার যোগাতে না জানি বৌদিদিকে কত অসুবিধাই পোহাতে হচ্ছে। তার পরই আশ্বিন মাসের শেষে পূজোর ছুটি এসে পড়তে আমি নিস্কৃতি পেলুম।

সমস্ত পূজোর ছুটিটা কি নিবিড় আনন্দেই কাটল সেবার। আমার আকাশ বাতাস যেন রাতদিন আফিমের রঙিন ধূমে আচ্ছন্ন থাকম। ভোর বেলা উঠানের শিউলি গাছের সাদা ফুল বিছানো তলাটা দেখলে—হেমন্ত রাত্রির শিশিরে ভেজা ঘাসগুলোর গা যেমন শিউরে আছে, ওই রকম আমার গা শিউরে উঠত…কার ওপর আমার জীবনের সমস্ত ভার অসীম নির্ভরতার সঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে আমার মন শরতের জল নামানো হাল্‌কা মেঘের মত একটা সীমাহারা হাওয়ার রাজ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল।…

* * *

ছুটি ঘুরিয়ে গেল। প্রথম স্কুল খোলবার দিন পথে তাঁকে দেখলুম না। বিকালে যখন ফিরি, তখন শীতল হাওয়া একটু-একটু দিচ্ছে।…পথের ধারের এক জায়গায় খানিকটা মাটি কারা বর্ষাকালে তুলে নিয়েছিল সেখানটায় এখন বনকচু, কান-কাসুন্দা, ধুতরা, কুঁচকাঁটা, ঝুম্‌কো লতার দল পরস্পর জড়াজড়ি ক'রে একটুখানি ছোট-ছোট ঝোপ মত তৈরী করেছে…শীতল হেমন্ত অপরাহ্নের ছায়া সবুজ ঝোপটির ওপর নেমে এসেছে…এমন একটা মিষ্ট নির্মল গন্ধ গাছগুলো থেকে উঠেছে, এমন সুন্দর শ্রী হয়েছে ঝোপটির,

যেন বনলক্ষ্মীর শ্যামল শাড়ীর একটা অঞ্চল-প্রান্তের মত।

তার পরদিন তাঁকে দেখলুম। তিনি আমায় লক্ষ্য করেন নি, আপন মনে ঘাটের চাতালে উঠতে যাচ্ছিলেন। আমি ডাকলুম—বৌদিদি! ‘কেমন হঠাৎ চমকে উঠে আমার দিকে ফিরলেন।

—এ কি বিমল!···কবে এলে? আজ কি স্কুল খুলল! কি রকম আছ?—সেই পরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বরটি! সেই স্নেহ-ঝরা শান্ত চোখ দুটি! বৌদিদি আমার মনে ছুটির আগে যে স্থান অধিকার করেছিলেন, ছুটির পরের স্থানটা তার চেয়ে আরও ওপরে। আমি সমস্ত ছুটিটা তাঁকে ভেবেছি, নানা মূর্তিকে নানা অবস্থায় তাকে কল্পনা করেছি, নানা গুণ তাঁতে আরোপ করেছি, তাঁকে নিয়ে আমার মুগ্ধ মনের মধ্যে অনেক ভাঙা-গড়া করেছি। আমার মনের মন্দিরে আমারই শ্রদ্ধা-ভালবাসায় গড়া তাঁর কল্পনা-মূর্তিকে অনেক অর্ঘ্যচন্দনে চর্চিত করেছি! তাই সেদিন যে বৌদিদিকে দেখলুম, তিনি পূজার ছুটির আগেকার সে বৌদিদি নন, তিনি আমার সেই নির্মলা, পূর্ণহৃদয়া, পুণ্যময়ী মানসী প্রতিমা, আমার পার্থিব বৌদিদিকে তিনি তাঁর মহিমাখচিত দিব্য বসনের আচ্ছাদনে আবৃত ক'রে রেখেছিলেন, তাঁর স্নেহ-করুণার জ্যোতিবাষ্পে বৌদিদর রক্তমাংসের দেহটার একটা আড়াল সৃষ্টি করেছিলেন।

আমার মাথা শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে নত হয়ে পড়ল, আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলুম। বৌদিদি বললেন—এস-এস ভাই, আর প্রণাম করতে হবে না। আশীর্বাদ করছি এমনিই—রাজা হও। আচ্ছা বিমল, বাড়ী গিয়ে আমার কথা মনে ছিল?

মনে এলেও বাইরে আর বলতে পারলুম না—কে তবে আমার মগ্ন চৈতন্যকে আশ্রয় করে আমার নিত্য সুষুপ্তির মধ্যেও আমার সঙ্গিনী ছিল বৌদি? শুধু একটু হেসে চুপ করে রইলুম। বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—মা ভাল আছেন?

আমি উত্তর দিলুম—হাঁ বৌদি, তিনি ভাল আছেন। তাঁকে আপনার কথা বললুম।

বৌদিদি আগ্রহের সুরে বললেন—তিনি কি বললেন?

আমি বললাম—শুনে মা'র দুই চোখ জলে ভরে এল, বললেন—একবার

দেখাবি তাকে বিমল। আমার নলিনীর শোক বোধহয় তাকে দেখলে অনেকটা নিবারণ হয়।

বৌদিদিরও দেখলুম দুই চোখ ছলছল ক'রে এল, আমায় বললেন, হ্যাঁ, বিমল, তা মাকে এই মাসে নিয়ে এলে না কেন?

আমি বললুম—সে এখন হয় না বৌদি।

বৌদিদি একটু ক্ষুব্ধ হলেন—বললেন—বিমল, জানো তো সেবার কি রকম কষ্টটা পেয়েছ! এই বিদেশ বিভুঁই, মাকে আনলে এই মিথ্যে কষ্টটা তো আর ভোগ করতে হয় না।

আমি উত্তর দিলুম—বৌদি, আমি তো আর ভাবি নি যে আমি বিদেশে আছি, যেখানে আমার বৌদি রয়েছেন, সে দেশ আমার বিদেশ নয়। মা না থাকলেও আমার এখানে ভাবনা কিসের বৌদি?

বৌদিদির চোখে লজ্জা ঘনিয়ে এলো, আমার দিকে ভাল করে চাইতে পারলেন না, বললেন—হ্যাঁ, আমি তো সবই করছি। আমার কি কিছু করবার জো আছে? কত পরাধীন আমরা, তা জানো তো ভাই! ওসব নয়, তুমি এই মাসেই মাকে আনো।

আমি কথাটাকে কোন রকমে চাপা দিয়ে সেদিন চলে এলুম।

তার পরদিন ছুটির পর বৌদির সঙ্গে দেখা। অন্যান্য কথাবার্তার পর আসবার সময় তিনি কলার পাতে মোড়া আবার কি একটা বার করলেন। তাঁর হাতে কলার পাত দেখলেই আমার ভয় হয়, আমি শঙ্কিতচিত্তে ব'লে উঠলুম—ও আবার কি বৌদি? আবার সেই···

বৌদিদি বাধা দিয়ে বললেন, আমার কি কোন সাধ নেই বিমল? ভাইফোঁটাটা অমনি-অমনি গেল, কিছু কি করতে পারলুম? কলার পাতা-মোড়া রহস্যটি আমার হাতে দিয়ে বললেন—এতে একটু মিষ্টিমুখ ক'রো, আর এইটে নাও—একখানা কাপড় কিনে নিও।

কথাটা ভাল ক'রে শেষ না করেই বৌদি আমার হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিতে এলেন। আমি চমকে উঠলুম—এ কি বৌদি, না না, এ কিছুতে হবে না, খাবার আমি নিচ্ছি, কিন্তু টাকা নিতে পারব না।

আমার কথাটার স্বর বোধ হয় একটু তীব্র হয়ে পড়েছিল, বৌদি হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেন, তাঁর প্রসারিত হাতখানা ভাল ক'রে যেন

গুটিয়ে নিতেও সময় পেলেন না, যেন কেমন হয়ে গেলেন। তারপর একটুখানি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকবার পরই তাঁর টানা কালো চোখদুটি ছাপিয়ে বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মত জল গড়িয়ে পড়ল। আমার বুকে যেন কিসের খোঁচা বিঁধল।

এই নিতান্ত সরলা মেয়েটির আগ্রহ-ভরা স্নেহ-উপহার রূঢ়ভাবে প্রত্যাখান ক'রে তার বুকে যে লজ্জা আর ব্যথার শূল বিদ্ধ করলুম, সে ব্যথার প্রতিঘাত অদৃশ্যভাবে আমার নিজের বুকে গিয়েও বাজল।

আমি তাড়াতাড়ি দুই হাতে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর হাত থেকে নোটখানা ও খাবার দুই-ই নিয়ে বললুম—বৌদি, ভাই ব'লে এ অপরাধ এবার মাপ করুন আমায়। আর কখনো আপনার কথা অবাধ্য হব না।

বৌদিদির চোখের জল তখনও থামে নি।

দুই চোখ জলে ভরা সে তরুণী দেবী মূর্তির দিকে ভাল ক'রে চাইতে না পেরে আমি মাথা নীচু ক'রে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

বাড়ী এসে দেখলুম, কলার পাতের মধ্যে কতকগুলো দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রপুলি, সুন্দর করে তৈরী।

সমস্ত রাত ঘুমের ঘোরে বৌদিদির বিষণ্ণ কাতর দৃষ্টি বারবার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

মাসখানেক কেটে গেল। প্রায়ই বৌদিদির সঙ্গে দেখা হ'ত। এখন আমরা ভাই-বোনের মত হয়ে উঠেছিলুম, সেই রকমই পরস্পরকে ভাবতুম। একদিন আসছি, ফ্লানেল শার্টের একটা বোতাম আমার ছিল না। বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি, বোতাম কোথায় গেল?

আমি বললুম—সে কোথায় গিয়েছে বৌদি, বোতাম পরাতে জানিনে কাজেই ঐ অবস্থা।

তার পরদিন দেখলুম, তিনি ছুঁচ-সুতো বোতাম সমেতই এসেছেন। আমি বললুম—বৌদি এটা ঘাটের পথ, আপনি বোতাম পরাতে পরাতে কেউ যদি দেখে তো কি মনে করবে! আপনি বরং ছুঁচটা আমায় দিন, আমি বাড়ী গিয়ে চেষ্টা করব এখন।

বৌদিদি হেসে বললেন—তুমি চেষ্টা ক'রে যা করবে তা আমি জানি, নাও স'রে এসো এদিকে।

বাধ্য হয়ে স'রেই গেলুম। তিনি বেশ নিশ্চিত ভাবেই বোতাম পরাতে লাগলেন। ভয়টা দেখলুম তাঁর চেয়ে আমারই হ'ল বেশী। ভাবলুম, বৌদির তো সে কাণ্ডজ্ঞান নেই, কিন্তু যদি কেউ দেখে তো এর সমস্ত কষ্টটা ওঁকেই ভুগতে হবে।

একদিন বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—বিমল, গোকুল-পিঠে খেয়েছ ?

আমার মা খুব ভাল গোকুল-পিঠে তৈরী করতেন, কাজেই ও জিনিসটা আমি খুব খেয়েছি। কিন্তু বৌদিদিকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য বললুম —সে কি রকম বৌদি।

আর রক্ষা নেই। তার পরদিনই বিকাল বেলা বৌদিদি কলার পাতে মোড়া পিঠে নিয়ে হাজির।

আমায় বললেন—তুমি এখানে আমার সামনেই খাও। ঘড়ার জলে হাত ধুয়ে ফেলো এখন।

আমি বললুম—সর্বনাশ বৌদি, এই এতগুলো পিঠে খেতে-খেতে এ পথে লোক এসে পড়বে, সে হয় না, আমি বাড়ী গিয়েই খাব।

বৌদি ছাড়বার পাত্রীই নন, বললেন—না, কেউ আসবে না বিমল। তুমি এখানেই খাও।

খেলুম, পিঠে খুব ভাল হয় নি। আমার মায়ের নিপুণ হাতের তৈরী পিঠের মত নয়। বোধ হয় নতুন করতে শিখেছেন, ধারগুলো পুড়ে গিয়েচে, আস্বাদও ভাল নয়। বললুম—বাঃ বৌদি, বড় সুন্দর তো! এ কোথায় তৈরী করতে শিখলেন ? আপনার বাপের বাড়ীর দেশে বুঝি!

বৌদির মুখে আর হাসি ধরে না। হাসিমুখে বললেন—এ আমি, আমাদের গুরুমা এসেছিলেন, তিনি শহরের মেয়ে, অনেক ভাল খাবার করতে জানেন, তাঁর কাছে শিখে নিয়েছিলাম।

তারপর সারা শীতকাল অন্যান্য পিঠের সঙ্গে গোকুল-পিঠের পুনরাবৃত্তি চলল। ঐ যে বলেছি, আমার ভাল লেগেছে, আর রক্ষা নেই!

একটা কথা আছে।

কিছুদিন ধ'রে আমার মনের মধ্যে একটা আগ্রহ একটু-একটু ক'রে জমছিল, জীবনটাকে খুব বড় ক'রে অনুভব করবার জন্যে। আমার এ কুড়ি-একুশ বছর বয়সে এই ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ে খাঁচার পাখীর মত আবদ্ধ থাকা

ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। চ'লেও যেতাম এতদিন। এখানকার একমাত্র বন্ধন হয়েছিলেন বৌদিদি। তাঁরই আগ্রহে স্নেহ-যত্নে সে অশান্ত ইচ্ছাটা কিছুদিন চাপা ছিল। এমন সময় মাঘ মাসের শেষের দিকে আমার এক আত্মীয় আমায় লিখলেন যে, তাঁদের কারখানা থেকে কাঁচের কাজ শেখবার জন্যে ইউরোপ আমেরিকায় ছেলে পাঠানো হবে, অতএব আমি যদি জীবনে কিছু করতে চাই, তবে শীঘ্র যেন মোরাদাবাদ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি সেখানকার কাঁচের কারখানার ম্যানেজার।

পত্র পেয়ে সমস্ত রাত আমার ঘুম হ'ল না। ইউরোপ—আমেরিকায় সে কত উর্মিসঙ্গীত-মুখরিত শ্যাম সমুদ্রতট···কত অকূল সাগরের নীল জলরাশি, দূরে সবুজ বিন্দুর মত ছোট-ছোট দ্বীপ, ঐ সিসিল। নতুন আকাশ, নতুন অনুভূতি···ডোভারের সাদা খড়ির পাহাড়—প্রশস্ত রাজপথে জনতার দ্রুত পাপচারণ, লাড্‌গেট সার্কাস, টটেন্‌হাম্ কোর্ট রোড—বার্চ-উইলো পপ্‌লার-মেপ্‌ল গাছের সে কত শ্যামল পত্রসম্ভার, আমার কল্পলোকের সঙ্গিনী কনককেশিনী কত ক্লারা, কত মেরী, কত ইউজিনী।—

পরদিন সকালে পত্র লিখলুম—আমি খুব শীঘ্রই রওনা হব। স্কুলে সেইদিনই নোটিশ দিলুম, পনেরো দিন পরে কাজ ছেড়ে দেবো।

মন বড় ভাল ছিল না, উত্তরের পথটা দিয়ে কয়েকদিন গেলুম। বারো দিন পরে নীচের পথটা দিয়ে যেতে-যেতে একদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা। বৌদিদি একটু অভিমান প্রকাশ করলেন—বিমল, বড় গুণের ভাই তো! আজ চার-পাঁচ দিনের মধ্যে বোনটা বাঁচল কি ম'ল, তা খোঁজ করলে না?

আমি বললাম—বৌদিদি, করলে সেটাই অস্বাভাবিক হ'ত। বোনেরাই ভাইয়েদের জন্য কেঁদে মরে, ভাইদের দায় পড়েছে বোনদের ভাবনা ভাবতে। দুনিয়াশুদ্ধ ভাই-বোনেরই এই অবস্থা।

বৌদিদি খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলেন। এই তরুণীর হাসিটি বালিকার মত এমন মিষ্ট-নির্মল, যে এ শুধু লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতের জ্যোৎস্নার মত উপভোগ করবার জিনিস, বর্ণনা করবার নয়। বললেন—তা জানি-জানি, নাও, আর গুমোর করতে হবে না, সে গুণ যে তোমাদের আছে তা কি আমরা ভেতরে-ভেতরে বুঝি না? কিন্তু বুঝে কি করব, উপায় নেই। হ্যাঁ, তা সত্যি-সত্যি মাকে কবে আনছ?

আমার কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি বৌদিদিকে কিছু বলিনি। সে কথা বললে যে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন, এ আমি বুঝতে পেরেছিলুম। একবার ভাবলুম, সেই তো জানাতেই হবে, একদিন ব'লে ফেলি। কিন্তু অমন সরল হাসিভরা মুখ, অমন নিশ্চিন্ত শান্তির ভাব—বলতে বড় বাধল। মনে-মনে বললুম, তোমরা কেবল বুঝি স্নেহ ঢেলে দিতেই জান? তোমাদের স্নেহ-পাত্রদের বিদায়ের বাজনা যে বেজে উঠছে এ সম্বন্ধে এ রকম অজ্ঞান কেন?

জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, একটা কথা বলি, আপনি আমায় এই অল্প-দিনে এত ভালবাসলেন কি ক'রে? আচ্ছা, আপনারা কি ভালবাসার পাত্রীপাত্রও দেখেন না? আমি কে বৌদি, যে আমার জন্যে এত করেন?

বৌদিদির মুখ গম্ভীর হয়ে এলো। তাঁর ওই এক বড় আশ্চর্য ছিল, মুখ গম্ভীর হ'লে প্রায়ই চোখে জল আসবে, জল কেটে গেলে, তো আবার হাসি ফুটবে। শরতের আকাশে রোদ-বৃষ্টি খেলার মত। বললেন—এতদিন তোমায় বলি নি বিমল, আজ এই পাঁচ বছর হ'ল আমারও ছোট ভাই আমায় মায়া কাটিয়ে চ'লে গিয়েছে, তারও নাম ছিল বিমল। থাকলে সে তোমারই মত হতো এতদিন। আর তোমারই মত দেখতে। তুমি যেদিন প্রথম এ রাস্তা দিয়ে যাও, তোমায় দেখেই আমার মনের মধ্যে সমুদ্র উথলে উঠল, সেদিন বাড়ী গিয়ে আপন মনে কত কেঁদেছিলাম। তুমি আপনা হতেই দিদি ব'লে ডাকলে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যে কি সুখে আছি, তা বলতে পারি না। তোমায় যত্ন ক'রে, তুমি যে বড় বোনের মত ভালবাসো, তাতে আমি বিমলের শোক অনেকটা ভুলেছি। ওই এক ভাই ছিল আমার। তুলসীতলায় রোজ সন্ধ্যাবেলা কত প্রণাম করি, বলি, ঠাকুর এক বিমলকে তো পায়ে টেনে নিয়েছ, আর এক বিমলকে যদি দিলে তো এর মঙ্গল করো। একে আমার কাছে রাখ।

চোখের জলে বৌদিদির গলা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমি কিছু বললুম না। বলব কি!

একটু পরে বৌদিদি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জলভরা চোখ দুটি তুলে আমার মুখের দিকে চাইলেন। কি সুন্দর তাকে দেখাচ্ছিল। কালো চোখ দুটি ছল-ছল করছে, টানা ভুরু যেন আরও নেমে এসেচে, চিবুকের

ভাঁজটি আরও পরিস্ফুট, যেন কোন্ নিপুণ প্রতিমাকারক সরু বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে কেটে তৈরী করেছে।...পথের পাশেই প্রথম ফাল্গুনের মুগ্ধ আকাশের তলায় আঁকোড় ফুলের একটা ঝোপে কাঁটাওয়ালা ডালগুলিতে থোকা-থোকা সাদা ফুল ফুটেছিল, মনের ফাঁকে-ফাঁকে নেশা জমিয়ে আনে, এমনি তার মিষ্টি গন্ধ।

ছু'জনে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। খানিক পরে বৌদিদি বললেন সেই জন্যেই বলছি ভাই, মাকে আনো। আমাদের পাড়ায় চৌধুরীদের বাড়ীটা প'ড়ে আছে। ওরা এখানে থাকে না। খুব ভাল বাড়ী, কোন অসুবিধা হবে না, তুমি মাকে নিয়ে এস, ওখানেই থাক, সে তাঁদের পত্র লিখলেই তাঁরা রাজী হবেন, বাড়ী তো এমনি প'ড়ে আছে। তোমার বোন পরাধীন, কিছু করবার তো ক্ষমতা নেই। তোমার সঙ্গে এসব দেখাশোনা, এসব লুকিয়ে, বাড়ীর কেউ জানে না। তুমি ছু'বেলা ঘাটের পথ দিয়ে যেও, দেখেই শান্তি পাব ভাই। মাকে এ মাসেই আনো।

কেমন ক'রে তা হবে? একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, আমি এখানে থাকলে কি আপনি খুব সুখী হন?

বৌদিদি বললেন—কি বলব বিমল? মাকে আনলে তোমার কষ্টটাও কম হয়, তা বুঝেও আমার সুখ! আর বেশ ছুটি ভাই-বোনে এক জায়গায় থাকব, বারো মাস ছু'বেলা দেখা হবে, কি বল?

আমি বললুম—ভাই যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে আপনার কাছে, তাকে ক্ষমা করতে পারবেন?

বৌদিদি বললেন—শোন কথার ভঙ্গী ভাইটির আমার, আমার কাছে তোমার আবার অপরাধটা কিসের শুনি?

আমি জোর ক'রে বললুম—না বৌদি, ধরুন যদি করি তা হ'লে?

বৌদিদি আবার হেসে বললেন—না-না, তা হলেও না। ছোট ভাইটির কোন কিছুতেই অপরাধ নেই আমার কাছে, আমি যে বড় বোন।

চোখে জল এসে পড়ল। আড়ষ্ট গলায় বললুম—ঠিক বৌদি, ঠিক!

বৌদিদি অবাক হয়ে গেলেন, বললেন—বিমল, কি হয়েছে ভাই, অমন করছ কেন?

মুখ ফিরিয়ে আনতে উদ্যত হলুম, বললুম—কিছু না বৌদি, এমনি বলছি।

বৌদিদি বললেন—তবুও ভাল। ভাইটির আমার এখনও ছেলেমানুষী যায় নি। হ্যাঁ, ভাল কথা বিমল, তুমি ভালবাস ব'লে বাগানের কলার কলার কাঁদি আজ কাটিয়ে রেখেছি,পাকলে একদিন ভাল ক'রে দেব এখন।

তার পরদিনই আমার নোটিশ অনুসারে স্কুলের কাজের শেষদিন। গিয়ে শুনলাম, আমার জায়গায় নতুন লোক নেওয়া ঠিক হয়ে গিয়েছে। স্কুলে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে এলুম।

শুধু একবার শেষ দেখা করবার জন্যই তার পরদিন পুকুরের ঘাটে ঠিক সময়ে গেলুম। তাঁর দেখা পেলে কি বলব তা ঠিক ক'রে সেখানে যাই নি, সত্য কথা সব খুলে বলতে বোধহয় পারতুম সেদিন—কিন্তু দেখা হ'ত, আবার কিছুদিন ধ'রে হয়ত রোজই দেখা হ'ত। সেদিন বিকালে গেলুম, তার পরদিন সকালেও গেলুম, কিন্তু দেখা পেলুম না।

সেদিন চ'লে আসবার সময় সেখানকার মাটি একটু কাগজে মুড়ে পকেটে নিলুম, যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার দিন তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেইদিনই বিকালে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চিরদিনের মত সে গ্রাম পরিত্যাগ করলুম।

মাঠের কোলে ছাতিম গাছের বনের মধ্যে কোথায় ঘুঘু ডাকছিল।

* * *

সে সব আজ প'চিশ-ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা!

তারপর জীবনে কত ঘটনা ঘটে গেল। ভগবানের কি অসীম করুণার দানই আমাদের এই জীবনটুকু! উপভোগ ক'রে দেখলুম, এ কি মধু! কত নতুন দেশ, নতুন মুখ, কত জ্যোৎস্না রাত্রি, নতুন নবঝোপের নতুন ফুল, কত জুঁই ফুলের মত শুভ্র নির্মল হৃদয়, কান্নাজড়ানো কত মধুর স্মৃতি!...

কাকার কাছে মোরাদাবাদে কাঁচের কারখানায় গেলুম। বছরখানেক পরে তারা আমায় পাঠিয়ে দিলে জার্মানীতে কাঁচের কাজ শিখতে। তারপর কোলোয়েঁ গেলুম কাটা বেলোয়ারী কাঁচের কারখানার কাজ শেখবার জন্যে। কোলোয়েঁ অনেক দিন রইলুম। সেখানে থাকতে একজন আমেরিকান যুবকের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হ'ল, তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, "শিকাগো ইন্টার-ওশ্যন" কাগজের তিনি ফ্রান্স দেশস্থ সংবাদদাতা। কোলোয়েঁ সব সময় না থাকলেও তিনি প্রায়ই ওখানে

আসতেন। তাঁরই পরামর্শে তাঁর সঙ্গে আমেরিকায় গেলুম। তাঁর সাহায্যে দু'তিনটা বড়-বড় কাঁচের কারখানার কাজ দেখাবার সুযোগ পেলাম… পিট্সবার্গে কর্ণেগীর ওখানে প্রায় ছ'মাস রইলুম, নতুন ধরণের ব্লাস্ট-ফার্নেসের কাজ ভাল ক'রে বোঝবার জন্যে।…মিড্‌ল ওয়েস্টের একটা কাঁচের কারখানায় প্রভাত দে কি বসু বলে একজন বাঙালী যুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁরও বাড়ী চব্বিশ পরগণা জেলায়। সে ভদ্রলোক নিঃসম্বলে জাপান থেকে আমেরিকায় গিয়ে মহা হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তাঁরই মুখে শুনলুম, সেয়াট্‌ল্‌-এ একটা নতুন কাঁচের কারখানা খোলা হচ্ছে। আমি জাপান দিয়ে আসব স্থির করেছিলুম, কাজেই আসবার সময় সেয়াট্‌ল্‌ এলুম। মা ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। ভাই-দুটিকে নিয়ে গেলুম মোরাদাবাদে। বেশীদিন ওখানে থাকতে হ'ল না। বোম্বেতে বিয়ে করেছি, আমার শ্বশুর এখানে ডাক্তারী করতেন। সেই থেকে বম্বে অঞ্চলেরই অধিবাসী হয়ে পড়েছি।

বহুদিন বাংলা দেশে যাইনি, প্রায় ষোল-সতের বছর হ'ল। বাংলা দেশের জল-মাটি গাছপালার জন্যে মনটা তৃষিত আছে। তাই আজ সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে ব'সে আমার সবুজ শাড়ী-পরা বাংলা মায়ের কথাই ভাবছিলুম। রাজাবাই টাওয়ারের মাথার উপর এখনও একটু-একটু রোদ আছে। বন্দরের নীল জলে মেসাজেরী মারিতম্‌দের একখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, এখানা এখুনি ছেড়ে যাবে। বাঁ-ধারে খুব দূরে এলিফ্যান্টার নীল সীমারেখা। ভাবতে-ভাবতে প্রথম যৌবনের একটা বিস্মৃত প্রায় ঝাপ্‌সা ছবি বড় স্পষ্ট হয়ে মনে এলো। পঁচিশ বছর পূর্বের এমনি এক সন্ধ্যায় দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত পল্লীগ্রামের জীর্ণ শান-বাঁধানো পুকুরের ঘাট বেয়ে উঠেছে আর্দ্রবসনা তরুণী এক পল্লীবধূ! মাটির পথের বুকে-বুকে লক্ষ্মীর চরণ-চিহ্নের মত তার জলসিক্ত পা দু'খানির রেখা আঁকা।…আঁধার সন্ধ্যায় তার পথের ধারের বেণুকুঞ্জে লক্ষ্মীপেঁচা ডাকছে। তার স্নেহভরা পবিত্র বুকখানি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততায় ভরা। আম-কাঁঠালের বনের মাথার ওপরকার নীলাকাশে দু' একটা নক্ষত্র উঠে সরলা স্নেহ-দুর্বলা বধূটির ওপুর সস্নেহ কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

তারপর এক শান্ত আঙ্গিনায় তুলসী মঞ্চমূলে স্নেহাস্পদের মঙ্গলপ্রার্থিনী

সে কোন প্রণাম-নিরতা মাতৃমূর্তি করুণা-মাতা অশ্রু-ছলছল।…

ওগো লক্ষ্মী, ওগো স্নেহময়ী পল্লীবধূ, তুমি আজও কি আছো? এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আজও তুমি কি সেই পুকুরের ভাঙা ঘাটে সেই আবার জল আনতে যাও?…আজ সে কত কালের কথা হ'ল, তারপর জীবনে আবার কত কি দেখলুম, আবার কত কি পেলুম…আজ কতদিন পরে আবার তোমার কথা মনে পড়ল। তোমায় আবার দেখতে বড় ইচ্ছে করছে দিদিমণি, তুমি আজও কি আছো? মনে আসছে, অনেক দূরের যেন কোন ঘর…মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলো…মৌন সন্ধ্যা…নীরব ব্যথার অশ্রু…শান্ত সৌন্দর্য…স্নেহমাখা শাড়ীর অাঁচল…

আরব সমুদ্রের জলে এমন করুণ সূর্যাস্ত কখনও হয়নি!

———

ছেলেমানুষ তখন আমি। আট বছর বয়স। দিদিমা বলতেন, তোর বিয়ে দেব ওই অতুলের সঙ্গে।

মামার বাড়ীতে মানুষ, বাবা ছিলেন ঘর-জামাই—এসব কথা অবিশ্যি আরও বড় হলে বুঝেছিলাম।

অতুল আমার দিদিমার সইয়ের ছেলে, কোথায় পড়ে, বেশ লম্বামত আধফর্সা গোছের ছেলেটা। আমাদের রান্নাঘরে বসে দিদিমার সঙ্গে আড্ডা দিত। অতুলকে আমার পছন্দ হতো না, কেমনধারা যেন কথাবার্তা আমায় বলতো—এই পাঁচী, যা—এখানে কি? ঐ দিকে গিয়ে খেলা করগে যা—

কখনো বলতো—অমন দুষ্টুমি করবি তো বাঁশবনে লম্বা শেয়ালটা আছে, তার মুখে ফেলে দিয়ে আসবো বলে দিচ্চি—

অতুলকে সবাই বলতো ভাল ছেলে। লেখাপড়ায় বছর-বছর ভালো হয়ে ক্লাশে উঠতো। আমার ছোট মামার সঙ্গে কি সব ইংরিজি-মিংরিজি বলতো—যদি তার কিছু বুঝি।

এইসব জন্যেই হয়তো অতুলকে আমার মোটেই ভালো লাগতো না। তা সে যতই ভালো হোক, লোকে তাকে যতই ভালো বলুক।

ভালো আমার লাগতো মুখুয্যে-বাড়ীর নন্তুকে। কি সুন্দর ফর্সা চেহারা, ননী-ননী গড়ন, ডাগর চোখ-দুটি বেশ হাসি-হাসি মুখখানি। বয়সও অতুল মামার মত অত বেশী নয়, আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড় হবে। অতুল মামার বয়েস হয়তো ছিল ষোলো-সতেরো।

নন্তু হাসলে তার মুখ দিয়ে যেন মুক্তো ঝরতো—দিদিমার সেই গল্পের মত। এমন সুন্দর মুখ আমার আট বছরের জীবনে এ আজ পাড়াগাঁয়ে ক'টাই বা দেখেছি! দিদিমার কাছে এসে মাঝে-মাঝে সেও গল্প করতো, সে যা বলতো, তা যেন মধুর অতি মধুর। আমি হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে একমনে ওর কথাগুলো যেন গিলতাম। অতুলও তো কথা বলে, কিন্তু তার কথা এত ভালো লাগতো না তো?

দিদিমা বলতেন—অতুলের সঙ্গে পাঁচীর বিয়ে দেবো, বেশ মানাবে।

আমি খুব ভারি করে বলতাম—ছাই মানাবে।

দিদিমা হেসে বলতেন—ওমা মেয়ের কাণ্ড ছাখো। কেন মানাবে না? তুমি তো সব জানো!

—তবে তোর মনটা কি শুনি? কাকে বিয়ে করবি তুই?

—ওই নমুকে।

দিদিমা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলতেন—এর মধ্যেই মেয়ে নিজের বর বেছে নিয়েছে। ধন্যি যা হোক, একালের মেয়ে কি না! শুনলে সই, নমু নাকি ওর বর হবে।

অতুলের মা হেসে বলতেন—কেন রে, অতুলকে তোর পছন্দ হয় না কেন?

—অতুল মামার বয়স বেশি।

—বেশি আর কত? ষোল বছর।

—তা যাই হোক, ষোল বছরের বুড়োকে আমি বুঝি বিয়ে করবো? নমু ছেলেমানুষ।

দিদিমা বলতেন—ছাখো সই, একালের মেয়ের কাণ্ড। নমুর বয়স বারো, ওকেই বেশি পছন্দ। তোমার-আমার কাল চলে গিয়েচে। তেরো বছর বয়সে যখন আমার বিয়ে হলো উনি তখন বিয়াল্লিশ, দোজ পক্ষে আমায় ঘরে আনলেন। তোমারও তো—

অতুলের মা বল্লেন—আমার অত না। উনি তখন উনত্রিশ, আমার এগারো।

—দোজপক্ষ তো বটে।

—শুধু তাই? সতীন বেঁচে।

—আমায় ভগবান সেদিন থেকে নিষ্কণ্টক করেছিলেন, তাই খানিক রক্ষে।

মাঝে-মাঝে নমুকে অনেকদিন দেখতাম না। আমাদের পাড়ায় সে আসতো না খেলতে। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো, ছুটে যেতাম মুখুয্যেবাড়ীতে।

নমুমামা উঠোনে বসে কঞ্চি কেটে খেলাঘরের বেড়া বাঁধছে। সঙ্গে

আরও তিন-চারটি ছেলে, ওরই বয়স।

আমি বললাম—ও নসুমামা, আমাদের বাড়ী যাওনি যে?

—কি রোজ-রোজ যাবো! তুই এতদূর এলি যে? আসতে ভয় করে না?

—না।

—খেলা করবি?

—হুঁ।

অন্য ছেলেগুলো তক্ষুনি বলে উঠতো—মেয়েমানুষ আবার আমাদের সঙ্গে খেলবি কেন? যা তুই, পুঁটি-মান্তিদের সঙ্গে খেলগে যা।

নসু বলতো—খেলুক আমাদের সঙ্গে—তাতে কি।

হাবু বলতো—ও কি দা দিয়ে কঞ্চি কেটে আনতে পারবে? কি খেলা হবে ওকে নিয়ে? যা তুই—

আমাকে কাঁদো-কাঁদো দেখে নসু এসে হাত ধরতো। বলতো—কেন ওকে অমন কচ্ছিস তোরা? ও কেন কঞ্চি কাটতে যাবে? মেয়েমানুষ, চুপ করে বসে থাকবে। বোস তুই পাঁচী—

আমি অমনি কৃতার্থ হয়ে উঠোনের একপাশে বসে পড়তাম। নসুমামা খেলতে-খেলতে হয়তো একটা পেয়ারা খুঁড়ে দিতো আমার দিকে। বসে বসে পেয়ারা চিবুতাম। অনেকক্ষণ করে বলতাম—নসুমামা খিদে পেয়েচে—

হাবু অমনি বলে উঠতো—ঐ শোনো কথা। ও সব হাঙ্গামা—

নসুমামা বলতো—তুই চুপ কর্ হাবু। খিদে পেয়েচে? চল্ পিসিমার কাছে, দুটো চালভাজা খাবি তেল-নুন দিয়ে, না একটা কচি শসা পেড়ে দেবো—

আমি বলতাম—না, তুমি বাড়ী দিয়ে এসো। আমি বাড়ী গিয়ে ভাত খাবো।

হাবু আমনি চোখ পাকিয়ে বলে—তবে একলা এলি কি করে? কে এখন তোর সঙ্গে যাবে পৌঁছে দিতে? উঃ, ভারি পাজি মেয়ে—

নসু আমায় আগে-আগে বাড়ী পৌঁছে দিতে আসতো, ধুলোমাটির পথের ধারে কত কেঁচোর মাটি, কত বেনে-বৌ গাছে-গাছে, পাকা বকুল

পড়ে থাকতো বকুলতলায়। নম্নুকে পাকা বকুল খাওয়াতে ইচ্ছে করতো, আমি বড্ড ভালোবাসি পাকা বকুল। নম্নুমামাকে কুড়িয়ে খাওয়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে বলতো—দুর, ও কষা-কষা লাগে। তুই খা, আমি খাবো না। নম্নুকে খেতে দিয়ে যেন আমার তৃপ্তি, সে সুযোগ ও আমায় দিত কই।

এইভাবে সারা শৈশব ও বাল্যকাল কেটে গেল সেই আমার ছেলেবেলাকার অতিপরিচিত মামার বাড়ীর গ্রামের গাছপালার ছায়ায়, চৈত্র মাসের পাখী-ডাকা শীতল সকালবেলাকার মত। তারপরেই জীবনের রোদ খরতর হয়ে উঠলো ক্রমশ। ফুল-ফোটা-পাখী-ডাকা বসন্তপ্রভাত গেল ধীরে-ধীরে মিলিয়ে। বাতাস গরম হয়ে উঠলো।

সেই গাঁ, সেই তাঘরা শেখহাটি এখনও আছে। মাঝে-মাঝে এখনও সেখানে যাই, কত বদলে গিয়েছে সে জায়গা। সে মামার বাড়ী নেই, সে দিদিমাও নেই।

বাবা কোথায় কাদের আড়তে কাজ করতেন। সামান্য ক'টি টাকা মাইনে পেতেন, দিদিমার সঙ্গে সংসারের খরচপত্র নিয়ে তাঁর প্রায়ই ঝগড়া-তর্ক হতো। বাবা রাগ করে চলে যেতেন বাড়ী থেকে, দু-একমাস কোন খবর আসতো না, মা কান্নাকাটি করতেন, হঠাৎ বাবা একদিন এসে হাজির হতেন। দিন এভাবেই চলতো।

তেরো বছর বয়সে আমার বিয়ে হলো আড়ংঘাটার কাছে এক গ্রামে। বিয়ের দিনকতক আগে নম্নুদের বাড়ী গিয়েছিলাম। নম্নুর মা'র শরীর খারাপ, নম্নু রান্নাঘরে ভাত র'াধছে। উনুনের আঁচে ওর ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে গিয়েছে। ওদের বাড়ীর কোন বিলিব্যবস্থা নেই। অনেকগুলো ভাই নম্নুর, তারা কেউ বাইরে পড়ে, কেউ কাজ করে। নম্নুর মা'র শরীর চিররুগ্ন, সংসারের রান্নাবান্নার ভার নম্নুমামার উপর। আজ অনেকদিন থেকেই নম্নুর এই অবস্থা দেখছি।

নম্নুর অবস্থা দেখে সত্যিই কষ্ট হলো। নম্নুর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই, ভাইয়েরা সব স্বার্থপর সংসার চালানোর ভার ওর ওপর ফেলে দিয়ে সবাই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে।

নম্নুমামা আমায় দেখে হেসে বল্লে—আয় পাঁচী, বোস। কাল দই

পেতেছিলাম, দইটা বসেনি। উনুনের পাড়ে রেখে দেবো, কি বলিস?

যত সব মেয়েলি গল্প নস্তুর। সাধে কি ওকে সকলে বলে জনার্দন মুখুয্যের বিধবা মেয়ে? আমায় বল্লে—কাল বুঝলি, এক মুঠো মুগের ডাল ভাজলাম, বেলা গেল ডালভুল করতে। গা-হাত-পা ব্যথা।

বল্লাম—তুমি ডাল ভাজলে? সত্যি?

—হ্যাঁ রে। নইলে কে করবে? আবার কাল একগাদা ময়লা কাপড় সোডা-সাবান দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে।

দুঃখিত সুরে বল্লাম—ওসব মেয়েলি কাজ। তুমি ওসব করো কেন? আমায় ডাকলে না কেন? আমি ডাল ভেজে দিতাম।

নস্তু বল্লে—আহা! আমি না-পারি কি? তোকে ডাকতে যাব কেন?

—লেখাপড়া করবে না নস্তুমামা? এসব কাজ কি তোমার সাজে? পুরুষমানুষ, লেখাপড়া করো।

—আমায় কে পড়াবে? দাদারা এক পয়সা দেবে না। তা ছাড়া মা'র শরীর খারাপ, আমি বাড়ী থেকে গেলে রান্নাবান্না কে করে বল।

আমি বসে-বসে ওর কুটনো কুটে দিলাম। আমার বিয়ের কথা বল্লাম। নস্তুমামা বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলে না। ও যদি একটুও আগ্রহ প্রকাশ করতো, শুনতো কোথায় আমার বিয়ে হচ্চে ইত্যাদি, তা'হলে আমার ভালো লাগতো। কিন্তু নাঃ, সে সুখ আমার অদৃষ্টে নেই। নস্তুমামা একটা কথাও জিজ্ঞেস করলে না সে সম্বন্ধে।

আমার বিয়ের রাত্রে নস্তু নেমন্তন্ন খেয়ে এল পেট পুরে, কিন্তু না এল একবার বিয়ে দেখতে, না একবার বাসরঘরে উঁকি মেরে দেখলে। আমার মনটা যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, ও যদি আসতো তবে খুব ভালো লাগতো। মনের মধ্যে ডুব দেবার সময় আমার নয় তখন, তবুও কি যেন একটা হয়ে গেল, এতো, বাজনা, এত খাবার-দাবার, এত লোকজনের যাতায়াত, আমার নতুন কাপড়, গয়না—কিছুই ভালো লাগলো না। মনে উৎসাহ নেই।

আগেই বলেচি আমার বিয়ে হয়েছিল আড়াংঘাটার কাছে শিকারপুরে। স্বামীর বয়সও সতেরো-আঠারোর বেশি নয়। রোগা চেহারা, মাথার চুল-ওঠা। বিয়ের পরে জানা গেল স্বামী ম্যালেরিয়ার পুরনো

রোগী। মাসে দু'বার ম্যালেরিয়া জ্বর বাঁধা আছেই। আড়ংঘাটার যুগল-কিশোর ঠাকুরের মেলার সময় ময়রার দোকান খোলেন আমার খুড়শ্বশুর, স্বামী তাড়ু দিয়ে সন্দেশ-মুড়কি ভিয়েন করেন।

শ্বশুরবাড়ীতে যাবার সময় মনে খানিকটা কৌতূহল নিয়ে যে না গিয়েছিলাম, এমন নয়। না জানি কেমন বাড়ী-ঘর, কেমন খাওয়া-দাওয়া। গিয়ে দেখি, পুরনো আমলের ইঁট বের করা কোঠাবাড়ী, দুটি মাত্র ঘর, ছোট একটা বারান্দা, তবে সব ঘরগুলির সামনে শান-বাঁধানো টানা রোয়াক এবং রান্নাঘরটিও কোঠা। খুব বড় একটা আম গাছ সমস্ত বাড়ীর উঠোন জুড়ে ঘুপসি করে রেখেচে।

আমার শাশুড়ী গর্বের সুরে বল্লেন—আমের সময় তো আসচে, দেখো বৌমা। এমন আম এ অঞ্চলে নেই আমার বাগানে যা আছে, ডাকসাইটে বাগান, কর্তা করে রেখে গিয়েছিলেন, এস্তেক গোয়াড়ি, এস্তেক শান্তিপুর, কোথা থেকে কলমের চারা এনে না পুঁতেচেন।

আমের সময় এল, কোথা থেকে ব্যাপারীরা এসে বাগান কিনে নিলে। দু-এক ঝুড়ি আম যা আমাদের বাড়ী এল, তা থেকে দুটো-একটা জুটল আমার ভাগ্যে। শাশুড়ী নিতান্ত বাজে কথা বলেন নি, আম ভালো।

স্বামীর সঙ্গে আলাপ জমলো মন্দ নয়। ক্রমে তাঁকে ভালোও লাগলো। আমায় বল্লেন—তুমি কি খেতে ভালোবাসো?

আমি লজ্জা-টজ্জার ধার ধারিনে, বলে ফেল্লাম—তেলেভাজা খাবার।

স্বামী বল্লেন—দূর! অমন বোকা মেয়ে কেন? ভালো খাবারের নাম করো।

—গজা। জিলিপি।

—কেন খাজা?

—সে আবার কি গা? আমাদের গাঁয়ে শুনিনি তো।

উনি হো-হো করে হেসে বল্লেন—পাড়াগেঁয়ে ভূত! আমাদের এ শহর বাজার জায়গা। কাল খাজা আনবো লুকিয়ে। কিন্তু সাবধান, মা যেন টের না পায়। বকবে। আমি নিজে খাজা ভিয়েন করি।

সেই থেকে মাঝে-মাঝে স্বামী লুকিয়ে-লুকিয়ে খাবার আনেন। কোনোদিন খাজা, কোনোদিন মিহিদানা। আমরা দু'জনে লুকিয়ে খাই।

স্বামী বল্লেন—সবাইকে দিতে গেলে চলে না। খুড়তুতো ভাইয়েরা হাঁসের পাল, সবার মুখে দিতে গেলে তোমার-আমার মুখে এক টুকরো উঠবে কি না-উঠবে।

শ্বশুরবাড়ী ভালো লাগলো না বটে, তবে স্বামীকে কিছুটা ভালো লাগলো এই খাবার খাওয়া থেকে। উলোর জাতের মত বড় মেলা এ অঞ্চলে নেই, সে সময় ময়রার দোকানে কাজ বেশি। উনি ফেরেন অনেক রাতে। হাতে বড়-বড় ঠোঙায় খাবার ভর্তি। উনি হেসে বলতেন—খাও, খাও, খুব খাও—এসো দু'জনে পেটভরে খাই।

একদিন কি করে খুড়শ্বশুর টের পেলেন লুকিয়ে খাবার আনার ব্যাপারটা। এ নিয়ে খুব ঝগড়া হলো বাড়ীতে। আমাকে আর ওঁকে যথেষ্ট অপমান গালিগালাজ সহ্য করতে হলো।

খুড়শাশুড়ী বল্লেন—অমন নোলায় সাত ঝাঁটা মারি। লুকিয়ে-লুকিয়ে খাবার খেয়ে দোকানটা শেষ করে দিলে গা! এমন অলক্ষী বৌ তো কখনও দেখিওনি, শুনিওনি। লজ্জাও করে না গুরুজনদের লুকিয়ে খেতে।

স্বামীকে রাত্রে বল্লাম—আর এনো না। দ্যাখো তো কি কাণ্ড বাধালে।

স্বামী বল্লেন—না আনবে না! আমায় কি মাইনে দেয় কাকা? বিনি মাইনের চাকর করে তো রেখেচে। পেটে দুটো খাবো না? ঠিক আনবো লুকিয়ে, তুমি দেখো। কেমন করে ধরবে কাকা, তা দেখবো?

স্বামীর শরীর ভালো নয় অথচ ঘোর পেটুক। আমার কথা শুনতেন না। খাবার চুরি বন্ধ হলো না। রোজ রাত্রে একগাদা বাসি লুচি আর রসগোল্লার রস আনেন। নিজে খান, আমাকেও যথেষ্ট দেন। ওঁর পেটের অসুখ ছাড়ে না। আমার বারণ শোনেন না মোটে।

বলেন—খেয়ে যা উঠিয়ে নিতে পারি। কাকা একপয়সা উপুড়-হাত করবে না!

আমি বল্লাম—আমি বাপের বাড়ী যাবো আষাঢ় মাসে, আমায় নতুন কাপড় কিনে দেবে না?

উনি ঠোঁট উল্টে বল্লেন—কে দেবে? কাকা? তা দেখে আর বাঁচলাম না!

—সত্যি আমার নতুন কাপড় হবে না? বাপের বাড়ীতে কিন্তু সবাই

নিন্দে করবে।

—যদি আমি দিতে পারতাম, সব হতো। আমার কি ইচ্ছে করে না তোমায় কাপড় দিতে? কোথায় পাবো?

তাই তো। অনেকের নিন্দে শুনতে হবে, তাই ভাবচি।

আষাঢ় মাসে বাপের বাড়ী এলাম। স্বামীও আমার সঙ্গে এলেন। তাঁকে দেখে গ্রামের সমবয়সী মেয়েরা নানা রকম নিন্দাবাদ করতে লাগলো। আমায় একদিন রায়বাবুর মেজগিন্নি বল্লেন—হ্যাঁ পাঁচী, জামাই নাকি তাড়ু ঘোঁটে ময়রার দোকানে?

আমি অতশত বুঝি নে, বল্লাম—হ্যাঁ। খুব ভালো খাজা তৈরি করে। সবাই হাতের সুখ্যাতি করে মাসীমা।

মেজগিন্নী হেসেই খুন। তাঁর বড় পুত্রবধূ যে বাপের বাড়ী থেকে আসতে চায় না, বাপের বাড়ীর কোন প্রতিবেশী ছেলের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত, এসব কথা তিনি তখন ভুলে গেলেন। আমার স্বামীর খাবারের দোকানে কাজটাই প্রবল দোষের ও নিন্দের কারণ হয়ে উঠল তাঁর কাছে। আমার স্বামীকে গ্রামের লোকে নতুন জামাই বলে খাতির আদর করলে না। আমার তাতে মনে বড় দুঃখ হলো। নতুন জামাইকে সকলে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়, আমার স্বামীকে সবাই যেন কেমন হেনস্থা করলে।

নন্তুমামা ঠিক তেমনি ভাত রাঁধচে। আমি তার ওখানে গিয়ে বসে গল্প করে একটু যা আনন্দ পেতাম। একটা জিনিস দেখলাম, নন্তু ধর্মে-কর্মে মন দিয়েচে এই বয়সেই। চন্দন ঘষচে দেখে বল্লাম—দিদিমা পূজো করেন বুঝি আজকাল? নন্তু হেসে বল্লে—মা নয়। পূজো করবো আমি। রোজ শিব পূজো করি। মানুষ হয়ে জন্মে শুধু খেয়ে যাব শুয়োরের মত!

আমার হাসি পেলো ওর মুখে তত্ত্বকথা শুনে। নন্তুমামা আমাকে শসা কেটে খেতে দিল, নিজেই নারিকেলের নাড়ু করেচে ঘরে, তা দিলে, চা খেতে দিলে।

বছর দুই-তিন কাটলো। আমার স্বামীর শরীর সারলো না। ক্রমেই যেন আরও খারাপ হয়ে উঠচে। শাশুড়ী ও খুড়শাশুড়ী বলেন—ওই অলুক্ষণে বৌ এসে বাছার শরীর একদিনও ভালো গেল না।

শাশুড়ী বল্লেন—সংসারের কোনো জিনিসে আঁট নেই, তা দেখেছ

লক্ষ্য করে ?

কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়, এ আমিও স্বীকার করচি। সত্যিই যেন আমার কোনো জিনিসে কোনো আসক্তি নেই। ভালো কাপড় নয়, —কোনো কিছুতে না। আমার স্বামী বলেন—পয়সা জমাও না কেন? যা মাঝে-মাঝে হাতে এনে দিই, জমিও। তোমার আখেরে ভালো হবে।

ওসব কথা আমিও শুনেও শুনিনি কোনোদিন। কার আখেরে কি হবে, সে ভেবে ফল কি।

আমার একটি ছেলে হলো, কয়েক মাস পরে মারাও গেল। স্বামীর অসুখ সারে না। সংসারে খেটেই মরি, মুখের মিষ্টি কথা কেউ বলে না। স্বামী আমায় নানারকম সাংসারিক উপদেশ দেন। তাঁর যে রকম শরীর, কবে মরে যাবেন, তখন কি উপায় হবে? আমি যেন কিছু-কিছু হাতে রাখি। এ কথা যখনই শুনি তখনই মনে থাকে, তারপর মনে থাকে না।

সেই মাঘ মাসে আমি বাপের বাড়ী এলাম। গ্রামে এসে শুনি নস্থুমামার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে, সে দিন-রাত পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকে, কারো সঙ্গে কথা বলে না, কি রকম যেন। আমি গিয়ে দেখা করলাম বিকেলের দিকে। নস্থুমামা বললে—কি খবর পাঁচী, কখন এলি?

—কাল এসেছি! ভালো আছ?

—ভাল আছি। খুব আনন্দে আছি।

—সবাই তোমাকে পাগল বলচে যে?

নস্থুমামা মৃদু হেসে চুপ করে রইল। তারপর আমার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আমি আসল বস্তু পাওয়ার চেষ্টায় আছি। এতে যে যাই বলে বলুক। আমি পাগলই হই আর ছাগলই হই—হি-হি—হি-হি—হ্যাঁরে পাঁচী?

শেষের কথাগুলো আমার কানে একটু অসংলগ্ন-মত ঠেকলেও নস্থুমামার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কি যেন একটা ওর মধ্যে আমি পেলাম, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখিনি। ওর মুখের চেহারা যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। লোকে টাকাকড়ি ঘর-জমি আঁকড়ে পড়ে আছে দেখচি আমার চারিপাশে, খুড়শাশুড়ীকে দেখেছি গাছের সামান্য একটা আম যদি গাছের তলা থেকে কোনো-বাড়ীর ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে ঝগড়া

করে পাড়া মাত করেন। গাঁয়ের মধ্যে দেখেচি এক হাত জমি হয়তো এগিয়ে বেড়া দিয়েছে কেউ, তাই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা দু-তিন বছর ধরে চলেচে। এমন আবহাওয়ার মধ্যে নসুমামা মানুষ হয়েও স্বতন্ত্র, ওর কাপড়-চোপড়ে, খাওয়ার, বিষয়-আশয়ে কোনো আসক্তি নেই; পৈতৃক বিষয় আছে, কিন্তু ভায়েদের দিয়ে দিয়েছে সর্বস্ব, একটা পয়সাও চায় না।

আমার স্বামী এসে দু-চারদিন রইলেন। স্বামীর ওপর আমার কেমন একটা মায়া হয়। এর মুখের দিকে কেউ যেন চায় না আমার শাশুড়ী ছাড়া—তাও তিনি বুড়ো হয়েছেন, দেওরের কাছে কোনো কথা তাঁর খাটে না। আমাদের গ্রামেও তাঁর তেমন খাতিরযত্ন নেই।

বললেন—এই গাঁয়ে একটা ঘর করলে ভালো হয়।

আমি বললাম—কেন, শ্বশুরবাড়ী বাস করবে? কেউ কিছু বলবে না?

—বলুক গে। কাকার ওখানে আর ভালো লাগে না।

—দেখ ভেবে।

—তোমাদের গাঁয়ের লোকগুলো যেন কেমন-কেমন। ভালো করে কথাই বলে না।

আমি রেগে বললাম—তাড়ুঘোঁটা জামাইকে কে খাতির করবে শুনি?

স্বামী হেসে চোখ টিপে বললেন—ইঃ! রোজ-রোজ রাত্তিরে খাজা খাওয়ার সময় তো খুব ভালো লাগে?

দু-একদিন পরে উনি চলে গেলেন। যাবার সময় আমার হাতে তেরো আনা পয়সা দিয়ে বলে গেলেন—খাবার কিনে খেও। মাসখানেক থাকো, তারপর এসে নিয়ে যাবো।

আর আসেন নি তিনি। সেই মাসের শেষের দিকে পুরনো আমাশা রোগে তিনি আমার সিঁথির সিঁদুর আর হাতের শাঁখা ঘুচিয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন। বাবা চিঠি পেয়ে আমাদের প্রথমে কিছু বলেননি, তারপর দু'দিন পরে মাকে একদিন বললেন—হ্যাঁ একটা কথা, জামাইয়ের বড় অসুখ, চিঠি পেয়েচি।

মা আড়ষ্ট সুরে বলে উঠলেন—সে কি গো! এতক্ষণ বলনি কেন? হাটে চিঠি পেলে? কই দেখি চিঠি।

বাবা আমতা-আমতা করে বলেন—তা—ইয়ে মনে ছিল না। তা

নয়—ইয়ে—

আমি কান খাড়া করে পাশের ঘরে বসে সব শুনচি। আমার বুকের মধ্যে টিপ্‌টিপ্‌ করচে। মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে যেন। জিব শুকিয়ে আসচে। আমি বুঝতে পেরেচি সব। বাবা অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ লোক, জামাইয়ের অসুখ-সংবাদে চুপ করে বসে থাকবার মানুষ নন। মা ছুটে হাঁপিয়ে বাবার কাছে এসে বললেন—তার কাছে এখুনি চলে যাও। মেয়ের যাবার কথা লেখেনি? ওকেও নিয়ে যাও—

বাবা শুষ্কমুখে বললেন—আর সেখানে গিয়ে কি হবে গিন্নী। সব শেষ হয়ে গিয়েচে।

মা মেঝের ওপর আছড়ে পড়লেন আর্ত্ত চীৎকার করে। আমি কিন্তু বেশ সহজভাবেই কথাটা শুনলাম, কারণ আমি আগেই বুঝতে পেরেচি বাবা কি বলবেন।

এইভাবে আমার বিবাহিত জীবনের ইতি হয়ে গেল। কি করবো, আমার অদৃষ্ট। বাবা তো বুড়োহাবড়া স্বামীর হাতে আমায় দেননি, ছোকরা দেখে দিয়েছিলেন, আমার কপালের লেখা, কারো দোষ নেই। আমার কিন্তু বিশেষ কোন দুঃখ নেই মনে। বিশেষ কিছু যে হারিয়েচি, বিশেষ কোন অভাববোধ নেই। লোকে বলচে আমার নাকি সর্বনাশ হয়ে গেল। কি সর্বনাশ হলো কিছু বুঝতে পারচি নে। মাছ খেতে পাবো না, নাই বা পেলাম; একাদশী করতে হবে, করবো। ভালো খাওয়া বা পরার দিকে আমার কখনো কোন ঝোঁক নেই। তবে মানুষটার ওপর মায়া জন্মেছিল বটে। তাকে আর দেখতে পাবো না, এইটুকু যা কষ্ট।

বিধবা হওয়ার পরে আমি অনেকবার শ্বশুরবাড়ী গেলাম।

শাশুড়ীর সেবা করি, মুখরা জায়ের সংসারে পুত্রহীন বৃদ্ধার বড় কষ্ট, যত দূর পারি সেটুকু ঘোচাবার চেষ্টা করি। একাদশীর দিন শাশুড়ী-বৌয়ে নিরম্বু উপোস করি, সন্ধ্যের সময় তাঁর পায়ে তেল মালিশ করি।

খুড়শাশুড়ী সর্বদা শোনান, আমি অলুক্ষুণে বৌ, আমায় ঘরে এনেই তাঁর সোনার চাঁদ ছেলে, দুধের বাছা মারা গেল।

ভাসুরপো'র ওপর এমন স্নেহ, ভাসুরপো'র জীবদ্দশায় কোনোদিন দেখেচি বলে মনে করতে পারলাম না। আশ্চর্য!

একবার বাপের বাড়ী এসে শুনলাম নম্বুমামা বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েচে। ছ'মাস পরে খবর এল হালিসহরের এক কালীমন্দিরে সে আছে, গঙ্গার তীরে ছু'খানা ভাঙা মন্দির, সেখানে সে পূজো-আচ্চা নিয়েই নাকি আছে।

খবরটা দিলে ও পাড়ার বুধো গয়লার মা, ঘোষপাড়ার দোল দেখে দেশে ফেরবার পথে সে হালিসহরে গিয়েছিল, সেইখানেই দেখা হয়েচে। আমি মনে-মনে ভাবলাম, ওর পক্ষে ভালোই হয়েচে। কি জানি কেন আমার মনে হয় নম্বুমামা যা করে, তাই ভালো।

এইভাবে দিনের পর দিন কাটে। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে কত যত্নে আগলে নিয়ে বেড়াই, বাপের বাড়ী গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারিনে, পাছে বুড়ীর কষ্ট হয়। একদিন শাশুড়ী বললেন—চল মা, সান্যাল মশায়ের বাড়ী ভাগবত শুনে আসি—

—সে কে মা?

—পাড়ার বুড়ো সান্যাল দাদা, জ্যাখোনি বুড়োকে?

সান্যাল মশায়ের বাড়ী গেলাম। ওঁর অবস্থা বেশ ভালো বলে মনে হলো বাড়ীঘর দেখে, শুনলাম দুই ছেলে কলকাতায় চাকরি করে, তাদের স্ত্রী-পুত্র তাদেরই সঙ্গে কলকাতার বাসায় থাকে। সান্যাল মশায় বিপত্নীক। বয়স ছিয়াত্তর বছর, নিজেই বললেন। একটি বিধবা বোন বাড়ীতে থাকে ও রান্নাবান্না করে। আমাদের দেখে খুব যত্ন করলেন, আমাদের সামনে ভাগবত ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

সেই থেকে সান্যাল মশায়ের বাড়ীতে রোজ যাই। আমায় তিনি বড় ভালোবাসেন, যোগবশিষ্ঠ ও ভাগবত তাঁর প্রিয় বই। যদি দু'দিন না যাই, সান্যাল মশায় আমার শ্বশুরবাড়ী আসবেন। আমার শাশুড়ী তাঁর বৌমা। ডেকে বলেন—ও বৌমা?

বৃদ্ধা শাশুড়ী মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বলেন—কি দাদা?

—নির্মলা (আমার ভালো নাম) কোথায়? ডেকে দাও।

আমি বের হয়ে এসে বলি—কি দাদু?

—দাদু কি রে, তোমার জ্যাঠামশাই হই। তোমার শ্বশুরের চেয়ে এগার বছরের বড় আমি। আমার ওখানে ক'দিন যাওনি কেন? আজ

অবিশ্যি যাবে।

আবার নিয়মিত ভাবে যাই। সান্যাল মশায় আজকাল আর কোন শ্রোতা চান না, আমার মধ্যে কি যে দেখেচেন—আমাকে পেয়ে খুব খুশি। যোগবশিষ্ঠ পাঠ জমে না আমি না গেলে।

একদিন তাঁকে বললাম—জ্যাঠাবাবু আমি তো মুখ্য মেয়েমানুষ, আমার মধ্যে কি পেলেন আপনি?

—কি পেলাম কি জানি। কিন্তু তুমি গেলে মা আমার গীতা আর যোগ-বশিষ্ঠ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। ওদের শ্লোকের মধ্যে থেকে নতুন ভাষ্য বেরিয়ে আসে। আনন্দ যদি শাস্ত্র-আলোচনার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটার ষোল আনাই পাই তুমি আস্‌লে মা।

আমি হেসে বল্লাম—তাহ'লে বলুন জ্যাঠামশাই, আমার মত শ্রোতা আপনি অনেকদিন পাননি?

—সত্য মা, এতদিন জানতাম না যে লোককে শুনিয়ে এত আনন্দ হয়। নিজেই চর্চা করতাম, এই পর্যন্ত। আজ কিন্তু অন্যরকম বুঝছি। উপযুক্ত শ্রোতা পেলে—

—আমারও ভালো লাগে বলেই যাই। কেমন যেন মন বদলে যাচ্চে, যে মন আমার কোন কালেই সংসারে ছিল না—তা আরও নিরাসক্ত হয়ে পড়েচে। বন্ধনের মধ্যে কেবল বৃদ্ধা শাশুড়ী। বৃদ্ধা কাঁদেন, আমি বসে যোগ-বশিষ্ঠের উপদেশ শোনাই। কিন্তু তাতে তাঁর মন ভেজে না। ঘোর বিষয়ী মন। এ বয়সেও কাঁঠালের ভাগ নিয়ে, সজনে ডাঁটার ভাগ নিয়ে খুড়শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া। আমি বলি—মা, কি হবে এঁচড় আর সজনেডাঁটার চুলচেরা ভাগে। ওর কি সার্থকতা? ভগবানের নাম করুন।

বাতাবী লেবু ফুটলো ফাগুন মাসে—পথে-পথে অপূর্ব সুগন্ধ ছড়িয়ে। ঘেঁটুফুলে বাঁশবনের তলা ভর্তি হয়ে গেল। কোকিলের ডাকে মন উদাস হয়ে ওঠে, কত কথা ভাবি। বাল্যকালের কথা, মা-বাবার কথা, স্বামীর কথা—জীবনে কিছু না পেয়েই যেন সব-কিছু পেয়েচি। যদি কোনো হিসাবী-বিষয়ী লোক বলে, কি পেয়েচ, হিসাব দেখাও—হয়তো কিছু দেখাতে পারবো না—কারণ বাইরে আমার অর্ধমলিন সরুপাড় ধুতি আর দু'গাছি অতি সরু বিবর্ণ সোনার চুড়ির মধ্যে কেউ কোনো লাভের সন্ধানই

খুঁজে পাবে না, —আমার মন বলে কি-এক জিনিসের ঠিকানা মিলেচে, যার দরুন অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার আজ আমার কাছে খোলা। অন্য সব কিছু যেন তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে।

একদিন আমার শাশুড়ী বল্লেন—ও বৌমা, তোমাদের গাঁয়ের একটি ছেলে আমাদের গ্রামে হরি কলুর বাড়ীতে এসে চাকরি করচে। বামুনের ছেলে, দিব্যি চেহারা। কিন্তু বাপু, কলুবাড়ী জল তোলে, গরুর জাব কাটে, এ আবার কেমন কথা! বড্ড গরীব বোধ হয়। আমি দেখিনি, কে কাল বলছিল ঘাটে। বল্লে, বৌমার দেশের লোক।

যেদিন শুনলাম, সেদিনই পথে নন্টুমামার সঙ্গে দেখা। কিন্তু প্রথমটা চিনতে পারিনি। নন্টুমামার মাথায় বড়-বড় চুল, পরনে শাড়ী, আধ-ঘোমটা নেওয়া, হাতে কাঁচের চুড়ি, মেয়েলি বেশ, অথচ মুখে ঈষৎ গোঁফ-দাঁড়ি। আমার হাসি পেল ওর এই অপরূপ বেশে দেখে। আমায় দেখে মেয়েলি সুরে বল্লে—ও পাঁচী, ভাল আছিস তো ভাই?

আমি অবাক হয়ে বল্লাম—তোমার এ কি বেশ নন্টুমামা?

নন্টুমামা অদ্ভুত হাসি হেসে বল্লে—এই, থাকলেই হলো একরকম।

—তুমি নাকি কলুবাড়ী বাসন মাজো, জল তোলো?

—দোষ কি?

—তুমি যা ভালো বোঝো।

* * *

বৃদ্ধা শাশুড়ী সেই শ্রাবণ মাসে দেহ রাখলেন। দিন-দশেক জ্বরে ভুগে গভীর রাত্রে মৃত্যুর কিছু পূর্বে অশ্রুভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন—তোমাকে কার কাছে রেখে যাচ্চি মা?

বৃদ্ধার আকুল স্বরে মনে ব্যথা বাজল আমার। তাঁর জরশীর্ণ হাতদুটি ধরে বললাম—কেন, আমার সোনার চুড়ি আছে, এক বিঘে আমন ধানের জমি আছে—ভাবনা কি মা আমার? কিছু ভেব না আমার জন্যে।

বিষয়ী লোককে বিষয়ের ভাষায় সান্ত্বনা দিই। আমি জানি যাঁর কাছে আছি, তিনি আমায় কোনোদিন ফেলবেন না, চরণে স্থান দেবেনই।

নন্টুমামার সঙ্গে দেখা আবার একদিন। সে একগাদা কাপড় সেদ্ধ নিয়ে ঘাটে যাচ্চে কাচতে। আমি বল্লাম—ও-সব কাজ আমায় দাও

নন্তুমামা। আমি তোমায় করতে দেবো না।

জোর করে সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে নিজে কেচে দিলাম। আমার চোখের সামনে ও-সব খাটুনি খাটতে দেবো না ওকে। বল্লাম—হরি কলুর বাড়ী গোয়াল-পরিষ্কার আমি করে দেবো।

—না পাঁচী লক্ষীটি, লোকে কি বলবে?

—আমি গ্রাহ্য করিনে।

—আমি করি।

—মিথ্যে কথা, তুমি কিছু গ্রাহ্য না, কলুবাড়ী বাসন মাজছো অথচ—

—পাঁচী এ সব তুই বুঝবিনে। ওসব করিসনে কক্ষনো।

ওর কথা সান্যাল জ্যাঠাকে বলতে তিনি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওকে দেখবার জন্যে। হরি কলুর বাড়ীর পেছনে একটা পুকুর, পুকুরের চারিধারে আম-কাঁঠালের বাগান। তারই একটা গাছতলায় দেখা গেল ও চোখ বুঁজে বসে। সেই থেকে সান্যাল মশায়ের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। যোগ-বশিষ্ঠের দলে ভিড়ে পড়লো। সান্যাল জ্যাঠা বলেন—ছেলেটি শুদ্ধসত্ত্ব।

* * *

শীতের প্রথমে কলুপাড়ায় কলেরা দেখা দিলে। একদিনে আঠারোটার কলেরা হলো, পাঁচটা মরে গেল। নন্তুমামা কি ভীষণ পরিশ্রম করে সেবা শুরু করলে। হরি কলুর ছোট ভাই ওর সেবাতেই নাকি বেঁচে উঠলো। রাত্রে ঘুমোয় না। নিজ হাতে রোগীদের গা ও বিছানা পরিষ্কার করে।

কলেরায় কলুপাড়া উজাড় হয়ে গেল—ধরলো কিছু দূরে মুচিপাড়াতে। ভয়ে তখন মুচিপাড়ার অনেক লোক পালিয়েছে। বুড়ো হিরু মুচি একদিনের অসুখে মারা গেল। কিন্তু তখন এমন ভয় হয়ে গিয়েচে সকলের, মড়া ঘরের মধ্যে পড়ে রইল সারাদিন, কেউ ফেলতে চায় না। সন্ধ্যের পর নন্তুমামা একা ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ফেলে এল খালের ধারে শ্মশানে।

যোগবশিষ্ঠের আসরে একথা শুনে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমি যাবো, নন্তুমামাকে সাহায্য করবো। যে যা বলে বলুক গে।

জ্যাঠামশায় হেসে বল্লেন—মা, এ কাজ তোমার নন্তুমামার, তোমার জন্যে নয়। সব কাজে অধিকারী-ভেদ আছে।

—কেন? আমার অধিকার জন্মায়নি?

—তোমার শাশুড়ী মরে গিয়েচে, জগতে আর কি বুড়ো-হাবড়া নেই?

—আপনি বলুন নন্দুমামাকে। ও আমাকে নিতে চায় না কোন কাজে। আমি যাবো জ্যাঠামশায়।

এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন নন্দুমামা গ্রাম ছেড়ে চলে চলে গেল। কলু-পাড়ার সবাই হায়-হায় করলো। খুড়শাশুড়ী বল্লেন—ভালোই হলো, চলে গেল, সুবুদ্ধি হয়েচে। বামুনের মুখ অমন করে হাসাতে হয়? ছিঃ ছিঃ—

তারপর মুখ টিপে হেসে বল্লেন—বৌমার বাপের বাড়ীর লোক। খুব কষ্ট হয়েচে বৌমা তোমার—না? যখন-তখন দেখা হতো তো। অন্য গাঁ থাকতে এ গাঁয়ে এসেছিল সেজন্যেই হয়তো, তবুও তো দেশের ঘরের লোক আছে একটা।

ছিলে-খোলা ধনুকের মত সটাং সোজা হয়ে বলে উঠি—নিশ্চয়ই। আমার কষ্ট তো হবারই কথা।

হরি কলু একদিন সান্যাল জ্যাঠার কাছে বল্লে—অমন মানুষ হয় না। ছোট ভাইটা বেঁচে উঠলো, পায়ে ধরতে গেলাম, বলি তুমি ব্রাহ্মণ, আমার ঘরে হেনস্থা কাজ আর করতে দেবো না। ছ'মাসের মাইনে বাকি, একটা পয়সাও নিয়ে গেল না যাবার সময়। হঠাৎ পালিয়ে গেলেন। আমায় যেন ক্ষমা করেন তিনি—হাত জুড়ে সে উদ্দেশে প্রণাম করলে।

* * *

আবার ফাগুনে বনে-বনে ফুল ফুটচে, আবার কোকিলের ডাক পথে-পথে। মুচুকুন্দ চাঁপার সুগন্ধে ঘাটের রাস্তা ভুরভুর করে। আমি একদিকে যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। জ্যাঠামশায়ের বৈঠকখানায় যোগবশিষ্ঠ শুনতে যাই রোজ বিকেলে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব-রিক্ত হয়েই বোধহয় সেখানে পৌঁছুতে হয়।

শ্রাবণ মাসের দিন, বর্ষার বিরাম নেই, এই বৃষ্টি আসছে এই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ক্ষেতে আউশ ধানের গোছা কালো হয়ে উঠেচে, ধানের শিষ দেখা দিয়েচে অধিকাংশ ক্ষেতে।

পুঁটি সকালে উঠে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে—চারিদিক মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো বা একটু পরে টিপ-টিপ বিষ্টি পড়তে শুরু ক'রে দেবে। আজ তার মনে একটা অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি, সেটাকে আনন্দও বলা যেতে পারে, ছদ্মবেশী বিষাদও বলা যায়। কি যে সেটা ঠিক করে না যায় বোঝা, না যায় বোঝানো। আজ তার বিয়ের গায়ে-হলুদের দিন। এমন একটা দিন তার বারো বৎসরের ক্ষুদ্র জীবনে এইবার এই প্রথম এল। সকালে উঠতেই জ্যেঠিমা বলেচে—ও পুঁটি জলে ভিজে-ভিজে কোথাও যেন যাসনি ; আর তিনটে দিন কোনও রকমে ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে যে বাঁচি।

আজ কি বার ?—মঙ্গলবার। শনিবার বুঝি বিয়ের দিন। পুঁটির মনে সত্যিই কেমন হয়, আনন্দের একটা ঢেউ যেন গলা পর্যন্ত উঠে আটকে গেল। বিয়ে বেশি দূরে কোথাও নয়, এইই গ্রামেই, এমন কি এই পাড়াতেই। এক ঘর ব্রাহ্মণ আজ বছরখানেক হ'ল অন্য জায়গা থেকে উঠে এসেচেন এখানে, দু'খানা বড়-বড় মেটে ঘর বেঁধেচেন—একখানা রান্নাঘর। এতদিন ধরে সে সঙ্গিনীদের সঙ্গে সেই বাড়ীতে কুল পাড়তে গিয়েচে, সত্যনারায়ণের সিন্নি আনতে গিয়েচে, যখন পাড়ার প্রান্তের ঘন জঙ্গল কেটে সে ভদ্রলোক বাড়ী তৈরি করেন ঘাটে যাবার পথের একেবারে ডান ধারে, তখন সে কতবার ভেবেচে এই ঘন বনের মধ্যে বাড়ী করে বাস করবার কার না জানি মাথাব্যথা পড়ল।

কে জানত, সেই বাড়ীটাই—আজ এক বছর এখনও পোরেনি—তার শ্বশুরবাড়ী হবে!

কতদূর আশ্চর্যের কথা, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ তারই ক্ষুদ্র জীবনে এমন একটা মহাশ্চর্য ব্যাপার সম্ভব হল। যখনই সে

এ কথাটা ভাবে, তখনই সে শুদ্ধু, তার মন শুদ্ধু যেন কতদূরে কোথায় চলে যায়।

ঐ ভদ্রলোকের একটি মাত্র ছেলে, নাম সুবোধ, তারই সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েচে। সুবোধকে এই সম্বন্ধের আগে তাদের বাড়ীতে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেচে—বেশ ফর্সা, লম্বামত মুখ, এবার ম্যাট্রিক দিয়েচে, এখনও পরীক্ষার ফল বার হয় নি। আগে-আগে, সত্যি কথা বলতে গেলে, সুবোধের মুখ পুঁটি তত পছন্দ করতো না। তার দাদার সঙ্গে এসেচে তাদের বাড়ীতে—পুঁটি ভাবতো—দেখো না ঘোড়ার মত মুখখানা। কিন্তু আজকাল আর সুবোধের মুখ ঘোড়ার মত ত মনে হয়ই না, মনে হয় বেশ চমৎকার মুখ। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে অমন চোখ অমন রং, অমন মুখের গড়ন কার আছে?

রায়েদের পাঁচি সেদিন বলেছিল তাকে—হ্যাঁরে, তুই যে বড় ঘোড়মুখো বলতিস, তোর অদেষ্টে শেষকালে কিনা সেই ঘোড়ামুখোই জুটল!

পুঁটি মারতে ছুটে গিয়েছিল তার পিছু-পিছু।

পুঁটির বাবা গোলার দোরে দাঁড়িয়ে ধান পাড়বার ব্যবস্থা করচে। তার বাবা বেশ চাষীবাসী গেরস্ত। পুঁটিদের বাড়ীতে চারটা বড়-বড় ধানের আউড়ি আছে, গোলা আছে একটা। আউড়ি জিনিসটা গোলার চেয়ে অনেক ছোট, তিন চার বিশ ধান ধরে—আর একটা গোলায় ধরে এক পৌটি অর্থাৎ ষোলো বিশ ধান।

তাদেরও ধান আছে গোলা ভর্তি, সব কটা আউড়ি ভর্তি। কলকাতায় চাকুরী করেন এ পাড়ায় হরিকাকা, তিনি মাঝে-মাঝে গাঁয়ে এসে পুঁটির বাবাকে বলেন—আর কি রায় মশায়, এ বাজারে ত আপনিই রাজা। গোলা ভর্তি ধান রেখেচেন ঘরে, আপনার মহড়া নেয় কে? কলকাতায় 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে একসের চাল নিতে হচ্চে—আর আপনি—।

পুঁটি জিজ্ঞেস্ করেছিল—কিসে দাঁড়িয়ে চাল নিতে হয় বাবা, বলছিল হরিকাকা?

—কে জানে কিসে দাঁড়িয়ে, তুই নিজের কাজ কর, আমি নিজের কাজ করি—মিটে গেল।

—তুমি জান না বুঝি ও কথাটার মানে? না বাবা?

—না জেনেও তো পায়ের ওপর পা দিয়ে এ বাজারে চালিয়ে দিলাম মা। কলকাতার মুখ না দেখেও ত বেশ চলে যাচ্চে।

কলকাতায় নাকি এক সের চালের জন্যে চার ঘণ্টা কোথায় নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—কিন্তু যে বাড়ীতে তার বিয়ে হচ্ছে, তাদের অবস্থা এত ভালো নয়। সুবোধ যদি পাশ করে, তবে হরিকাকা ভরসা দিয়েছেন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে ওঁর আপিসে চাকুরি করে দেবেন। তা হলে তাকেও কি কলকাতায় গিয়ে বাসায় থাকতে হবে, আর সেই কিসে দাঁড়িয়ে রোজ এক সের চাল নিয়ে এসে রাঁধতে হবে? সে বড় কষ্ট—তবে, মানে সুবোধ যদি সঙ্গে থাকে, সে বোধহয় সব রকম কষ্টই করতে প্রস্তুত আছে।

তাদের ধানের গোলা থেকে ধান পাড়া হচ্চে, খাব্‌রাপোতা থেকে সীতানাথ কলু আড়ৎদার এসেচে— ধান কিনে নিয়ে যাবে। বিয়ের খরচপত্র ধান বেচে করতে হবে কিনা।

ওর জ্যেঠিমা বললেন—ও পুঁটি, আজ কোথাও বেরিয়ো না। নাপিত ও বাড়ী থেকে হলুদ নিয়ে আসবে, সেই হলুদ গায়ে দিয়ে তোমার নাইতে হবে।

এমন সময় সাধন জেলে এসে ভিজতে-ভিজতে উঠোনে দাঁড়াল। হাত জোড় করে মাথা নীচু করে প্রণাম করে বললে—প্রাতপেন্নাম।

তার বাবা বললে—ও সাধন, বাবা তোমায় ডেকেছি যে একবার। আমার যে কিছু মাছের দরকার এই শনিবারে।

কি জানি কেন পুঁটির বুকটা দুলে উঠল। এই শনিবার—এই শনিবারে তা হলে সত্যিই তার—

সাধন বললে—আজ্ঞে, মাছের বড্ড গোলমাল যাচ্চে। গাঁয়ে কি মাছ আছে? ডুমোর বাঁওড়ের মাছ সব যাচ্চে কলকাতায়। বিরাশি টাকা দর। এমন দর বাপের জম্মে কোনও কালে শুনি নি রায় মশায়। এক সের দেড় সের পোনা ইস্তক পড়তে পাচ্চে না মরগাঁয়ে বাধল দিয়েলাম—একদিন কেবল এক সাড়ে এগার সের গজাড় মাছ—

পুঁটির বাবা বিস্ময়ের সুরে বললে—সাড়ে এগার সের গজাড়! এমন কথা ত কখনও শুনি নি—

—অবিরত গজাড় রায় মশায়। মাছের এমন দর, গজাড় মাছই বিক্রি হয়েল দশ আনা সের।

পুঁটি আর সেখানে দাঁড়াল না। মাকে এমন আজগুবি খবরটা দিতে ছুটল বাড়ীর মধ্যে। বিষ্টি একটু থেমেচে, একটু কোথাও বেরুতে পারলে ভালো হত। তার জীবনে যে একটা আশ্চর্য ব্যাপার হতে চলেচে, এ কথাটা কারও সঙ্গে আনন্দ করে বললেও চলে না। বেহায়া বলবে, নিন্দে করবে। কেবল বলা চলে তার সমবয়সী পাচি, আর ক্ষেন্তি জেলেনীর মেয়ে টুনির কাছে। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার—তার চেয়ে অন্তত সাত বছরের বড় লতিদির এখনও বিয়ে হয় নি—অথচ লতিদিকে সবাই বলে সুন্দরী, লতিদির বাপের অবস্থা ভালো। লতিদি লেখাপড়া জানে ভালো। গান করে, ওর বাবা যখন কলকাতায় চাকুরী করত, তখন লতিদি স্কুলে পড়ত সেখানে। কত বই পড়ে বসে-বসে দুপুর বেলা। পুঁটি ওদের বাড়ী যায় যখনই, তখনই দেখে লতিদি বই মুখে বসে। পুঁটি ভাল লেখাপড়া জানে না, বইয়ের নাম পড়তে পারে না, লতিদি একটু ঠ্যাকারে, সে লেখাপড়া জানে না, বলে বুঝি আর মানুষ না?

তাকে বলে—তুই বই-টই নাড়িস নে পুঁটি। কি বুঝিস্ তুই এর আস্বাদ?

পুঁটি হয়ত বলে—এটা কি বই বল না লতিদি?

—যা-যাঃ, আর বইয়ের খবরে দরকার নেই। শরৎ চাটুজ্যের নাম শুনেচিস্? কোথা থেকে শুনবি? তোরা শুধু জানিস্ ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কি করে চিঁড়ে কুটতে হয়। তাই করগে যা—এদিকে কেন আবার?

আচ্ছা, আজ তার লতিদিকে বলতে ইচ্ছে হচ্চে—কই লতিদি, তুমি এত বই পড়ে-টড়ে বসে আছ, এত সব নাম জান—কই তোমার ত আজও বিয়ে হ'ল না। আমার জীবনে এত বড় একটা আশ্চর্য কাণ্ড তো টুক্ করে ঘটে গেল। তারপর ম্যাট্রিক পাশ বর। এ গাঁয়ে পাশ করা ছেলে একমাত্র আছে মুখুজ্যেদের জীবন দা'। সে নাকি দুটো পাশ—কোথায় চাক্রী করচে যেন—ঐ দিকে কোথায়। যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্চে, সে মুখ্য নয়। পাশের খবর বেরুবার দেরি নেই—বাবা বলেন, সুবোধ নিশ্চয়ই পাশ করবে। হে ভগবান, তাই করো, পাশ যেন সে করে,

সত্যনারাণের সিন্নি দেবে সে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে।

নাপিত এসে বললে—মা ঠাকরুণ, ওবাড়ী থেকে দেখে এলাম। গায়ে হলুদের লগ্ন বেলা দশটার পর। আপনাদের যা দিতে হবে, তার আগে দিয়ে দেবেন।

গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসবে ওবাড়ী থেকে। কি রকম জিনিসপত্র না জানি আসে। পুঁটির মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। একখানা লাল কাপড় নিশ্চয়ই তারা দেবে। পুঁটির মোটে তিনখানা শাড়ী আর একখানা ডুরে শাড়ী আছে মায়ের বাক্সে তোলা। এবার তার অনেক কাপড় হবে, গহনাও হবে। পাঁচ ভরি সোনা দেবার কথাবার্তা হয়েচে। এতদিন দু'টি দুল ছাড়া অন্য কোনও গহনা তার অঙ্গে ওঠে নি—অথচ ঐ কুমারী মেয়ে লতিদিরই হাতে ছ'গাছা করে চুড়ি, গলায় লকেট্ ঝোলানো হার, কানে পাশা, হাতে আংটিও আছে। ও থাকতো শহরে, সেখানে মেয়েদের চালচলন আলাদা। এ সব পাড়াগাঁয়ে কুমারী মেয়েরা কাঁচের চুড়ি ছাড়া আবার কি গহনা পরে? অত পয়সাও নেই তার বাপের। গোলার দুটো ধান আছে মাত্র, নগদ পয়সা কোথায়। যা কিছু করতে হয়, সে ঐ ধান বেচে।

ভীষণ বৃষ্টি এসেচে। সঙ্গে-সঙ্গে সামান্য ঝড়। রান্নাঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে বক্না বাছুরটা ভিজছে। কচুপাতায় জল জমে আবার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়চে। তাদের কৃষাণ বীরু মুচি বলচে—ও দিদি ঠাকরুণ, তা একটু তামাক দ্যাও মোরে, বিয়েবাড়ী যে মনেই হচ্চে না। দু'দশ ছিলেম তামাক পোড়াবে, তবে ত বোঝবো যে নগনশা লেগেচে।

পুঁটি বীরুকে ধমক দিয়ে বললে—যাঃ তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। তামাক কোথায় পাবো? কাকীমার কাছে গিয়ে চাইগে যা—

একটু বেলা হয়েচে। বাড়ীতে অনেক লোক এসেচে বিয়ের জন্যে। বিয়েবাড়ীর মত দেখাচ্চে বটে—কুমোরপুরের কাকীমা, পাঁচঘরার মাসীমা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেচেন—আজ বেলা এগারোটার সময়ে আরও একদল আসবে, ইস্টিশানে গাড়ী গিয়েচে। মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে নাইতে গেল। কুমোরপুরের কাকীমা যাবার সময়ে তাকে বলে গেল—বাঁড়ুজ্যে বাড়ী পিঁড়ি চিত্তির করতে দিয়ে আসা হয়েচে, দেখে

আসিস্, পুঁটি সে দু'খানা পিড়ি হয়েচে কি-না।

কাকীমার এটা অন্যায় কথা। তার লজ্জা করে না? নিজের বিয়ের পিড়ি নিজে বুঝি সে চাইতে যাবে? এত বেহায়া সে এখনও হয় নি।

তার বাবা চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হেঁকে বললেন—ও পুঁটি, হাতায় করে একটু আগুন নিয়ে এস মা—

চণ্ডীমণ্ডপের দোর পর্যন্ত গিয়ে ও শুনলে ওর বাবা আর একজন অজ্ঞাত লোকের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্তা।

—তা হলে পালকির বন্দোবস্ত দেখতে হয়—

—আজ্ঞে পালকি কোথায় মিলবে? ঘোলডুবুরির কাহারপাড়া নির্বংশ। পাল্‌কি বইবার মানুষ নেই এ দিগন্তে।

—তবে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এস বনগাঁ থেকে।

—এ কাদা-জলে দশ টাকা দিলেও আসবে না। আসবার রাস্তা কই?

—ওরা বিদেশী লোক। বর আসবার ব্যবস্থা আমাদেরই করে দিতে হবে, বুঝলে না? আমরাই পারচি নে, ওরা কোথায় কি পাবে? হিম হয়ে বসে থেকো না। যা হয় হিল্লে লাগিয়ে দ্যাও একটা।

—আচ্ছা বাবু, বলদের গাড়ীতে বর আনলে কেমন হয়?

—আরে না-না—সে বড় দেখতে খারাপ হবে। সে কি—না-না। শুনচি ওরা ইংরিজি বাজনা আনচে। বলদের গাড়ীর পেছনে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে, তাতে লোক হাসবে।

—কেন বাবু তাতে কি? বলদের গাড়ীতে কি আর বর যায় না? একে-বারে আপনাদের বাড়ীর পেছনে এসে থামবে—সেই ত ভালো।

—বলদের গাড়ীতে বর যাবে কেন? সে কি আর ভদ্দরলোকের বর যায়? তা ছাড়া পেছনের ওপথ আইবুড়ো পথ। ওখান দিয়ে বর আসবে না, সামনের তেঁতুল তলার রাস্তা দিয়ে বরকে আনতে হবে। তুমি আজই যাও দিকি ষষ্ঠীতলা। সেখানে ক'ঘর কাহার আছে শুনিচি। সেখান থেকেই পাল্‌কি আনাতে—

—সে যে এখান থেকে তিনকোশ, সাড়ে তিনকোশ রাস্তা বাবু।

পুঁটি সেখানে আর দাঁড়ালো না। সুবোধ আসবে বর সেজে বলদের গাড়ীতে? ছি—ছি—সে বড় মজা হবে এখন। ধুতরো ফুলের মালা

গলায় দিয়ে ?

দৃশ্যটা মনে কল্পনা করে নিয়েই হাসতে-হাসতে পুঁটির দম বন্ধ।

—ও তিনু—তিনু রে—শোন্-শোন্ একটা মজার কথা—

তিনু চার বছরের খুড়তুতো ভাই। উঠোনের নীচে দিয়েই যাচ্ছে। সে মুখ উঁচু করে ওর দিকে চেয়ে বললে—কি লে ডিডি ?

—জানিস্ ? এই আমাদের বাড়ী বর আসবে—

—সত্যি ?

—হ্যাঁ-রে। ধুতরো ফুলের মালা পরে বলদের গাড়ী চেপে ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে—হি—হি—

তিনু না বুঝে হাসলে—হি—হি—

এই সময়ে ওদের জ্যাঠাইমা বাড়ীর ছেলেমেয়েকে ডাক দিলেন—ওরে, সবাই এসে কাঁঠাল খেয়ে যা—ও হিমু, পান্ত ভাত কে-কে খাবে ডাক দিয়ে নিয়ে আয়। এক হাঁড়ি পান্ত রয়েছে সেগুলো কাঁঠাল দিয়ে ওঠাতে তো হবে। ভাত ফেলতে পারবো না এই যুধ্যের বাজারে—

পান্ত ভাত ও কাঁঠাল পুঁটির অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু আজ এখন তার খাবার নাম করবার জো নেই—খিদেও পেয়েছিল, ইচ্ছে করলে সে কলসী থেকে কাঁঠালবীচি ভাজা আর মুড়ি লুকিয়ে পেড়ে নিয়ে খেতে পারতো—কিন্তু সে ইচ্ছে তার নেই। তাতে ভগবান রাগ করবেন। আজকের দিনে সে ভগবানকে রাগাবে না।

বেলা বাড়লো। ও বাড়ীতে শাঁক ও হুলুর শব্দ শোনা গেল। অবিশ্যি খুব কাছে নয়, পুঁটির ভাবী শ্বশুরবাড়ী। তা হলেও শাঁকের শব্দ না আসবার মত দূরও নয়। ওর খুড়তুতো বোন শ্যামা বললে—ওই শোন দিদি, দাদাবাবুর গায়ে হলুদ হচ্ছে—

পুঁটি ধমক দিয়ে বললে—চুপ্। মেরে ফেলে দেবো। দাদাবাবু কে ?

—বা-রে, হয়েচেই তো—আর ত দু'দিন দেরি—

—না। তা হোক্। আগে থেকে বলতে নেই।

—জ্যাঠাইমা তো বলচে ?

—কি বলচে ?

—বলচে, আমাদের জামাইয়ের গায়ে হলুদ হচ্চে—সেখানে থেকে তত্ত্ব

নিয়ে নাপিত এয়ার এসে পেঁাছে যাবে—

—তা বলুক গে। আমাদের বলতে নেই।

—আচ্ছা দিদি—দাদবাবু—ইয়ে সুবোধবাবু পাশ করছে?

—খবর এখনও বের হয় নি।

—আমি ও পাড়ার রাধীদের বাড়ী গিইছিলাম এই এটু আগে। রাধীর দাদা পাশ করচে, কাল বিকেল কলকাতা থেকে ওর কাকা খবর দিয়েচে।

—তোর দাদাবাবুর—ইয়ে মানে ওর—দুর, ওই কেশববাবুর ছেলের খবর কে পাঠাবে কলকাতা থেকে? ওদের কেউ নেই কলকাতায়।

একটু পরে ওদের বাড়ীতে শাক বেজে উঠলো, হুলু পড়লো। নাপিতে তত্ত্ব নিয়ে আসচে তেঁতুলতলার পথে, বাড়ী দেখা গিয়েচে।

পুঁটির বুক আনন্দে দুলে উঠলো—জ্যাঠাইমা বলছিলেন, আশীর্বাদ হয়ে গেলেও বিয়ে না হতে পারে, কিন্তু গায়ে হলুদ হয়ে গেলে বিয়ে নাকি আর ফেরে না।

এবার তা হলে সেই আশ্চর্য ব্যাপারটা তার জীবনে ঘটে গেল।

কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। পাড়াগাঁয়ে কত রকমে ভাঙ্‌চি দেয় লোকে। তার বিয়েতেও ভাঙ্‌চি দিয়েছিল। বলেছিল, মেয়ের রং কালো, মুখ-চোখ ভালো না—লেখাপড়া জানে না—আরও কত কি। কিন্তু সুবোধ—না। ছিঃ, ও নাম করতে নেই, নাম হিসেবে মনে ভাবতে নেই।

তারপর বাকি অনেকগুলো কি ব্যাপার স্বপ্নের মত তার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে গেল। শাঁখের ডাক, হুলুধ্বনি, মা, কাকিমা, জ্যাঠাইমা তাকে তাকে তেল-হলুদ মাখিয়ে দিলেন। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এল লালপাড় শাড়ী, তেলহলুদ, একটা বড় মাছ, এক হাঁড়ি দই। তার সমবয়সী বন্ধু তিনজন খেতে এল তাদের বাড়ী। তাকে কাছে বসিয়ে কত যত্ন করে মাছ দিয়ে, দই দিয়ে, না জ্যাঠাইমা কত আদর করে খাওয়ালেন, কত মিষ্টি কথা বললেন। সোনার পিঁড়িতে সিঁদুর দেওয়া হ'ল, প্রদীপ দেখানো হ'ল —যাতে শূণ্য ধানের গোলা সামনের ভাদ্র মাসে আউশ ধানে অত্যন্ত অর্ধেকটা পুরে যায়। বাবা বললেন, গোলার ধান খালি হয়ে যেতো না।

মধ্যে কি একটা গভর্ণমেণ্টের হাঙ্গামা এল—কেউ গোলায় ধান জমিয়ে রাখতে পারবে না। তাতেই অনেক ধান কর্জ দিতে হ'ল গ্রামের লোকজনকে।

গায়ে হলুদের তত্ত্বে আরও অনেক জিনিস এসেছিল, খাওয়া-দাওয়ার পরে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ-কেউ দেখতে এল—তখন সে নিজেও দেখল। আগে লজ্জায় ওদিকেও সে যায় নি। একটা শাড়ী, একটা ব্লাউজ, সায়া একটা—আলতা, সাবান, আয়না আর গন্ধতেল। এ সব জিনিস তার নিজস্ব। কারও ভাগ নেই এতে। সে ইচ্ছে করে যদি কাউকে দেয় তবেই সে পাবে, নইলে নিজের বাক্সে রেখে দিতে পারে, কারণ কিছু বলবার নেই। সব কাজ মিটতে বেলা দু'টো বেজে গেল।

পুঁটির মন ছট্‌ফট্‌ করছিল, ওপাড়ার লতিদি, ছিমি, অন্ন, রাধী—এরা কেউ আসে নি—এদের গিয়ে একবার দেখা দেওয়া দরকার—যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তার গায়ে হলুদের মত আশ্চর্য ব্যাপারটা আজ সত্যিই ঘটে গিয়েচে। আচ্ছা, যখন ইংরিজি বাজনা বাজিয়ে বর আসবে তাদের বাড়ীর দোরে তেঁতুল-তলার ওই পথটা দিয়ে, বোধনতলার কাছে পাল্‌কি নামিয়ে প্রণাম করে—বাজি পুড়বে, লোকজনের হৈ-হৈ হবে—ওঃ, সে সময়ের কথা ভাবাও যায় না। দেখে যেন পাড়ার সব মেয়েরা এসে।

সে বেড়াতে-বেড়াতে গেল মুখুয্যেবাড়ী। মুখুয্যেগিন্নী ওকে দেখে বললেন—কি রে পুঁটি, আয় মা আয়। গায়ে হলুদ হয়ে গেল? আহা, এখন ভালোয়-ভালোয় দু-হাত এক হয়ে গেলে—বোসো মা, বোসো।

একটু পরে লতিকাও এসে হাজির হলো। পুঁটিকে দেখে বললে—ও পুঁটি, তোর আজ গায়ে হলুদ ছিল না? হয়ে গেল? কি তত্ত্ব এল রে শ্বশুর-বাড়ী থেকে?

মুখুয্যেগিন্নী বল্‌লেন—বোস্‌ মা তোরা। লতি, পুঁটির সঙ্গে গল্প কর। একটু চা করে আনি। যাক্‌, ভালোই হ'ল, আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কি কষ্ট, যে দেয় সে-ই জানে।

পাশের বাড়ীর জানালা দিয়ে গাঙ্গুলীদের ছোটবৌ ডেকে বললে—ও কে, পুঁটি নাকি? গায়ে হলুদ হয়ে-গেল? তা কই আমাদের একবার বলতেও তো হয়? এই তো বাড়ীর পেছনে বাড়ী—

পুঁটি বললে—গেলেন না কেন বৌদি? আমরা তো বারণ করি নে যেতে। শাঁক যখন বাজলো, তখনও যদি যেতেন—

লতিকা ভাবলে, পুঁটি ছেলেমানুষ এ উত্তরটা ওর দেওয়া ওর উচিত হল না। এখানে ও কথা বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু এর পরবর্তী ব্যাপারের জন্য সে বা পুঁটি কেউ প্রস্তুত ছিল না। গাঙ্গুলীদের ছোট বৌ মুখ লাল করে উত্তর দিলে—কি বললি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? আমরা কখনও গায়ে হলুদ দেখি নি, শাঁকে ফুঁ পড়লে অমনি কুকুরের মত ছুটে যাবো তোমাদের বাড়ী পাতা পাততে। অত অহংকার ভালো না রে পুঁটি। তোমার বাপের বড্ড ধানের গোলা হয়েচে না? অমন বিয়ে আমরা কখনও কি দেখিনি জীবনে? ছেলের না আছে চাল, না চুলো—সংসারে মানুষ নেই বলে হাঁড়ি ঠেলতে নিয়ে যাচ্চে। ছেলের বিদ্যে কত, তা জানতে বাকি নেই—এবার তো ম্যাট্রিক ফেল করচে—

এখানে লতিকা আর না থাকতে পেরে বললে—কে বললে ছোট বৌদি? সুবোধবাবুর পাশের খবর তো পাওয়া যায় নি?

—কেন পাওয়া যাবে না? চিঠি এসেচে ফেল করেচে বলে—ওরা সে চিঠি লুকিয়ে ফেলেচে। বিয়ের আগে ও খবর জানাজানি হতে দেবে না। উনিই হাট থেকে চিঠি আনেন। পোষ্টকার্ডে চিঠি। উনি সন্দের পর সুবোধদের বাড়ী দিয়ে এলেন। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া—

পুঁটির চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে বিশ্বসংসার লেপে মুছে গিয়েচে। মুখরা দর্পিত ছোট বৌয়ের মুখের কাছে সে কি করে দাঁড়াবে। চেঁচামেচি শুনে মুখুয্যেগিন্নী হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন, লতিকা ওর হাত ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেল।

মুখুয্যেগিন্নী ঘরের মধ্যে এসে চাপা গলায় বললেন—আহা, ছেলেমানুষ ওর সাধ-আহ্লাদের দিনটা অমন করে বিষ ছড়াতে আছে—ছিঃ ছিঃ—ছাখ তো মা লতি কাণ্ডটা—

কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট পুঁটির হাত ধরে ততক্ষণ লতিকা বলচে—চল-চল পুঁটি তোকে বাড়ী দিয়ে আসি—ছিঃ, বৌদির কাণ্ড! ও সব কথা [illegible]নে করিস নে, মিথ্যে কথা। চল পুঁটি—ভাই—

লতিকার গলার সুরে ও কথার ভাবে কিন্তু পুঁটির মনে হল লতিদিও এ খবরটা জানে—কি জানি হয়তো গাঁয়ের সবাই জানে—সে-ই কেবল জানতো না এতক্ষণ। পথে পা দিয়েই লজ্জায় অপমানে সে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলে বললে লতিদি, আমি কী বলেছিলাম ছোট বৌদিকে? খারাপ কথা কিছু?

সমাপ্ত